আসলে অত্যন্ত প্রবল শক্তি। শুধু তাই নয়, এই সব সংস্কার ও অভ্যাসের সমষ্টিই হচ্ছি—'আমি' এবং এই 'আমার অবিসংবাদিত সুখ শান্তির খুব বেশীর ভাগ নির্ভর করে—এই সব ছোটখাট সামান্য প্রয়োজন প্রকৃতিরই উপর,—উদার যুক্তির সত্যদর্শনের উপর নয়। অবশ্য আমি বলতে চাচ্ছি না যে, তাই বলে নিরপেক্ষ যুক্তির ভিত্তির উপর যে সব বিশ্বাস ও উপলব্ধি প্রতিষ্ঠিত সে সব ধারণা আমাদের সত্তার প্রয়োজনীয় অঙ্গ নয়; আমি কেবল বলতে চাই এই কথা যে, যে সব আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা বাসনা, আনন্দ-বেদনা আমার হৃদয়ের সব চেয়ে কাছে সে সবের খুব বেশীর ভাগই গড়ে ওঠে—যাকে আমরা বলি নৈমিত্তিক, গৌণ, সেই সব কারণের ও প্রভাবেরই উপর।

নালন্দেরা জাহা।

১৩ই মার্চ্চ, ১৯২

মৈত্রেয়ী

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

প্রশান্ত প্রভাতে আজি বিহগের কাকলী-কল্লোলে,
হে কল্যাণী নারী,
তোমার নির্ম্মল শান্তি গ্লানিহীন স্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদ
আনন্দ বিথারি'
পূর্ণ করে জীবনের ক্ষয় ক্ষতি ভাবনা লাঞ্ছনা;
মুক্ত নীলাকাশে,
জ্যোতির্ম্ময়ী-বেশে আজি দাঁড়ায়েছ সম্মুখে আমার—
নেত্রে দীপ্তি ভাসে॥

সে কোন্ আদিমযুগে অরণ্যের হোমপূতছায়ে,
সদ্য বর্দ্ধমান
সুনবীন সভ্যতার ক্লেদরিক্ত নির্ম্মল প্রাঙ্গনে,
তব পুণ্যগান

উঠেছিল নাহি জানি—পূর্ণতম সাধনার বাণী
আপনার বেগে,
সে জ্ঞান-সাগর-তীরে তুমি নারী ছিলে ঊর্দ্ধমুখে
দীর্ঘরাত্রি জেগে ॥

নিদাঘ-জড়তা-শেষে নীলনভে প্রাণ-বারি-আশে,
চাতকের সম,
সংসার-মরুর পথে অমৃতের সুতীব্র পিপাসা.
কমনীয়তম—
নীরবে বহিয়া ধীরে ক্লান্তপদে সগৌরব শিরে
অয়ি তেজস্বিনী,
নারীর মহিমা-বাণী মুক্তকণ্ঠে করেছ প্রকাশ :
অজ্ঞাননাশিনী !

চাহ নাই ধন-জন-যশ-মান, বিভব-বিলাস
জীবনের পথে,
বিরাট অতৃপ্তি তব বুভুক্ষিত ক্ষুদ্র বক্ষ-মাঝে,
ছিল কোনো মতে !
অঙ্কুর-জনম-শেষে সংসারের বস্তুর সম্ভারে
মাথা করি' নত,
রহে নাই। বহে নাই জীবনের বিপুল গ্লানিরে
নীরবে সতত !

ব্রহ্মজ্ঞান-ছায়াতলে প্রাণগতি এনেছ বহিয়া
হে প্রদীপ্তা নারী,
পরিপূর্ণ প্রেমবলে মুক্ত বাণী করেছ প্রচার
সৌন্দর্য্য সঞ্চারি'।

মানুষের রোগক্ষীণ ব্যথাদীর্ণ পঞ্জরের তলে,
চিরন্তন বাণী
আপন জীবন দিয়া শান্তনেত্রে মেগেছ নীরবে
হে চিরকল্যাণী।

সরস-জীবন-রূপ কঙ্কালের রিক্তবক্ষ-মাঝে
হ'য়ে যায় শেষ।
ঝরে ফুল ; পড়ে পাতা ; আসে মৃত্যু দীর্ঘ ছায়া ফেলি'
নাচে যে মহেশ।
এ চিরমৃতের বুকে অমৃতের আনন্দ-উৎসব
তব ধ্যানলোকে,
ফুটেছিল ধীরে ধীরে। করেছিলে মানসসন্ধান
অসীম পুলকে।

আজিকে তোমার রূপ ভারতের নারীশক্তিমাঝে
হে তাপস-রাণী,
হেরিতেছি ধ্যানে মোর। প্রভাতের আনন্দ-আলোকে
ধীরে দিল আনি'।
অপসারি' জড়তার গতিহীন ব্যর্থ স্তূপভার
সত্যের আলোকে,
সে শক্তি উঠিবে জাগি' মহারাজ-রাজেশ্বরীবেশে
পলকে পলকে।

প্রাণহীন অবরোধ, শুচিহীন গুণ্ঠনের তলে,
সংকীর্ণ জীবন,
জ্ঞানহীন রুদ্ধগতি টানি' চলে শীর্ণ দেহভার
বরিতে মরণ।

পঙ্কিল প্রাচীর ভেদি' পশে নাই দীপ্ত সূর্য্যালোক ;
রোগবীজাণুর
ক্ষমতা বাড়িয়া চলে। চলে ধীরে তাণ্ডব নর্ত্তন
উদ্দাম স্থাণুর।

সে মহাপ্রাকার 'পরে জীবনের উন্মুক্ত কল্লোল
বাধাবন্ধ টুটি'
আসিছে—হেরেছি তা'র মহোদ্দাম সুন্দর স্বরূপ
উঠিয়াছে ফুটি'।
প্রখর পিপাসা তব রৌদ্রদীপ্ত সিন্ধু সিকতায়
খুঁজিয়াছে পথ,
আজিকে টুটিছে বাধা। ঘুচে যায় মোহজড়তার
অচল পর্ব্বত।

সত্য জ্যোতিঃ-অমৃতের দীপ্ত বাণী করেছ সন্ধান ;
পেয়েছ উদ্দেশ।
আত্মার আলোকে তা'রে বিশ্বমুর্ত্তী হেরেছ নীরবে।
ক্ষয়-ক্ষতি-লেশ
সহ নাই। রহ নাই প্রেমহান অচল বন্ধনে
অয়ি জ্যোতির্ম্ময়ী,
নিশ্চল তিমির-মাঝে আলোকের মুক্তবাণী কহ,—
প্রেম, চিরজয়ী॥

মীনকেতন

ন্যূট হামসুন

অনুবাদক—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নয়

এড্ভার্ডার সঙ্গে খানিক কথা হ'ল।

"শিগ্গিরই বৃষ্টি এসে পড়্বে।" বল্লাম।

"ক'টা বেজেছে?" ও শুধোল।

সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে বল্লাম—"পাঁচটা হবে।"

"রোদ দেখে সময় ঠাহর কর্ত্তে পার?"

"হাঁ, পারি।" বল্লাম।

চুপচাপ।

"আর যখন রোদ দেখা যায় না, কি ক'রে বল তখন?"

"তখন আর আর সব জিনিষ দেখে বলি। জোয়ার ভাঁটা দেখে, ঘাসের রং বদলানো দেখে, পাখীর গান শুনে,—এক পাখীর দল বিদায় নেয়, অন্য পাখীর দল গান ধরে। সন্ধ্যায় যে সব ফুল চোখ বোজে, তাদের দেখে বলতে পারি—ঘাসেরা কখনো তাজা সবুজ, কখনো ফ্যাকাসে। তা ছাড়া, আমি অনুভবই করতে পারি।"

"ও!"

বৃষ্টি এসে পড়্বে বুঝি এড্ভার্ডাকে বেশীক্ষণ রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা ঠিক হবে না, টুপিটা তুল্লাম। কিন্তু তক্ষুণি ও কি একটা প্রশ্ন করে' আমাকে বাধা দিলে, দাঁড়ালাম। ও লজ্জিত হয়ে জিগ্গেস করলে আমি এখানে এসেছি কেন? কেন গুলি ছুঁড়ি, এ ও তা। খাবার যা দরকার তার বেশী কেন মারি না, কেন কুকুরটাকে আল্সে করে রাখি?...

ওকে ভারি শান্ত ও নম্র দেখাচ্ছে। মনে হ'ল, কেউ কিছু আমার বিষয় ওকে বলে' থাক্বে, নিজের থেকে ও এ সব কিছু জিগ্গেস কর্ছে না। কি জানি কেন, ওর প্রতি স্নেহে মন আর্দ্র হয়ে এল, ওকে ভার অসহায় দুঃখী মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে, বেচারীর মা নেই, ওর শীর্ণ বাহু দুটি দেখে মনে হয়, ওকে কেউ যত্ন করে না। ওর জন্য মন যেন গলে যায়।

আমি গুলি ছুঁড়ি হত্যা কর্তে নয়, জীবনধারণ করতে। আজকে আমার শুধু একটা বিল মোরগের দরকার ছিল, তাই দুটো মারিনি, কাল্কে আরেকটা মার্ব। বেশী মেরে কি হবে? বনে থাকি বনের ছেলের মতো।

জুনের গোড়ায় খরগোস, পাহাড়ী মোরগ পাওয়া যেত,—এখন মার্বার কিছুই নাই দেখ্ছি। বেশ, এবার জাল নিয়ে বেরুব, মাছ খেয়েই দিন যাবে। মেয়েটির বাপের কাছ থেকে নৌকা ধার নিয়ে দাঁড় টান্তে লেগে যাব। সত্যি সত্যিই, হত্যা করবার আনন্দে নয়, শুধু বাঁচে থাকৃতে হবে বলেই গুলি ছুঁড়ি।

বন আমার বেশ জায়গা! খাবার সময় সোজা হয়ে চেয়ারে বসতে হয় না, মাটিতে গা ছড়িয়ে শুয়ে শুয়ে খাই—এখানে গ্লাস উল্টে ফেলি না আর। যা খুশী তাই করি এ বনে, চিৎ হয়ে শুয়ে ইচ্ছা করলে চোখ বুজে থাকি, যা খুশী নিজের মনে আওড়াই। কখনো কখনো কারো কোন

কথা চেঁচিয়ে বল্‌তে ইচ্ছা করতে পারে, মনে হয় যেন বনের ঘুমন্ত হৃদয় থেকে বাণী উচ্চারিত হচ্ছে।

ওকে জিগ্‌গেস করি ও এ সব কিছু বুঝেছে কি না। ও হাঁ বলে।

ওর চোখ দুটি আমার মুখের ওপর, তাই আবো বলে' চলি।

"এই বনে যা সব দেখি, তা যদি শোন!' বলি, 'শীতকালে বরফের ওপর পাহাড়ী মোরগের পায়ের চিহ্ন ধরে' ধরে' চলি। হঠাৎ আর পথ চেনা যায় না, পাখীটা ডানা মেলে পালিয়েছে। শিকার কোন্ দিকে ভেগেছে, ডানার চিহ্ন দেখে বুঝি, তাকে ধরি। সব সময়েই কিছু না কিছু নতুন জুটে যায়। শরৎকালে উল্কা দেখা যায়। একা বসে' বসে' ভাবি—কি এটা? কোনো পৃথিবীর সহসা বুঝি ওলোটপালোট হয়ে গেল? আমার চোখের সাম্‌নে একটা পৃথিবী টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল বুঝি! ভাবতে কী সুখ লাগে যে জীবনে এই উল্কাপাত দেখতে চোখের দৃষ্টি পেয়েছিলাম। তারপর গ্রীষ্ম যখন আসে, মনে হয় প্রত্যেকটি পাতায় যেন একটি করে পোকা বাসা বেঁধেছে। দেখি কারো কারো পাখা নেই, তাদের দিয়ে পৃথিবীতে বিশেষ কিছুই এসে যায় না বটে, কিন্তু ঐ একটুখানি ছোট পাতার পৃথিবীতে ওরা বাঁচে আর মরে যায়।"

"মাঝে মাঝে নীল মাছিও দেখি। কিন্তু ও নেহাৎই এত ছোট যে ওর বিষয় কি আর কইব? যা বল্‌ছি তুমি সব বুঝ্‌ছ কি?"

"হাঁ হাঁ বুঝ্‌ছি।"

"বেশ। মাঝে মাঝে ঘাসের দিকে তাকাই, ওও হয়ত আমাকে দেখে, কে বলতে পারে? নিরালা ঘাসের ডগাটি দেখি, একটু একটু কাঁপ্‌ছে, ও হয়ত আমার সম্বন্ধে কিছু ভাবে। এখানে ছোট একটি তৃণাঙ্কুর কাঁপছে—এই খালি ভাবি। যদি কখনো ফার্ গাছের দিকে চোখ পড়ে, ওর একটি শাখা আমার মনকে একটু নাড়া দেয় হয়ত। কখনো ওপারে ঐ জলা-জায়গাটায় কারো কারো সঙ্গে দেখা হয়,—মাঝে মাঝে।"

ওর দিকে তাকালাম, সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে পড়ে শুন্‌ছে। ওকে যেন চিনি না। এত তন্ময় হয়ে গেছে যে নিজের সম্বন্ধে কোন চেতনা নেই—ভারি কুৎসিত বোকার মতন দেখাচ্ছে ওকে, নীচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে।

"বেশ।" ও উঠে পড়্‌ল।

বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা টপ্‌টপ্ করে' পড়তে সুরু করেছে।

"বৃষ্টি এল।" বল্লাম।

"ও! হা, বৃষ্টি এসে গেল।" বলে'ই চলে গেল ও।

বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে আসা হল না, নিজের পথে নিজেই গেল। কুঁড়ের দিকে তাড়াতাড়ি পা ফেলতে লাগ্‌লাম। কয়েক মিনিট বাদে জল জোরে নেমে এল। কে যেন আমার পেছনে ছুটে আস্‌ছে, হঠাৎ শুন্‌তে পেলাম। এত তাড়া। দাঁড়ালাম।

হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌ছিল ও—"ভুলে গেছ্‌লাম বল্‌তে। আমরা দ্বীপগুলিতে বেড়াতে যাচ্ছি—শুক্‌নো ডাঙায় জান? ডাক্তার কাল আসবে। তোমার সময় হবে?"

"কাল? হা, খুব। ঢের সময় আছে আমার।"

"বল্‌তে ভুলে গেছ্‌লাম।" ও ফের বল্লে, হাস্‌লেও।

চলে' গেল, ওর পায়ের শীর্ণ সুন্দর পেছন দুটি দেখলাম, গোড়ালি থেকে সুরু করে' সবটা ভিজা। ওর জুতো ছিঁড়ে গেছে।

দশ

আরেক দিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। সে দিন আমার গ্রীষ্ম এসেছিল। রাত থাক্‌তেই রোদ উঠে পড়্‌ল, ভোরবেলাকার ভিজা মাটি শুকিয়ে গেল। গেল-দিনের বৃষ্টির পর বাতাস হাল্‌কা আল্‌গা হয়ে এসেছে।

জলা-মাটিতে বিকেলের দিকে এসে পৌছুলাম। জল একটুও নড়ছে না, দ্বীপ থেকে ওদের কথা ও হাসির টুকরো ভেসে আস্‌ছিল, পুরুষ ও মেয়েরা মাছ ধরছে। সুখের সন্ধ্যা।

সুখের সন্ধ্যাই নয় কি? দুই নৌকায় দল বেঁধে চলেছি,

সঙ্গে ঝুড়ি-ভরা খাবার আর মদ, আর তরুণী মেয়েরা,—পরনে পাৎলা ফুরফুরে পোষাক। এত ফূর্ত্তি লাগ্‌ছিল যে গুন্‌গুনাতে সুরু করলাম।

নৌকোয় বসে' ভাবছিলাম এ সব তরুণ তরুণীদের বাড়ী কোথায়? লেক্সমেণ্ড এর আর জিলা-ভাণ্ডারের মেয়েরা, একটি শিক্ষয়িত্রী, আর মঠের কয়েকটি মহিলা—আগে এদের কাউকে দেখিনি। আমার অচেনা সবাই, কিন্তু এমন বন্ধুতা বোধ করছিলাম যে আমাদের যেন বহু বছর আগের থেকেই চেনা আছে। কয়েকটা ভুলও করে' বসলাম, এত ঘনিষ্ঠতা লাগছিল যে মাঝে মাঝে যুবতী মহিলাদের 'তুমি' বলে' ফেলেছি, কিন্তু তারা তাতে কোন দোষ নেয়নি। একবার 'আমার প্রিয়া' পর্য্যন্ত বলে' ফেলেছিলাম, ওরা আমাকে তাও ক্ষমা করেছে,—যেন শোনেনি।

ম্যাক্-এর গায়ে সেই ইস্ত্রি-না-করা সার্টটা—বুকের কাছে সেই হীরেটা। মেজাজ খুব ফূর্ত্তিবাজ,—পাশের নৌকোর সঙ্গে ডাকাডাকি করছে।

"ঐ পাগ্‌লারা, বোতলের ঝুড়ি দেখ্‌ছ ত'? ডাক্তার, মদের জন্ম দায়ী কিন্তু তুমি।"

"ঠিক।" ডাক্তার চেঁচাল। পাশাপাশি নৌকো দুটোর আলাপ শুনতে ভারি মিঠা লাগ্‌ছিল।

কালকের সেই জামাটা এড্‌ভার্ডা আজো পরে' এসেছে, যেন ওর আর জামা নেই, বা যেন আর কিছু পরতে চায় না ও। জুতো জোড়াও তেম্‌নি। মনে হল ওর হাত দুখানি আজকে আর তেমন পরিষ্কার নয়, কিন্তু মাথায় ওর আন্‌কোরা নতুন টুপি, তাতে পালক গোঁজা। সঙ্গে সেই রং-করা জ্যাকেট্‌টা নিয়ে এসেছে, সেটা পেতে তার ওপর ও বস্‌ল।

ম্যাক অনুরোধ করতে ডাঙায় নাম্‌বার আগে একটা গুলি ছুঁড়লাম,—দুটো; দুটোই পাখী—ওরা হুল্লোড় করে' উঠল। দ্বীপটা সবাই ঘুরলাম, মজুররা আমাদের অভিনন্দন করলে—ম্যাক্ তার স্বজনবর্গের সঙ্গে আলাপ সুরু কর্‌ল। ডেসি আর গাঁদাফুল বোতামের গর্ত্তে গুঁজলাম, কেউ কেউ বা ঘেঁটুফুল।

আর সমুদ্র-পাখীদের চীৎকার পারে আর ওপরে—

ঘাসের ওপর তাঁবু গাঁড়লাম, কয়েকটা বেঁটে ভূর্জ্জগাছ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, বাকলগুলি সব শাদা। ঝুড়ি খোলা হল, ম্যাক বোতলের তদারক করতে লাগ্‌ল। ফুরফুরে পোষাক, নীল চোখ, গ্লাসের রিন্‌ঠিন, সমুদ্র, শাদা পাল। একটু গানও হ'ল।

গালগুলি সব রাঙা।

এক ঘণ্টা বাদে। আমার মন তাজা হয়ে উঠেছে, ছোট ছোট জিনিসগুলি পর্য্যন্ত আমাকে নাড়া দেয়। টুপির থেকে একটি ওড়না হাওয়ায় দোলে, একটি মেয়ের চুল নীচের দিকে নেমে এসেছে, হাসির চোটে দুটি ডাগর চোখের পাতা বুজে আস্‌ছে—সব আমাকে ছোঁয়। সেই দিন, সেই দিন!

"শুনেছি আপনার ওখানে অদ্ভুত একটি কুঁড়ে আছে।"

'হাঁ, পাখীর বাসা। সেই আমার 'সব-পেয়েছি'র দেশ। একদিন চলুন না,—ধারে পাবে কোথাও এমন কুঁড়ে নেই। ওর পেছনে অগাধ বিশাল বন।"

আরেকজন আসে, মিষ্টি করে' বলে—"উত্তরে এদিকে আর আসেন নি কোনো দিন?"

বলি—"না! সবই জান্‌তাম বটে আগে। রাত্রে আমি পাহাড়ের মুখোমুখি দাঁড়াই, পৃথিবীর, সূর্য্যের। যাক্, কবিত্ব করব না। কী চমৎকার গ্রীষ্ম এখানে! আমাদের ঘুমের মধ্যে হঠাৎ ও জন্ম নেয়, সকাল বেলা ওর ছোঁয়া পেয়ে আমরা চমকে উঠি। সেদিন জান্‌লা দিয়ে চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে ওকে দেখে ফেল্লাম। আমার ঘরে ছোট্ট দুটি জান্‌লা আছে।"

আরেকজন আসে। মিষ্টি গলা, ছোট দুটি হাত,—সুন্দর মেয়েটি! বলে—"ফুল বদল করবে?—[illegible] খোলে।"

হাত বাড়িয়ে বলি—"করব। তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। তুমি কি সুন্দর, কি মিষ্টি গলা, সমস্তক্ষণ শুন্‌ছিলাম।"

তক্ষুণি ঘেঁটু ফুলের গুছিটা সরিয়ে নেয়, বলে—"কি বলছেন আপনি? আপনাকে আমি জিগ্‌গেস করিনি।"

আমাকে জিগ্‌গেস করেনি? ভুল করে' কথাগুলি বল্লাম বলে' দুঃখ হ'ল। ইচ্ছে হ'ল, আমার সেই অনেক দূরের কুঁড়ের তলায় ফিরে যাই,—খালি হাওয়ার কথা শুনি। বলি—"আপনার কাছে ক্ষমা চাই, ক্ষমা করুন।"

মহিলারা পরস্পরের দিকে তাকায়, চলে' যায়,—অবশ্যি আমাকে অপমান করতে নয়।

কে যেন আমাদের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে, সবাই দেখ্‌তে পেলে—এড্‌ভার্ডা। একেবারে আমারই কাছে এসে কি যেন বল্লে, হঠাৎ ওর বাহুদুটি দিয়ে আমার গ্রীবা বেষ্টন করে' ঠোঁটের ওপর চুম্বন বৃষ্টি করতে লাগ্‌ল। প্রত্যেকবারই কি যেন বলে, শুন্‌তে পাই না। কিছুই বুঝ্‌লাম না, আমার হৃদয় শুব্ধ হয়ে গেছে,—খালি ওর ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টির তাপ বোধ করছি। তারপর নিজেকে ও মুক্ত করে নিলে, ওর ছোট বুকখানি দুল্‌ছে। ও কিন্তু তবু দাঁড়িয়েই আছে, ওর মুখ কটা গ্রীবা, দীর্ঘায়ত তনু দেহখানি, দুটি উদাস উজ্জ্বল চোখ;—সবারই চোখ ওর দিকে। এই দ্বিতীয় বার ওর ঘন ভ্রূর মাধুর্য্যে মুগ্ধ হলাম,—ভ্রূ-রেখা দুটি কেমন বেঁকে কপালের ওপর উঠে গেছে।

কিন্তু আশ্চর্য্য,—সবাইর সাম্‌নে আমাকে চুম্বন কর্‌ল!

"এ কি এডভার্ডা"? জিগ্‌গেস করে ফেল্লাম। আমার রক্ত তখনো ফুটছে, শুন্‌তে পাচ্ছি, আমার গলা দিয়ে যেন নেমে আস্‌ছে, কথা কইতে পার্‌ছি না।

ও বল্লে—"কিছুই না। ইচ্ছে হয়েছিল—কিছু না।"

টুপিটা তুলে চুলগুলি যন্ত্রচালিতের মতো হাত দিয়ে আঁচড়ে নিয়ে ওর দিকে তাকাই,—"কিছু না?"

ম্যাক দূরে দাঁড়িয়ে কা'র সঙ্গে জানি কথা কইছে, এখান থেকে শোনা যাচ্ছিল। ভাগ্যিস্ ম্যাক কিছুই দেখেনি, কিছু জানেও না এর। ভাগ্যিস্ এ সময়টা ও দলের থেকে একটু বাইরে ছিল। নিশ্চিন্ত হলাম যেন, আর সবাইর কাছে গিয়ে উদাসীনের মতো বলি—"আপনা কার আগের মুহূর্ত্তের বে-টপকা ঘটনার জন্য আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন, আমি তার জন্য নিতান্ত দুঃখিত। এডভার্ডা একান্ত করুণায় আমার সঙ্গে ফুল বদল করতে চেয়েছিলেন, আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছিলাম। আমি ওঁর, আপনাদেরও ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আমার অবস্থায় নিজেদের দাঁড় করান্; আমি একা থাকি, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশায় আমি মোটেই অভ্যস্ত নই। তা ছাড়া, এতক্ষণ মদ খেয়েছি, তাতেও অভ্যস্ত নই। এ সব কথা মনে করে আমাকে মার্জ্জনা করুন।"

হাসলাম, বাইরে ঔদাসীন্যের ভাণও কর্‌লাম,—যেন এটা একটা সামান্য ব্যাপার, সহজেই ভুলে যাওয়া যাবে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে মনটা ভারি হয়ে উঠ্‌ছিল। আমার কথা এড্‌ভার্ডাকে একটুও মুগ্ধ কর্‌ল না কিন্তু, লুকোবারও কিছু চেষ্টা কর্‌ল না, এই আকস্মিক আচরণের পর কিছু সাফাই পর্য্যন্ত না, সারাক্ষণ আমার পানে চেয়েই রইল। মাঝে মাঝে দুটি একটি কথাও কইল। তারপর যখন "এক্কি' খেলা সুরু হল, ও বল্লে—"আমি লেফ্‌টেনেণ্ট গ্নাহনকে চাই,—আর কেউ আমার খেড়ু নয়।'

"দুষ্টু মেয়ে, চুপ কর।' পা ঠুকে বল্লাম।

ও অবাক হল, ওর মুখ শুকিয়ে এসেছে, যেন আঘাত পেয়েছে, পরে লজ্জায় একটু হাসলে; মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল কিন্তু,—ওর সেই দুটি অসহায় আতুর দৃষ্টি, ওর ছোট শীর্ণ তনুলতা! আমাকে কে যেন টান্‌ছিল, ওর লম্বা পাৎলা হাতটি মুঠির মধ্যে টেনে এনে বল্লাম—"এখন না, পরে। কালকেই ত' ফের দেখা হবে।"

এগারো

রাত্তে হঠাৎ যেন শুন্‌তে পেলাম ঈশপ্ ওর কুঁড়ের কোণটি ছেড়ে চেঁচাতে সুরু করেছে। ঘুমের মধ্যে থেকে শুন্‌লাম, গুলি ছোঁড়ার স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম তখন, তাই কুকুরের ডাকটা স্বপ্নের সঙ্গে খাপ খেয়ে গিয়েছিল, তাই তখুনি

জাগিনি বুঝি। রাত দু'টোয় যখন কুঁড়ে ছেড়ে বেরুলাম, দেখি ঘাসের ওপর দু'টি পায়ের চিহ্ন। কে যেন এসেছিল, আগে প্রথম জানলাটায় এসে শেষে শেষেরটায় এসেছিল। পদচিহ্ন পথের ধুলায় হারিয়ে গেছে।

গাল দু'টি গরম, মুখখানি উজ্জ্বল,—এসেই বল্লে—"আমার জন্ম দাঁড়িয়ে আছ বুঝি? তখুনি ভেবেছিলাম তুমি হয়ত দাঁড়িয়ে থাকবে।"

আমি ওর জন্ম অপেক্ষা করে' রইনি। ও ত' পথের ওপর, আমার আগে।

"রাতে ভালো ঘুমিয়েছ ত'?" কি বলব, বুঝতে পারছিলাম না।

"না, ঘুম আসেনি। জেগেই ছিলাম।" বল্লে। ও সে-রাতে নাকি একটুও ঘুমোয়নি, চোখ বুজে একটা চেয়ারে পড়ে' ছিল। একটুখানি ঘুরে আস্‌বার জন্য ঘরের বাইরে এসেছিল একবার।

বল্লাম—"কাল রাতে আমার কুঁড়ের বাইরে কে যেন এসেছিল। সকালবেলা ঘাসের ওপর তার পায়ের দাগ দেখলাম।"

ওর মুখ রাঙা হয়ে উঠল, আমার হাত ও টেনে নিল রাস্তার ওপরেই, কোন কথা বল্লে না। ওর দিকে তাকিয়ে বল্লাম—"তুমিই কি?"

"হাঁ," আমার বুকের কাছে এগিয়ে এল ও, "আমিই। তোমার ঘুম ভেঙে দিইনি ত'? যদ্দূর সম্ভব চুপি চুপি এসেছিলাম। হাঁ, আমিই। তোমার কাছে এসেছিলাম আবার। তোমাকে এত ভালোবাসি।"

বারো

রোজ, রোজ ওর সঙ্গে দেখা হয়। সত্যি কথা বলতে কি দোষ, ভারি খুসী হতাম ওকে দেখে, আমার হৃদয় যেন উড়ত। দু' বছরের পুরোনো কথা, এখন মাঝে মাঝে পড়ে, সমস্তটা কাহিনী আনন্দও দেয়, বিভ্রান্তও করে। সেই দুটি সবুজ পালকের কথা,—সময়মত বলব।

নানান্ জায়গায় আমাদের দেখা হয়,—কারখানায়, রাস্তার ওপরে, এমন কি আমার কুটীরেও। যেখানে বলি সেখানেই আসে। 'শুভদিন!' ও-ই প্রথম বলে, আমিও বলি—"শুভদিন!"

"তোমাকে ভারি খুসী দেখাচ্ছে।" ও বলে। ওর চোখ চক্‌চক্ করে।

"হাঁ, খুসী বৈ কি।" বলি—"তোমার ঘাড়ের ওপর কিসের একটা দাগ, ধুলো হয়ত, রাস্তার কাদায় দাগ হবেও বা। ঐ ছোট্ট দাগটিতে আমি চুমু দেব। না, না দাও,—দেব। তোমার সব কিছু আমাকে এমন ছোঁয়, আমি যেন মূর্চ্ছিত হয়ে থাকি। জান, কাল সারা রাত ঘুমাইনি।"

সত্যি সত্যিই। অনেক রাত—অনেক রাতই শুয়ে থাকি বটে, ঘুম আসে না।

পাশাপাশি হাঁটি।

"তুমি আমাকে কি ভাব, বল না? যেমনটি চাও ঠিক তেমনটি?" ও জিগ্‌গেস করে—"আমি বড্ড বেশি বকি, না? বল না, আমাকে কি ভাব তুমি? আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এর থেকে কিছুই সুফল হবে না।"

"কি সুফল হবে না?" প্রশ্ন করি।

"এই আমাদের মধ্যে—। কোন সুফল হবে না। তুমি বিশ্বাস কর না কর, আমার সমস্ত গা কালিয়ে আসে, যখুনিই তোমাকে দেখি, আমার সারা পিঠটায় ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরে। আনন্দে নিশ্চয়।"

"আমারো তাই।" বলি—"তোমাকে দেখলেই থর্ থর্ করে ওঠে বুক। কিন্তু কিছু না কিছু সুফল এর হবেই। এস, তোমার পিঠে একটু হাত বুলিয়ে দিই, গরম হয়ে উঠবে।"

একটু খানি অনিচ্ছা থাকলেও পিঠ পেতে দেয়। একবার জোরে-একটু চড়ের মতো ক'রে মারি ঠাট্টা ক'রে, হাসি,—নিশ্চয়ই এখনো ওর খুব ভালো লাগছে, জিগ্‌গেস করি।

"যখন না বলব, তখন আর দিয়ো না।" ও বলে।

ঐ ক'টি কথা। ওর বলার মধ্যে এমন অসহায় একটি সুর,—যখন না বলব, তখন দিয়োনা আর।...

ফের রাস্তা ধ'রে চল্লাম দু'জনে। আমার এ ঠাট্টায় ও

রাগ করেনি ত'? ভাবলাম, দেখা যাক! বল্লাম—"আমার একটা কথা মনে পড়ছে। একবার এক পার্টিতে গেছলাম; একটি তরুণী তার ঘাড়ের থেকে একটি সিল্কের রুমাল খুলে আমার ঘাড়ে বেঁধে দিয়েছিল। বিকেলে তাকে বল্লাম—'কাল তুমি তোমার রুমাল ফিরে পাবে,—ওটা ধুয়ে দেব।' মেয়েটি বল্লে—'না। এই দাও। তোমার পরার পর যেমনি আছে, তেমনিই ওকে রেখে দেব।' আমি ওকে দিয়ে দিলাম। তিনবছর পর সেই মেয়েটির সঙ্গে ফের দেখা। বল্লাম—'সেই রুমাল?' মেয়েটি তখুনি তা বের করে' দেখাল। একটা কাগজের মধ্যে তেমনি ভাঁজ করা রয়েছে—ধোয়া হয়নি। আমি নিজে দেখলাম।"

এড্ভার্ডা আমার দিকে তাকাল।

"সত্যি? তারপর?"

"তারপর আবার কি?" বল্লাম—"তারপর আর কিছু নেই। কিন্তু মনে হয়, কি সুন্দর!"

চুপচাপ।

"সেই মেয়েটি এখন কোথায়?"

"বিদেশে।"

আর কোন কথা হ'ল না। ওর বাড়ী যাবার সময় হ'লে ও বল্লে—"আচ্ছা। যাই। কিন্তু তুমি ঐ মেয়েটির কথা আর ভাববে না, বল। আমি ত' তুমি ছাড়া আর কাউকে ভাবি না।"

ওকে আমার ভারি বিশ্বাস হ'ল। ও যেন ওর মনের কথাই বলছে। আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভাবে না,—সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। ওর পেছনে হাঁটতে লাগলাম।

"তোমাকে ধন্যবাদ এড্ভার্ডা!" বল্লাম। তারপর সমস্ত হৃদয় ঢেলে দিলাম—"তোমরা সবাই আমার কাছে অপূর্ব্ব, অতুলনীয়,—আমি সবার চেয়ে তুচ্ছ। কিন্তু, তুমি আমাকে নেবে,—ভাবতে, ধন্যবাদে আমার সকল প্রাণ ভরে উঠেছে,—বিধাতা তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। তোমাদের কারুর মতোই আমি সুন্দর নই, কখনো না, কিন্তু আমি তোমার, একেবারে তোমার,—অনন্ত জীবনের জন্য তোমার। কি ভাবছ? তোমার চোখে জল এসে পড়েছে কেন?"

"কিছু না।" ও বল্লে। "ভারি অদ্ভুত লাগছিল শুনতে—বিধাতা তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। তুমি এমন সব কথা বল যে।—। আমি তোমাকে এত ভালোবাসি।"

হঠাৎ ও ওর বাহু দু'টি আমার গলার ওপর মালার মতো ক'রে ফেলে আমাকে নিবিড় তপ্ত চুম্বন করলে,—রাস্তার মাঝখানেই।

ও চলে' গেলে বনের ভেতর গিয়ে লুকোলাম,—আমার আনন্দ নিয়ে একা থাকতে। কেউ আমার দেখে ফেললে কি না,—তাই তাড়াতাড়ি ফের রাস্তায় এসে একটু দাঁড়ালাম। কেউ নেই।

—ক্রমশ

গান

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্ষত যত ক্ষতি যত মিছে হইতে মিছে
নিমেষের কুশাঙ্কুর প'ড়ে রবে নীচে।
কি হ'ল না কি পেলে না,
কে তব শোধেনি দেনা
সে সকল মরীচিকা মিলাইবে পিছে॥

এই যে দেখিলে চোখে অপরূপ ছবি
সুনীল জলের প্রান্তে প্রভাতের রবি,
এই তো পরম দান
ধন্য করিয়াছে প্রাণ
সত্যের আনন্দরূপ এই তো জাগিছে॥

২৫ নবেম্বর, ১৯২৬ —উত্তরা
পিরিউস্

সাহিত্য ও আধুনিক বঙ্গ সাহিত্য

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(মোজাফ্ফরপুর বিহার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত)

* * *

সৎ-সাহিত্যের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই, এবং আমরা তাহাকে প্রচুর ভক্তি করি। কিন্তু খাঁটি নির্জ্জলা সৎ-সাহিত্য পৃথিবীতে অত্যন্ত বিরল। গীতা, বাইবেল, কোরাণ ইত্যাদি মুষ্টিমেয় কতকগুলি পুস্তক আছে, যাহাদের সত্যের আসনে বসান যাইতে পারে। এ-গুলিকে সাহিত্যের ভিতরে না ফেলিয়া ধর্ম্ম-পুস্তক আখ্যা দেওয়াই ভাল।

সাহিত্য হইতেছে উহাই যাহা নর-নারীর মধ্যে যে মধুর ও বিচিত্র রহস্যময় সম্বন্ধ আসৃষ্টি চলিয়া আসিতেছে, যে রহস্য আলোকের সহস্র-রশ্মির মত বিচিত্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে, পাইতেছে ও পাইবে, তাহাকেই প্রকট করে মনোরম রূপে, আনন্দ-দায়ক রূপে। ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া মানুষের যে হৃদয়োচ্ছ্বাস তাহাও সাহিত্য, কিন্তু এ-দিকে সাহিত্য কোনও দিনই সুপ্রচুর নহে। আমি অবশ্য কথা-সাহিত্যের কথাই বলিতেছি; বিজ্ঞান, রসায়ন, দর্শন ইত্যাদি শাস্ত্রের কথা বলিতেছি না।

নর-নারীর মধ্যে এই যে অপার রহস্যময় সম্বন্ধ ইহাই জগতের সকল সাহিত্যের মূল উপাদান; গ্রীক, রোমক, সংস্কৃত সাহিত্য এই অপরিসীম রহস্যোদ্ভেদের চেষ্টা। আধুনিক সমস্ত সাহিত্যও—ইংরেজী, ফরাসী, জর্ম্মাণ, রাশিয়ান, নরওয়েজিয়ান, স্ক্যাণ্ডেনেয়ভিান ইত্যাদি—সেই এক পথেরই পথিক। আর তাহা হওয়াও স্বাভাবিক, কারণ মানুষের কাছে ইহার চেয়ে বড়, ইহার চেয়ে সত্য, এবং ইহার চেয়ে আশ্চর্য্য রহস্য আর নাই। ইহাই তাহার স্বপ্ন ইহাই তাহার কাছে প্রতিদিনকার সত্য। ঘরে বাহিরে ইহাকে লইয়াই তাহার নাড়াচাড়া করিতে হয়। এবং যদি ভগবান থাকেন ত ইহাই তাঁহার সবচেয়ে বড় সৃষ্টি বলিয়া মানিতে হইবে। নানা দিক হইতে নানা ভাবে বাংলার আধুনিক সাহিত্যিক মনীষিগণ যদি এই রহস্যোদ্ভেদের চেষ্টা করিয়া থাকেন ত তাঁহাদের অপরাধ কি? স্বয়ং বিধাতাই ইহাকে সৃজন করিয়া পাঠাইয়াছেন, স্বয়ং বিধাতাই ত ইহার নিত্য খোরাক জোগাইয়া ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টির সর্ব্বত্র এই রহস্যের খেলা চলিয়াছে অব্যাহত, যে অভাগা বই পড়িয়া খারাপ হইতে চাহে বই-পড়ার কষ্ট স্বীকার না করিয়াও যে তাহার পক্ষে মন্দ হইবার পথ আরও সুগম। ক্রমাগত কড়া শাসনের আওতায় অসৎ-সাহিত্য এবং সৎ-সাহিত্যের প্রভেদ বিচারে যে সাহিত্য-বেচারাই অস্থির! মলয়ানিল ভাল, এবং বহু কবি ইহার গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু মলয়ানিল

সেবন করিতে হইলে মধ্যে মধ্যে লু-য়েরও প্রাণান্তকর অত্যাচার সহিতে হইবে, এবং বিধাতৃ-বিধানকে কোনও রকমে রাজী করিয়া যদি 'লু' বন্ধ করা যায় ত সেই দিন হইতে মলয়ানিলও লোপ পাইবে।

সাহিত্যে কুৎসিতের স্থান নাই, অর্থাৎ সেই লেখার যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষের নীচ প্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করা। তাহার জন্য রাজপুরুষের হস্তে যথেষ্ট অধিকার আছে, এবং কোন সাধারণ ব্যক্তিই তাহাকে প্রশ্রয় দিবে না, সুতরাং সে নিজেই মরিবে। তাহার জন্য খুব বেশী চিন্তা করিয়া মস্তিষ্ক ও কালি-কলম ব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই।

তাহার পর কথা-সাহিত্যের প্রাচুর্য্য। ইহাকে আমি সুলক্ষণ বলিয়াই মনে করি। সকল প্রধান সাহিত্যই কথা-সাহিত্যে পুষ্ট। আমাদের বহু পূর্ব্ব পুরুষগণ হিতোপদেশের গল্প শুনিয়াছেন, আমরাও যদি দুই একটা গল্প শুনি ত তাহাতে অপরাধ কিসের? নিষ্ঠুর সত্যের তাড়নে কল্পনা অর্দ্ধমৃতা, আমাদের কথা-সাহিত্য যদি গল্পের ভিতব দিয়া আমাদিগকে কল্পনার সিংহদ্বারে পৌছাইয়া দেয় ত বাঙালীর বংশধরদের পক্ষে তাহাতে শঙ্কার কিছুই নাই।

এই একটা অনুযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে, বাঙালা সাহিত্য 'রাবিশে' পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হয় ত বা ইহা কতকটা সত্য, কিন্তু ইহাতে অনুযোগের কিছুই ত দেখি না। 'রাবিশ' কি একেবারেই প্রয়োজন-শূন্য? ওই যে চাক-চিক্যময় প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল, উহাতে যে অনেকখানি 'রাবিশ' কাজে লাগিয়াছে! মহতের জন্য ক্ষুদ্রের প্রয়োজন সনাতন; সফলের জন্য নিষ্ফলের প্রয়োজন নিত্য. অত্যন্ত কেজো লোকের নিক্তির তৌলে যাহাব প্রয়োজনীয়তা ধরা পড়িল না, বিশ্ব-বিধানে হয় ত তাহাব প্রয়োজন ঐ কেজো লোকটির চেয়ে ঢের বেশী। বসন্ত কালে লাল-নীল-সবুজ-হলদে-গোলাপী-বেগুনী ফুলের অপূর্ব্ব মেলা দেখিয়াছেন?— তাহাদের কি প্রয়োজন আছে এই কঠিন বাস্তব জগতে? তাহারা মানুষকে খাবার জোগাইতে পারে না। অতি-ব্যস্ত মানুষের যখন কর্ম্মের কোলাহল জাগিয়া উঠে, তখন তাহারা সেই কর্ম্মের কোন সহায়তা করে না কিন্তু তবুও এই ফুল ফুটিয়া চলিল নিত্য এবং তাহার অপরূপ শোভায় ও সম্পদে বিশ্ব-জগৎ চিরদিন রাণীর মত ঝলমল করিতে লাগিল। মানুষের কাছে এই নিষ্প্রয়োজনীয়তাই তাহার সব চেয়ে বড় প্রয়োজনীয়তা. কর্ম্ম-ক্ষতবিক্ষত মানুষ যখন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হইয়া কাতর হইয়া পড়ে, তখন বিশ্বজননী ডাকিয়া বলেন, ওরে অবোধ, দেখ্ তোর জন্য কত বড় প্রয়োজন আমি আজ থরে থরে সাজাইয়া রাখিয়াছি; তোর এই প্রাণান্তকর জীবন-যুদ্ধে ক্ষণেকের তরে ক্ষান্ত দিয়া আয় বাছা, আমার আনন্দময় শান্তিময় মন্দিরে, যেখানে ফুলের গন্ধ ফুলের শোভা তোর প্রতিদিনকার প্রয়োজনীয়তাকে অতিক্রম করিয়া স্নিগ্ধ সুনির্ম্মল হাসিতেছে।

গর্ব্বী সাহিত্যিক কঠিন অনুশাসন করিলেন—শতং বদ বা লিখ। তাহার পর কালক্রমে তিনি আরও একটু নরম হইয়া কহিলেন. আচ্ছা বাপু, শতং লিখ, কিন্তু মা ছাপ! অক্ষম সাহিত্যিকের তরফ হইতে জিজ্ঞাসা করি, কেন প্রভু? আমি যদি আমার পয়সা খরচ করিয়া ছাপাই, তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? আমার অক্ষমের লেখা যদি একটি লোকের প্রাণেও সান্ত্বনা দেয়, একটি চক্ষুতেও অশ্রু আনয়ন করে ত সে যে তোমার শত অনুশাসনের চেয়ে সার্থক হইয়া গেল! অতবড় যে ভগবানের অবতার রামচন্দ্র তিনিও ত কাঠ বিড়ালীকে ফেরান নাই, তাই ত সুবৃহৎ সাগর-বন্ধনে কাঠ-বিড়ালীর এক মুষ্টি ধূলি হইয়া রহিল অমর! কাঠ-বিড়ালীর ক্ষমতার অল্পতার কথা মহাপুরুষের অজ্ঞাত ছিল না, তবু তিনি তাহাকেই শ্রেষ্ঠ সম্মান দান করিয়া বরহস্তের পঞ্চাঙ্গুলির চিহ্নে অক্ষমের এই ভক্তি-অর্ঘ্য দানকে চিরদিনের জন্য অক্ষয় করিয়া গেলেন!

আজ সাহিত্যের বাজারে Idealistic, Realistic, বাস্তব, অবাস্তব, শ্লীল, অশ্লীল, সুরুচিসম্পন্ন, রুচিবিগর্হিত প্রভৃতি রচনার চুল-চেরা শ্রেণী-বিভাগ লইয়া যে আলোচনার কোলাহল জাগিয়াছে, তাহা বহু সময়েই সত্যকার রুচির সীমা লঙ্ঘন করিয়া যায়। কুৎসিতকে নিন্দা করিয়া যে ভাষা প্রয়োগ করা হয় তাহা নিজেই কুৎসিত।

অশ্লীলতা এবং কুৎসিৎ সাহিত্যে নিন্দনীয়, শুধু সাহিত্যে কেন জীবনের সর্ব্ব-পথে। এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন, এবং ইহা এমন একটা অদ্ভুত কথা নহে, যাহা মানুষকে উচ্চ কণ্ঠে শিখাইয়া না দিলে সে শিখিতে পারিবে না। কিন্তু আসল গোল হইতেছে শ্লীলতা এবং অশ্লীলতার সীমা-নির্দ্দেশ ব্যাপার লইয়া। কে এই সীমা-নির্দ্দেশ করিবে? যে শক্তিমান লেখক যদু ও পাঁচীর জানালার পথে প্রেমের ব্যাপার লইয়া অক্ষম লেখককে আজ উচ্চকণ্ঠে বহু গালি পাড়িয়া গেলেন, কাল সেই ক্ষমতাবান লেখকের নূতন উপন্যাস খুলিয়া দেখুন, তিনিও সেই যদু-পাঁচীর প্রেমের কথা লিখিয়াছেন, প্রভেদ এই যে, সেই জানালা হইয়াছে গবাক্ষ এবং যদু-পাঁচীও তাহাদের বেশ বদলাইয়া হইয়াছে দেবেন্দ্র-নয়নতারা, কি এমনি কিছু!

এই তথাকথিত অশ্লীলতা লইয়া এত শঙ্কিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। ছেলেবেলায় আমি একজন শুচি বায়ুগ্রস্তা নারীকে দেখিয়াছিলাম, তিনি অশুচিকে বাঁচাইয়া চলিবার জন্য সমস্ত দিনটাই রাস্তায় লম্ফ দিয়া চলিতেন, কিন্তু রোজই দিনশেষে তাঁহাকে আক্ষেপ করিতে শুনিতাম যে, অশুচিকে তিনি এড়াইতে পারেন নাই। মাঝে হইতে তাঁহার লম্ফঝম্পের পরিশ্রমই সার হইত। সাহিত্যেও এই অত্যন্ত অশুচি বায়ুরোগের হাত এড়াইতে হইবে। এই যে এত বড় নিত্য লীলা সৌন্দর্য্য-রহস্যপরিপূর্ণ বিশ্বগ্রন্থ, এখানে কি বিশ্ব-বিধাতা সমস্তই অত্যন্ত ভাল করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন? এই বিশ্বগ্রন্থও কেবল গোপালের কাহিনীই লিপিবদ্ধ করিয়া শেষ হয় না,—যে গোপাল পাঠে অত্যন্ত মনোযোগী, সুশীল এবং একান্ত ভাল ছেলে, এ গ্রন্থের প্রতি-পৃষ্ঠা যে দুঃশীল রাখালের দৌরাত্ম্যকাহিনীতেও পরিপূর্ণ! এই বিশ্বগ্রন্থে নারী-মাংসলোলুপ মনুষ্য ব্যাঘ্রের কথাও আছে এবং নররক্ত পিপাসী নারীর কথাও আছে। ইহাদের অস্বীকার করিলে চলিবে না, এবং এই অবশ্যম্ভাবীর জন্য অকারণ দুঃখ করিয়াও কোন ফল নাই। ইহারা পাশাপাশি আছে সত্য, তবুও এ কথা তারও চেয়ে উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই গ্রন্থেই আছে মাতা ও পুত্রের, পিতা ও কন্যার, ভ্রাতা ও ভগিনীর অপরূপ পুণ্য কাহিনী যাহা যুগে যুগে এই নিত্য ক্ষয়শীল সংসারকে পুণ্যের প্রলেপে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।

যাহা সত্য তাহা যদি অশুভও হয় তথাপি তাহাকে অস্বীকার করিয়া কোন লাভ নাই, তাহাকে গোপন করিবার চেষ্টা বৃথা। বরং তাহাকে স্বীকার করিয়া তাহার অনিষ্ট করিবার সম্ভাবনা কোথায় জানিয়া লইয়া সাবধান হওয়াই বিবেচনার কার্য্য। পুস্তক পাঠে মন্দ হইয়া যাইবে এই ভয়ে আমরা সযত্নে যে বালককে পুস্তক হইতে দূরে রাখিতে চাই, সে যখন পথে বাহির হইবে তখন তাহার দৃষ্টিরোধ করিবে কে? তাহার চেয়ে সত্যের সঙ্গে মুখোমুখী করিয়া বুঝাপড়া করাইয়া দেওয়াই ভাল। হাঙ্গর ও কুম্ভীরের যে বৃহৎ দ্রংষ্ট্রা আছে, কলে কৌশলে ও ছলে-বলে যে স্নেহশীলা মাতা অহরহই তাঁহার পুত্রকে তাহা ভুলাইবার চেষ্টা করেন, সেই মাতারই সেদিন সব-চেয়ে বড় দুর্দ্দিন যেদিন তাঁহার পুত্রের জলে নামিবার সময় আসিবে।

মাসিকে সাপ্তাহিকে দৈনিকে আজ এই হাহাকারই ক্রমাগত শোনা যায় যে, বাঙলা-সাহিত্যের আজ বড় দুর্দ্দিন, বাঙলা-সাহিত্য জঞ্জালে ভরিয়া গেল—বাঙলা-সাহিত্য ধ্বংসের পথে দ্রুত নামিয়া চলিয়াছে। হাহাকারের এই একটা মস্ত দোষ যে, তাহা অকারণ হইলেও মনকে দমাইয়া দেয়, খামকা মনে হয় আমিও হাহাকার করিতে বসি। এই সভায় সমাগত হে আমার তরুণ সাহিত্যিক বন্ধুগণ, আমি আপনাদিগকে সত্য বলিতেছি যে, বাঙলা-সাহিত্যের অত্যন্ত শুভদিনে আপনাদের সাহিত্য-জীবন আরম্ভ হইয়াছে, এত বড় শুভদিন বাঙলা-সাহিত্যের আর আসিয়াছিল কি না জানি না। বাঙলা-সাহিত্যজননী আজ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—এই দুই দিকপালের জন্মদান করিয়া জগৎ-বরেণ্যা। জননীর পূজার জন্য যে বহু বঙ্গসন্তান, সক্ষম অক্ষম, বড় ও ছোট,—আজ থরে থরে অর্ঘ্যের ভার লইয়া মন্দির-পথে উৎসুকনেত্রে ভিড় করিয়া চলিয়াছেন, এ দৃশ্য কি সত্যই মনোরম নহে?

সাহিত্য যদি সংহতি হয়, সহযোগ হয়, ত ছোটকে অক্ষমকে অবহেলা করিলে চলিবে না, ক্রমাগত চোখ রাঙাইয়া শাসন করিলে চলিবে না। সক্ষমকে অক্ষমকে ছোটকে বড়কে বৃহৎকে ক্ষুদ্রকে ভালকে মন্দকে, একই সঙ্গে একই মায়ের মন্দির-পথে যাত্রা করিতে হইবে, অন্তরকে দ্বেষশূন্য, ক্ষমাশীল সুনির্ম্মল, পূতপবিত্র করিয়া—তবে ত মা প্রসন্না হইবেন। নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

—বঙ্গবাণী

নারী-আঁখি

শ্রীচামেলীপ্রভা ঘোষ

তখনো রমণী হয়নি সৃজন,
প্রথম সৃষ্টিকালে ;
ঘন কালোমেঘ তখনো যে ছিল,
নীল গগনের ভালে।
সকল অঙ্গ হয়ে গেছে আঁকা,
বাকী আছে শুধু আঁখি,
কেমনে আঁকিবে ভাবিতেছে বিধি,
ডান হাত গালে রাখি।
আরো কালো হয়ে এল চারিদিক—
বিধাতা বসিয়া ভাবে ;
"এতো জল যদি ঝরে তবে ধরা
প্লাবনে ভাসিয়া যাবে।"

মেঘ হতে তাই বিধাতা তখন
সেই জল কতখানি,
রমণীর দু'টী নয়নের কোণে
রাখিল যতনে আনি'।
কালো কোরে দিল জলদের রঙে
নয়নের মণি দু'টী ;
রামধনু হেরি ভুরু টেনে দিয়ে
বিধাতা লইল ছুটী।
সেই হতে আজো নারীর অশ্রু
ঝরিতেছে অবিরল ;
শুকাইবে ধরা, শুকাবে না তবু
রমণীর আঁখিজল।

যাদুঘর

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(৭)

—ওগো, শুন্‌ছ ?

শনিবার দিন অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরে এসে বিজয় দেখলে যে, তার স্ত্রী মণিকা যেন নির্জ্জীবের মতো স্থির হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে আছে, কিন্তু বিছানায় নয়,—ঘরের মেঝের উপর। সে নিদ্রিত কি অচেতন সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

অনেকবার ডেকেও তার সাড়া না পেয়ে বিজয় যখন আদর করে মণিকার গা ঠেলে তাকে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা ক'রলে, সহসা জ্বলে ওঠা বারুদের স্তূপের মতো হঠাৎ একটা প্রচণ্ড রোষানল ছিট্‌কে তুলে মণিকা বলে উঠল—তোমরা কি আমাকে একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুতেও দেবে না? সারা দিনটা তোমাদের সংসারে যেন কেনা-বাঁদীর মতো হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে সবে একটু চোখ বুজিচি, আর অমনি তোমাদের বুক চড়্ চড়্ ক'রে উঠল! এমন ক'রে আমার সঙ্গে শত্রুতা করছ কেন? আমাকে মেরে ফেলতে না পারলে আর তোমাদের মা'য়ে-পো'য়ের আশ মিটছে না—না ?

এই পর্য্যন্ত শুনেই বিজয় বুঝতে পারলে যে, আজ আবার শাশুড়ী বৌ'য়ে নিশ্চয় একপালা তুমুল ঝগড়া হ'য়ে গেছে, এবং সেই বাক্‌যুদ্ধে পরাস্ত পত্নীর সমস্ত অভিমানের ঝালটা এতক্ষণ বোধ হয় তারই উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল!

বিনা বাক্যব্যয়ে বিজয় সে বজ্র বুক পেতে নেবার জন্য অন্যদিনের মতো আজও নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিলে। অপরাধীর মতো ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলে—মা বুঝি আজ আবার তোমাকে গালমন্দ দিয়েছেন ?

—গাল! শুধু গাল দিলে তো কোনও কথাই ছিল না; কিন্তু অভদ্র ইতরের মতো সব অকথা কুকথা বলার মানে কি?—আজ অক্ষয়বাবু এসেছিলেন বিকেলের দিকে—

বলতে বলতে মণিকা উঠে ব'সে গায়ের কাপড় চোপড়গুলো ঠিক ক'রে নিয়ে সেদিনকার ব্যাপার যা আদ্যোপান্ত বিজয়কে শোনালে তাতে বিজয় কিছুতেই একটু না হেসে থাকতে পারলে না।

মণিকা স্বামীর মুখে সেই হাসি দেখে কিছুক্ষণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক ও স্তম্ভিত হ'য়ে রইল, তারপর অস্ফুট কণ্ঠে যেন আপন মনেই বললে—এ কথা শুনেও কি কারুর মুখে হাসি আসতে পারে ?

বিজয়ের মুখের হাসি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। গম্ভীর ভাবে বললে—ঘটনা যা ঘটেছে সেটা যে একটুও হাসির ব্যাপার নয়, এ কথা আমি অস্বীকার করি নে মণি! কিন্তু তোমাকে ও তো আমি একটু চিনি, তোমাকে মা নষ্ট চরিত্রের মেয়েমানুষ বলেছেন শুনে আমার হাসাই উচিত বটে, কিন্তু আমি সে কথা শুনেও হাসি নি মণি! অক্ষয় তোমার প্রেমে প'ড়েছে কিনা সেটাও মোটেই

আমার বিবেচ্য নয় বরং তুমি তার প্রেমে পড়লে একটু ভাবিত হ'তে হ'ত বটে! আমি হেসেছি, এস্থলে আমার যা কর্ত্তব্য সেইটে ভেবে! বলতে পারো কি এ ক্ষেত্রে আমার কি করা উচিত? একদিকে মা—আর একদিকে স্ত্রী! দু'জনের মধ্যে যদি বনি-বনাও না হয়, তাহ'লে এই সংসার ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনও সহজ পথ তুমি আমাকে দেখিয়ে দিতে পারো কি?

মণিকা চুপ ক'রে রইল।

বিজয় বললে—নিজেকে সন্ন্যাসী রূপে কল্পনা করতেই আমার হাসি এসেছিল! দু' দু'টো মেয়ের বাপ হ'য়ে বসেছি নইলে একবার রামকৃষ্ণ মিশনে ঢোকবার চেষ্টা ক'রে দেখতুম; গেরুয়া পরাটাই দেখ্‌ছি এখন best profession!

এবার মণিকা বললে—তুমি কেন সন্ন্যাসী হতে যাবে? আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, তাহলেই তোমার সংসার শান্তিতে থাকবে।

মণিকার কণ্ঠস্বরে অভিমানের যে চাপা ঢেউটা নিঃসাড়ে তরঙ্গ তুলছিল বিজয় সেটা বেশ স্পষ্ট অনুভব করতে পেরে ঘন ঘন সম্মতি সূচক ঘাড় নেড়ে মৃদু হেসে বললে—হুঁ, এ একটা উপায় বটে! মা কিন্তু সেদিন বলছিলেন যে, তাঁকেই কাশী কিম্বা বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিলেই নাকি আমার সংসারে একটু বেশী শান্তি আসবে!—তারপর অল্পক্ষণ কি ভেবে সে যেন নিজের মনেই বলে উঠল—নাঃ, আমাকে দেখ্‌ছি চিরজীবনটাই এমনি উভয় সঙ্কটে পড়ে হাঁফিয়েই মরতে হবে!

—তার মানে?

এই বলে মণিকা জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চেয়ে রইল।

বিজয় হেসে বললে—মানে? তাও আবার খুলে বলতে হবে? আমার সংসারের এই অশান্তি রোগ দূর করে শান্তি স্থাপনের জন্য তোমরা আমার পরম হিতৈষী দু'জন আমাকে দু'রকম 'প্রেসক্রপশান' দিলে,—আমি এখন কোন্ ডাক্তারের মতে চলি?—এ যে আবার এক বিষম সমস্যায় ফেললে আমাকে;—রীতিমত বৈদ্যসঙ্কট!

মণিকা চেয়েছিল আজ সে যা হয় একটা হেস্তনেস্ত করবে কিন্তু বিজয় ব্যাপারটাকে পরিহাসের ভিতর দিয়ে লঘু ক'রে আনবার চেষ্টা করছে দেখে একটু যেন সতর্ক হ'য়ে উঠে বললে—কেন, এর তো সোজা হিসেব পড়ে রয়েছে। আমি পরের মেয়ে, তোমাদের ঘরে অশান্তি নিয়ে এসেছি—অতএব আমাকেই বিদেয় ক'রে দেওয়া উচিত। আমার জন্যে তোমার মা'কে ত্যাগ করাটা তো ঠিক হবে না।

বিজয় মণিকার কথায় একরকম প্রায় সায় দিয়েই বললে—না, তা বোধ হয় হবে না; কিন্তু তুমি এখানে একটা মস্ত ভুল করছো যে মণি! তুমি যদি কাল বাপের বাড়ী চলে যাও এবং কিছুদিন আর না ফেরো—তা'হলে তোমার আমার এবং মা'র তিন জনেরই পাড়ায় অনেক রকম নিন্দে রটে যাবে যে! কেউ হয় তো' বলবে—আমারই জ্বালায় অতিষ্ঠ হ'য়ে তুমি পালিয়েছো, কেউ হয় তো বলবে—তুমি এমনি বে-আক্কেল যে শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে নিজের সংসার ভাসিয়ে দিয়ে বাপের বাড়ী গিয়ে বসে রইলে। কেউ বলবে—তোমার শাশুড়ী মাগীই যত নষ্টের মূল—অর্থাৎ মা আমার এমনি পাজী যে ছেলের আবার বিয়ে দিয়ে টাকার পুঁটুলি বাঁধবার জন্যই বউটিকে বাড়ী থেকে তাড়িয়েছে!

এইখানে মণিকা একবার যেন চমকে উঠল। বিজয় সেটা লক্ষ্য ক'রে খুশী হয়ে বলতে লাগল—কিন্তু, মাকে যদি কাশী কিম্বা বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিই তাহ'লে দেখো পাড়াশুদ্ধ লোক আমায় ধন্য ধন্য করবে। আত্মীয় কুটুম্বেরা বলবে—হ্যাঁ সন্তানের উপযুক্ত কাজই করেছে, এই বৃদ্ধ বয়সে মা-ঠাকরুণটিকেও যে তীর্থবাসিনী করেছে এই পুণ্য কার্য্যের ফলে হয় তো ওর মাতৃঋণই পরিশোধ হয়ে যাবে!—

মণিকা বললে—তা যদি তারা বলে তাহ'লে তো কিছু মিথ্যে বা ভুল বলা হবে না! সত্যিই তো তোমার মা কাশী কিম্বা বৃন্দাবন যেতে চেয়েছেন ব'লেই তুমি তাঁকে পাঠাচ্ছ—

দুই চোখ কপালে তুলে চাপাগলায় বিজয় বললে—

ভয়ানক ভুল—ভয়ানক মিথ্যে সেটা মণি! তুমি বুঝতে পারছ না ?—এ কি আমি তাঁকে পাঠাচ্ছি ?—এ যে তিনিই অভিমান করে পালাচ্ছেন! এ তোমার ওই বাপের বাড়ী চলে যেতে চাওয়ার মতো আর কি!—এতদিন এত যত্ন ক'রে—কত অসহ্য দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর ছেলেটিকে এত বড়টি ক'রে তুলেছেন। কত সাধ আহ্লাদ ক'রে পুত্রের বিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বড় আশা আমি উপার্জ্জন করবো আর তিনি বউ বেটা নাতি-নাতনি নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করবেন—এই ছিল তাঁর এতদিনের দুঃখময় বৈধব্য জীবনের একমাত্র ভবিষ্যৎ স্বপ্ন! কিন্তু এ স্বপ্ন আজ তাঁর ভেঙ্গে গেছে—বউ পেয়েই যে দিন তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি ছেলেকে হারিয়েছেন,—ছেলের সমস্ত মনটিই দখল ক'রে নিয়েছে ঐ বউ এসে!—এ ক্ষতি তিনি সইতে পারলেন না, বউ সেদিন থেকে তাঁর দু'টি চোখের বিষ হয়ে উঠেছে।

মণিকা ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলে—সে কি আমার দোষ?

—সে কথা তো আমি বলি নি মণি!—দোষ যদি কারুর কিছু থাকে এতে—সে শুধু আমারই, আমি সেটা জানি! কোনও কোনও মা যে সন্তানের স্নেহ-ভালবাসার প্রতিযোগিতায় নববধূর কাছে প্রতিদিন পরাস্ত হয়ে ক্রমে তার প্রতি ঈর্ষান্বিতা হ'য়ে ওঠেন এমন কি বিদ্বেষপরবশও হয়ে ওঠেন এও দেখা গেছে অনেক!

মণিকা বললে—কথাটা মিথ্যে নয়! শাশুড়ী বৌয়ে একটা আন্তরিক সদ্ভাব প্রায় দেখা যায় না বল্লেই হয়!

বিজয় বলতে লাগল—যাঁরা বুদ্ধিমতী জননী, তাঁরা মনের আগুন বুকে চেপে রেখে হাসি মুখে সংসার করে যান, তাঁরা এই ব'লে তাঁদের মনকে ও পরিজনকে বোঝান যে, ছেলে যদি মা'র চেয়ে বউকে পেয়েই সুখে থাকে, আনন্দে থাকে, থাক্ না! বাছা আমার যাতে ভাল থাকে সেই ভাল। আর যে সব মায়ের অন্তঃকরণ একটু কোমল ধাতুতে গড়া তাঁরা কিন্তু নিজের উপর অতটা নিষ্ঠুর হ'তে পারেন না, তাঁরা প্রতিবাদ স্বরূপ দিন কতক সংসারে ঝগড়া ঝাঁটি কলহ বিবাদ ক'রে শেষে বিজিতা বধূর হাতেই সম্পূর্ণভাবে সন্তানকে ছেড়ে দিয়ে কাশী কিম্বা বৃন্দাবন প্রভৃতি সুদূর তীর্থে পালিয়ে যান, এ ঠিক তাঁহাদের তীর্থযাত্রা, নয় লজ্জায় ঘৃণায় দুঃখে অভিমানে এ তাঁদের স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাসন!—অনেকটা মনঃক্ষোভে বিরাগী হয়ে যাওয়া আর কি! বুঝ্‌লে মণি!

মণিকা তার মনের মধ্যে এ কথা গুলোকে নিয়ে অনেক নাড়াচাড়া করে দেখলে এবং কিছুতেই এটা অস্বীকার করতে পারলে না! শাশুড়ীর প্রতি তার ভিতরে ভিতরে যেন একটু সহানুভূতি ও অনুকম্পার ভাব জাগ্‌ছিল—এমন সময় বিজয় ব'লে ফেললে—কিন্তু আর কোনও উপায় নেই! তোমার চরিত্রের প্রতি উনি যখন সন্দিহান হয়ে উঠেছেন—তখন তোমাদের আর এক সঙ্গে থাকা একেবারে অসম্ভব—

এ কথায় মণিকার মনের নির্ব্বাপিত প্রায় অগ্নি হঠাৎ যেন আবার দপ্ করে জ্বলে উঠ্‌ল—সে বলতে যাচ্ছিল যে, —এই পূজোর পর যদি—

মণিকাকে তার মুখের কথা শেষ ক'রতে না দিয়ে বিজয় বলে উঠ্‌ল—আরে সে কথা আবার বলতে, পূজোর পর কেন, পারি ত' পূজোর আগেই ব্যবস্থা ক'রে ফেলবো।

মণিকা একেবরের অত্যন্ত উৎসাহিত হ'য়ে উঠে বললে—তা পারলে মন্দ হয় না—ওঁকে নিয়ে তো বাপু আমি আর এক দণ্ডও চলতে পারছি নি! দেখো দেখি সব কথা, রান্নাঘরে চা' ঢুকলে উনি সেদিন আর অন্ন ছোবেন না! আর তোমার বন্ধু বান্ধবদের সামনে বেরুই ব'লে আমার তো আর খোয়ারের অন্ত নেই, সে তো জানই—

বিজয় হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁ হ্যাঁ, অক্ষয়টা কি কাণ্ড করেছে বলছিলে, আর একবার বল তো শুনি!

মণিকা বললে—আজ বিকেলে তুমি তখনও অফিস থেকে ফেরো নি, এমন সময় অক্ষয় এসে উপস্থিত। বললে—একটু চা খাওয়াতে পারো মণি? কাজেই আমি তাকে ঘরের ভিতর বসিয়ে চা তৈরী করে আনতে গেলুম। আমি কি তখন জানি যে, সে পাগ্‌লা কবি আমার নামে মাসিক পত্রে আবার একটা কবিতা ছাপিয়েছে। আর সেইটে আবার আমাকেই প'ড়ে শোনাতে এসেছে! চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকতেই বললে—'বোসো না একটু মণি, বিজয় না আসা পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গেই না হয় একটু গল্প

করি। তুমি তো হিসেব মতো তারই প্রতিনিধি—'অর্দ্ধাঙ্গিনী' যখন, তখন তোমার উপর আমাদের একটু দাবী আছে বই কি।

তারপর কথায় কথায় কবিতার আলোচনাই স্থরু হল। আমি একটু মজা করবার জন্য বললুম—ও-মাসের 'আহুতি' কাগজে আপনার যে কবিতাটি বেরিয়েছে আমার খুব ভাল লাগল! যদিও সেটা আমি এখনও পড়িনি, তোমার মুখেই শোনা যে আমাকে উদ্দেশ করেই লিখেছে—

তোমাদের কবি একেবারে একগাল হেসে ভয়ানক খুশী হয়ে বললে—আমার রচনা আজ সার্থক হল!—সত্যি বলছ সে কবিতাটি তোমার ভাল লেগেছে মণি! আমার গা ছুঁয়ে বলো—

তার এই বেয়াদপীতে আমি মনে মনে চটলেও, তুমি বাড়ী নেই বলে অতিথির উপর আর রূঢ় না হয়ে হেসে বললুম—অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন সম্বন্ধে আমি এখনও আপনাদের মতো মহাত্মাজীর চেলা হয়ে উঠ্‌তে পারি নি। নিজের কথায় বিশ্বাস করাবার জন্য গা ছুঁয়ে শপথ করাটা আমি নিজেকে অসম্মান করা হয় বলে মনে করি।

কবি তখন দুঃখিত হয়ে স্বীকার করলেন যে, তাঁর এ অনুরোধটা একটু অন্যায় ও অবিবেচকের মতোই হয়েছে এবং সে জন্য আমার কাছ থেকে তিনি মাপ চেয়ে নিয়ে বললেন—আচ্ছা এ কবিতাটা আপনার কেমন লাগে শুনুন তো! বলেই হাতের খবরের কাগজ-মোড়া প্যাকেট থেকে একখানা এ মাসের 'প্রতিভা' কাগজ বার করে নিজের কবিতাটি সুর করে পড়তে আরম্ভ করলে। আমি তার কবিতা পড়ার ভঙ্গী দেখে হেসে ফেলেছিলুম। কিন্তু কবি তোমাদের এমন তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন যে, সেটা লক্ষ্যই করলেন না।

সেই সময়, দোরের আড়াল থেকে মা যে সব দেখছিলেন ও শুনছিলেন, আমি তা একটুও টের পাই নি! কবিতা পড়া শেষ হতেই কবির কণ্ঠে প্রশ্ন হল—কেমন লাগল মণি, বলো?

আমি বললুম—স্তুতি শুনলে দেব-দেবীরাও প্রসন্ন হন, আমি তো একজন সামান্য নারী, আপনি এই স্থছন্দ কাব্যে আমার এমন সুন্দর বন্দনা করেছেন—এ যদি আমার ভাল লাগ্‌ল না বলি তাহ'লে যে মিছে কথা বলা হবে!

কবি একথা শুনে ভারি সন্তুষ্ট হলেন বোঝা গেল! বললেন—অনেক দিন তোমার গান শুনি নি, একটা গান শোনাও না! আমি বিরক্ত হয়ে বললুম—না, আমার শাশুড়ী পছন্দ করেন না! কিন্তু তবু তিনি ওঠবার নাম করছেন না দেখে আমি বড় মুস্কিলে পড়লুম। এ দিকে সন্ধ্যে হয়ে গেল, তখনও তোমার দেখা নেই। একবার উঠে আলোটা জেলে দিলুম। রান্না তখনও সব বাকী, মেয়ে দুটো এখনি খেতে চাইবে—কি যে করি ভেবে পাচ্ছি নি, এমন সময় মা দোরের পাশ থেকে ডাকলেন—বৌ-মা, উনুনটা যে জলে পুড়ে খাক হ'য়ে গেল, এ বেলা কি আর রান্না কিছু চড়বে না?—

—এই যে যাই মা! বলে আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে একটা নমস্কার করে বললুম—হেঁসেলে ডাক পড়েছে, আর আপনার সঙ্গে গল্প করবার সময় নেই। চললুম।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে আসবার পরও কবি কিছুক্ষণ একলাটিই তোমার ফেরার অপেক্ষায় ব'সে শিস দিচ্ছিলেন, তারপর গুন্‌গুন্ ক'রে একটা গান গাইতে গাইতে চলে গেলেন—

"আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিও!"

মণিকার মুখে অক্ষয়-সংবাদ সমস্ত শুনে বিজয় ব'ললে—ব্যাটাচ্ছেলে নির্ঘাত তোমার প্রেমে পড়েছে দেখছি!

মণিকার সুন্দর মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, বললে—আমারও তাই সন্দেহ হয় বটে, অন্তত এবারকার কবিতায় সেটা বেশ স্পষ্টই ফুটে উঠেছে—

—কই দেখি, দেখি সম্বন্ধী এবার কি কবিতা লিখেছে?—

বলতে বলতে বিজয় যেন একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল।

মণিকা উঠে 'প্রতিভা' কাগজখানা এনে বিজয়ের হাতে

দিয়ে বল্‌লে—তোমার গালাগালগুলো বড় উল্টোপাল্টা হয়ে পড়ছে, তুমি বেশ চটে উঠ্‌ছ দেখছি!

—তা, এটা কি বেশ খুশী হবার মত কথা? আমার স্ত্রীর নামে আর একজন প্রেমের কবিতা লিখবে আর আমি—

বাধা দিয়ে মণিকা বললে—তা অক্ষয়বাবুর এ কীর্ত্তি ত আর নূতন নয়। তোমার মুখেই তো শুনেছি যে এর আগে তিনি আরও ছ'টি মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন, তাই নিয়ে তোমরা ওঁকে কত হাসি ঠাট্টা করো—আমাকে ধ'রে না হয় সাতটি হল—

—আহা, সে যে অন্য লোকের স্ত্রী কিম্বা অবিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়েছে শুনে আমরা তার সঙ্গে এতকাল হাসি ঠাট্টা করে এসেছি! কিন্তু এবার যে একেবারে নিজেরই স্ত্রী!

—বেশ হ'য়েছে! তখন অন্য লোকের স্ত্রী বা কন্যার সম্মানের দিকে লক্ষ্য না রেখে বয়স্যের সঙ্গে রহস্য করাটাই যেমন তোমাদের বেশী প্রলুব্ধ করেছিল তেমনি ভগবান তার শাস্তি দিয়েছেন—

বিজয় তখন 'প্রতিভা' কাগজখানা নিয়ে উল্টেপাল্টে অক্ষয়ের কবিতাটি খুঁজে বার করে খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়তে আরম্ভ করেছিল, হঠাৎ বলে উঠ্‌ল—এ কি! এ যে স্পষ্টই তোমার নাম করেছে দেখছি!—

বলতে বলতে সে চেঁচিয়ে পড়তে লাগল—

"জোনাকী প্রদীপে জ্বলে যে হাসিটি
মৃদুলা ক্ষণিকা—
আঁখি কোণে আমি তব দেখেছি যে
সে প্রেম মণিকা!—
কবে তাহা হবে মম জীবনের
ধ্রুবতারা প্রিয়ে?
সে দিন পূজিব আমি ও চরণ
প্রাণ-অর্ঘ্য দিয়ে!"

ইস্‌! একেবারে প্রাণ-অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করতে চেয়েছে তোমার!

—মন্দ কি? তুমি তো দিতে পারলে না, যদি আর একজনের কাছে পাই ক্ষতি কি?

—হ্যাঁ, এই যে দেওয়াচ্ছি আমি তাকে প্রাণ-অ—র্ঘ্যের কালই। কাল রবিবার, কেশবের আড্ডায় যখন আসবে, 'অকা'র এই বকামী আমি বার ক'রে দেবো এখন।

—আচ্ছা সে কালকের ব্যবস্থা কাল হবে, এখন খেয়ে দেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো, রাত অনেক হয়েছে।

—আজ আর আমি কিছু খাবো না।

—কেন অক্ষয় কবির অক্ষয় কবিতা পড়েই আজ পেট ভ'রে গেল নাকি?

—দ্বিজেনদার বাড়ী খেয়ে এসেছি। বউদি মাংস রেঁধেছিলেন। বললেন—বিজয়-ঠাকুরপো, তোমায় খেয়ে যেতে হবেই ভাই!—

—আর তুমি অমনি লক্ষ্মণ দেবরের মতো পাত পেড়ে ব'সে গেলে? বাড়ীর খাবারগুলো যে নষ্ট হবে এ কথাটা একবার ভাবা উচিত ছিল না?

—আরে, সে কথা কি আমি বলি নি? তা বউদি' বললেন, মণিকার হাতের রান্না তো রোজই খাও, আজ বউদির ভোগ রাঁধাটা একটু মুখে দিয়ে যাও না! রোজ তো আর এ সুযোগ ঘটবে না! জানই তো আগুনের তাত আমার সয় না, উড়ে বামুন-ঠাকুরটিই যা করেন তাতেই পরিতৃপ্ত হতে হয়। তা আজ তিনি দয়া ক'রে আসেন নি বলে আমাকেই এই কাণায়ে ঠেলতে হয়েছে।

—কেমন খেলে? তাঁর রান্নার তো খুব প্রশংসা শুনেছি!

—সে আর বোলো না! একেবারে সাক্ষাৎ দ্রৌপদী বললেই হয়!

—দেখো, তুমি যেন দ্রৌপদীর পঞ্চপাণ্ডবের একজন হয়ে বোস না!

—ছিঃ এ সব ঠাট্টা তোমার ভাল নয়। এক গ্লাস জল দাও। আমি শুয়ে পড়ি।

—এই যে দিই।

কিন্তু, মণিকা কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে আনবার

আগেই বিজয় শুয়ে পড়েছিল। মণিকা ডাকলে—ওগো, জল চেয়েই শুয়ে পড়লে যে! আর পড়লে তো অমনি চোখ বুজলে? কি সাধ্য ঘুম বাবু তোমার! নাও, জল এনেছি, খাবে,—না, খাবে না?

দু'বার তিনবার ডাকাডাকির পর বিজয় চোখ বুজেই বিছানা থেকে একটু উঠে জলের গেলাসটা স্ত্রীর হাত থেকে আর নিজে না নিয়ে—তার হাতেই চমুক দিয়ে খানিকটা খেয়ে আবার শুয়ে পড়ল। এবং বিড়-বিড় ক'রে ব'ললে—হ্যাঁ, তোমায় ব'লতে ভুলে গেছলুম, হেমদাস আর কনক চাটুজ্যে সিধুর টেলিগ্রাম পেয়ে—আজ জয়পুর চলে গেল। বায়োস্কোপে ওদেরও কাজ হয়েছে।

বিছানায় মশারি খাটিয়ে দিতে দিতে মণিকা বললে—যাক্ বেচারীদের তাহ'লে একটা হিল্লে হল! এতদিন বেকার অবস্থায় ওরা বড় কষ্ট পাচ্ছিল।

—হুঁ। বলতে বলতেই বিজয়ের নাক ডেকে উঠল।

—ক্রমশ

জমীদার

শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

পল্লীর মোহন শোভা শুষ্ক আজ মলিন বিকল!
হাসি নাই কোনখানে, দু'নয়নে তপ্ত আঁখি জল
ঝরিতেছে পল্লী-মা'র। বক্ষ দহে, লাঞ্ছনা-পীড়ন!
রোষদীপ্ত শাসকের বিশ্বত্রাস ভীষণ শাসন—
পল্লীর সৌন্দর্য্য হরি জ্বালিয়াছে ব্যর্থ হাহাকার!
শ্রীহীন-শ্মশানে তার, অট্ট হাস্য করে জমীদার।

প্রার্থনা

শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

দুঃখ ও দহনে প্রভু বুক পেতে সয়ে নিতে দাও,
রুদ্রের মধুর খেলা, বক্ষে মোর কেবলি খেলাও।
দগ্ধ করি রুদ্র তেজে, পুনঃ মোরে করহ নূতন—
আঘাতে জাগ্রত কর লুপ্ত মোর সুষুপ্ত জীবন।

চতুর্থ খণ্ড

রম্যাঁ রলাঁ

অনুবাদক—শ্রীকালিদাস নাগ ও শ্রীমতী শান্তা দেবী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মিন্‌নার মা শীঘ্রই তাদের লুকোচুরি ধরিয়া ফেলিলেন। ক্রিস্‌তফ্ ও মিন্‌না ভাবিয়াছিল, তারা মস্ত হুসিয়ার যদিও আসলে তারা নেহাৎ আনাড়ির মত কাজ করিতেছিল। মিন্‌নার সন্দেহটা প্রথমেই জাগে ; একদিন সে ক্রিস্‌তফের সঙ্গে কথা বলিতেছে, হঠাৎ দরজা খুলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে মা'র আবির্ভাব। দরজা খোলার শব্দে দুজনে দুদিক হটিয়া গেল, মুখে কাঁচুমাঁচু ভাব। মিন্‌নার মা যেন কিছুই দেখেন নাই। মিন্‌না বেশ একটু কাবু হইয়া মা'র সঙ্গে ঝগড়া করিতে যায় আর কি। তাহা হইলেই নভেলের নায়িকার সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যায় !

কিন্তু মা'র খানিকটা কাণ্ডজ্ঞান থাকায় এমন নাটুকে অভিনয়ের সুযোগ মিলিল না। মা কোন কথাও বলিলেন না, উদ্বেগের কোন লক্ষণই দেখাইলেন না। শুধু মধ্যে মধ্যে মিন্‌নাকে একা পাইলেই ক্রিস্‌তফ্‌কে লইয়া নির্দ্দয় বিদ্রূপ সুরু করিয়া দিলেন। এক একটি বাক্যবাণে ক্রিস্‌তফ্ যেন ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে। সকল কথা জানিয়া বুঝিয়া তিনি যে কথাগুলি বলিতেন, তাহা নয়। কিন্তু নিজের জিনিষ খোয়াইবার সম্ভাবনা হইলে নারীর যে স্বাভাবিক প্রতিহিংসাবোধ জাগে, তাহারই বশে তিনি যেন নিজের দাবীদাওয়া বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে উন্মুখ। মিন্‌না তাঁকে বাধা দিতে চেষ্টা করিত, ঝাঁঝ দেখাইত, বেয়াদবিও করিত। মা যা-কিছু বলিতেছেন, সবই মিথ্যা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু এইদিকে বেশি জেদ দেখাইয়া সন্দেহটা আরো ঘনাইয়া তুলিত। মা খোঁচাইয়া ঘা-টাকে দগ্‌দগে করিয়া তুলিতেন। যত রকমে মিন্‌নার আত্মমর্য্যাদায় আঘাত করা যায় তাহা তিনি করিতেন। ক্রিস্‌তফের পোষাক জুতো টুপি—সবই কি কদর্য্য ! ছেলেটা কি ভাল করে' নমস্কার করতেই জানে ! আর বাবাঃ, কি ষাঁড়ের মত চেঁচিয়েই কথা বলে ! তার উপর সোনায় সোহাগা, পাড়াগেঁয়ে ভূতের মত উচ্চারণ···।' অতি সহজভাবে যেন প্রসঙ্গক্রমে এই সব নির্ম্মম সমালোচনা করা হইত। কোনটাই যেন বলিবার জন্য নহে, তবু গল্পগুজব চলিতেছে। মিন্‌না অধৈর্য্য হইয়া জবাব দিবার উপক্রম করিলেই মা আর একটি বিষয় লইয়া কথা জুড়িয়া দেন। অথচ আঘাতটা মিন্‌নার বুকে বেশ জোরেই লাগে। সে ক্রিস্‌তফ্‌কে একটু সমালোচনার চক্ষে দেখিতে সুরু

করিল। ক্রিস্তফ্ বেচারা যেন আভাসে খানিকটা বুঝিয়া অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, মিন্না, অমন করে' আমায় দেখছ কেন ?

না, কিছু না ! বলিয়া মিন্না হঠাৎ থামিয়া যায় ! অথচ একটু পরেই হাসি ঠাট্টার মধ্যে হঠাৎ মিন্না কর্কশভাবে বলিয়া উঠে, এঃ, আঃ ! এমন অভদ্রের মত চীৎকার করে' তুমি হাস !

ক্রিস্তফ্ লজ্জায় লাল হইয়া উঠে। বেচারী ভাবিতেই পারে নাই যে, মিন্নার কাছেও ওজন ঠিক রাখিয়া হাসিতে হইবে। তার সমস্ত আনন্দের স্রোতে যেন ভাটা পড়িয়া যায়। বেশ সহজ ভাবে দুজনে কথা বলিতেছে, হঠাৎ মিন্না তার পোষাক লইয়া একটা ঠাট্টা করিয়া বসে। নিতান্ত সাদাসিধে কথায় খুঁৎ ধরিয়া লয়। এ যেন জবরদস্তি করিয়া ভদ্রতা শেখানো ! ক্রিস্তফের সব উৎসাহ উবিয়া যায়। কখনও কখনও চটিয়া উঠে। আবার নিজেকে বোঝায়, মিন্না আমাকে ভালবাসে ব'লেই ত এতটা খুঁত খুঁত করে। মিন্নাও খানিকটা এই রকম ভাবে ! ক্রিস্তফ্ ভাল ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই যেন মিন্নার মন উঠে না। একটা মস্ত বড় পরিবর্ত্তন যে দুজনের মধ্যে আসিতেছে সেটা কেউই বুঝিতেছিল না। ঈষ্টারের ছুটিতে মিন্না তার মা'র সঙ্গে 'ভাইমার'-এ বেড়াইতে যাইবে স্থির হইল। বিচ্ছেদের পূর্ব্বে আর সাতটি মাত্র দিন আছে। ভাবিতেই পুরাতন আবেগ যেন ফিরিয়া আসিল। মিন্নার ভালবাসা কেমন একটা অধৈর্য্যের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া যেন নিবিড়তর হইল। বিদায়ের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় দুজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া বাগানে বেড়াইল। একটি গাছের ঝোপের কাছে ক্রিস্তফকে লইয়া গিয়া মিন্না নিজের হাতে একটি ছোট্ট সুগন্ধ সিল্কের থলিতে নিজের একটু চুল ভরিয়া ক্রিস্তফের গলায় ঝুলাইয়া দিল। আমরণ প্রেমের প্রতিজ্ঞাটা ত' হইলই, তার উপর প্রতিদিন চিঠি লেখার শপথও বাদ গেল না। আকাশের একটি তারা দুজনেরই পছন্দ হইল, প্রতি সন্ধ্যায় দুজনে পৃথিবীর দুই প্রান্ত হইতে সেই তারাটির দিকে তাকাইয়া পরস্পরকে স্মরণ করিবে !

বিষম পরীক্ষার দিন উপস্থিত। রাত্রে বার বার জাগিয়া ক্রিস্তফ্ প্রশ্ন করিয়াছে, কাল—মিন্না, কাল কোথা থাকিবে ? আর আজ সকালে ভাবিতেছে, আজ—সকালে সে এখানে ; বিকালে—? ভোরেই মিন্নাদের বাড়ী আসিয়া হাজির। সে তখন উঠে নাই। বাগানে খানিক বেড়াইয়া ক্রিস্তফ্ ভিতরে ঢুকিল। বারান্দায় বাক্স প্যাটরা স্তূপাকার, সে একটি কোণে চোরের মত বসিল। চলা-ফিরার শব্দে সে যেন চমকিয়া উঠে। মিন্নার মা হঠাৎ সামনে আসিয়া একটু বিদ্রূপ মিশ্রিত অভিবাদন ছুঁড়িয়া সরিয়া গেলেন। শেষে মিন্না দেখা দিল। মুখ-খানি ম্লান পাণ্ডুর, কান্নায় চোখদুটি ফুলিয়াছে, সারা রাত ঘুমায় নাই তা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে। ধাক্কা সামলাইতে সে চাকর বাকরকে কাজের হুকুম দিতে লাগিল। একবার ক্রিস্তফের সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়াই বৃদ্ধা দাসীর সঙ্গে যেন মস্ত একটা দরকারি কথা জুড়িয়া দিল। এমন সময় মা দেখা দিলেন। টুপির বাক্স লইয়া কি একটা তর্কযুদ্ধ হইয়া গেল। ক্রিস্তফকে যেন কেউ দেখিতেই পায় না ! পিয়ানোর পাশে বেচারী যেন মুস্‌ড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মিন্না মা'র সঙ্গে একবার বাহিরে গেল। একটু পরে ঘরে ঢুকিয়া দরজাটা বন্ধ করিল। দুজনে একা ! মিন্না ক্রিস্তফের হাত ধরিয়া পাশের একটি ছোট্ট ঘরে টানিয়া লইয়া গেল। ক্রিস্তফকে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া কান্নায় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়া মিন্না বলিয়া উঠিল, বল, প্রতিজ্ঞা কর, চিরকাল আমাকে ভালবাসবে—কান্নার ঢেউ যেন গলাটা বন্ধ করিয়া দিতেছে। কান্না থামাইবার জন্য সে কী ভীষণ সংগ্রাম ! হঠাৎ দূরে পায়ের শব্দ—দুজনে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। চোখ মুছিয়া মিন্না আবার যেন চাকরদের হুকুম করিতে ব্যস্ত। কিন্তু গলাটা বেশ কাঁপিয়া যাইতেছে। চোখের জলে ভেজা মিন্নার ছোট রুমালখানি পড়িয়া গিয়াছিল। ক্রিস্তফ্ চট করিয়া সেটাকে বুক-পকেটে পুরিয়া লইল। গাড়ী ছাড়িয়া ক্রিস্তফ্ ষ্টেশন অবধি গেল। দুজনে সাম্না সাম্নি

বসিয়া আছে অথচ কেহ কাহারো দিকে চাহিতে ভরসা পাইতেছে না। পাছে কান্না ধরা পড়িয়া যায়। বিষম জোরে একবার শুধু দুজনে দুজনের হাত চাপিয়া ধরিল। মিন্নার মা যেন কিছুই দেখিতেপাইতেছেন না। অথচ আড়ে আড়ে বেশ একটু ক্রূর হাসি তাঁর মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে। সময় হইয়া গেল; ট্রেণের দরজায় ক্রিস্তফ্ দাঁড়াইয়া আছে। ট্রেণ ছুটিল। ক্রিস্তফ্ও সব ভুলিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। নির্ব্বোধ! কোথায় যাইতেছে তার ঠিক নাই। দু' একটা মুটের ঘাড়ে পড়িয়া বিষম ধাক্কা খাইল, তবুও তার চোখ মিন্নার মুখখানি দেখিতেছে। যতক্ষণ ট্রেণ দেখা গেল সে ছুটিল। তারপর বে-দম্ হইয়া থামিয়া প্রথম অনুভব করিল একদল অপরিচিত লোকের মধ্যে সে দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা কি ভাবিতেছে কে জানে। সটান্ সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সৌভাগ্যক্রমে তখন বাড়ীতে কেহই ছিল না। সারা সকালটা ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া কান্না—শুধু কান্না।

জীবনে প্রথম বিচ্ছেদ বেদনা কি তাহা ক্রিস্তফ্ বুঝিল। ভালবাসা যে হৃদয়ে একবার প্রবেশ করিয়াছে এই বেদনা হইতে তাহার আর নিস্তার নাই। সংসার জীবন সমস্তই যেন শূন্য করিয়া বিরহ দেখা দেয়। চারিদিকে মিলনের স্মৃতি, মাঝখানে এই শূন্যতা; তার মধ্যে বাঁচিয়া থাকা কি বিষম পরীক্ষা! যেন পায়ের তলায় মাটি সরিয়া গিয়া এক অতলস্পর্শ গহ্বর হঠাৎ গিলিতে আসে। তার মধ্যে পড়ি পড়ি, মৃত্যুর মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইব—এম্‌নি করিয়া বাঁচা! বিচ্ছেদ, সে ত' মৃত্যুর মুখোস। ক্রিস্তফ্ যে সব জায়গার সঙ্গে তার প্রিয়তমার স্মৃতি জড়িত প্রত্যেকটি দেখিয়া বেড়ায়। মিন্নার মা তাঁর বাগানের চাবিটি ক্রিস্তফ্‌কে দিয়া গিয়াছেন। সে প্রতিদিন বাগানে বেড়ায়। মিন্নার স্মৃতি যেন চারিদিক হইতে আচ্ছন্ন করে।—সাতদিন আগে.. তিনদিন আগে...কাল.. এই কালও ত' সে এখানে ছিল! পাগলের মত এই কথা বলে আর তার শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসে। কত শুভ মুহূর্ত্ত তার নির্ব্বুদ্ধিতায় মান-অভিমানে নষ্ট করিয়াছে, ভাবিতে সে নিজের প্রতি রাগে গর্জ্জিয়া উঠিল! যে সুযোগ সে হেলায় হারাইয়াছে তাহা আর ফিরিবে না।

বাড়ী ফিরিলে সকলকে তার অসহ্য লাগে। এতবড় একটা বিপ্লব তার জীবনে হইয়া গেল, অথচ বাড়ীতে সেই একঘেয়ে খাওয়াদাওয়া, কথা—অসহ্য। সমস্ত লোক যে-যার নিজের কাজে আছে, কেউ হাসে, কেউ খাটে কেউ চেঁচায়। পোকাগুলো ঠিক আগেকার মতই আওয়াজ করে, আকাশটা পূর্ব্বের মতই আলোয় ভরা—সব কিছুকেই সে ঘৃণা করে। নিখিল বিশ্বের এই নির্ম্মম ঔদাসীন্য যেন তাহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলে। বেচারা ক্রিসতফ্ এখনো বোঝে নাই যে, সে আপন স্বার্থপরতায় সকলকে পরাস্ত করিয়াছে। তার নিজের একটু ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া আর কোন জিনিষেরই যেন মূল্য নাই। এতটুকু করুণা এতটুকু প্রেম সে আর কাউকে দিতে পারে না। কলের মত সে কাজ করিয়া যায়। বাঁচিবার সমস্ত প্রেরণা যেন কে কাড়িয়া লইয়াছে।

বাড়ীর লোকেদের সঙ্গে সন্ধ্যায় খাইতে বসিয়াছে, ক্রিস্তফ্ নির্ব্বাক, মুহ্যমান। হঠাৎ দরজায় কড়া নড়িয়া উঠিল। ডাকপিয়ন তার নামে একখানি চিঠি লইয়া হাজির। হস্তাক্ষর দেখিবার পূর্ব্বেই ক্রিস্তফ্ বুঝিয়াছিল, চিঠিখানি কার। সাম্‌নেই চার জোড়া চোখ তীক্ষ্ণ লোলুপ দৃষ্টিতে চিঠিখানি দেখিতেছিল ক্রিস্তফ্ পড়ে কি না। ক্রিস্তফ্ চিঠি খুলিলই না, যেন হেলাভরে পাশে ফেলিয়া রাখিল। কিন্তু তার ভাইগুলির উঁকি ঝুঁকির অন্ত নাই। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে কোনরকমে খাওয়া শেষ করিয়া ক্রিস্তফ্ ঘরের ভিতর গিয়া দরজা বন্ধ করিল। তার বুকের ভিতরটা যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। চিঠি খুলিতে যাইয়া প্রায় ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করে আর কি! চিঠিতে কি থাকিবে কি পড়িতে যাইতেছে, শুধু ভাবিয়াই ক্রিস্তফ্ মূর্চ্ছা যায় আর কি। কিন্তু প্রথম অক্ষরটি পড়িতেই এক অপূর্ব্ব আনন্দ ও শান্তি যেন তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। নিবিড় স্নেহে আপ্লুত দুই তিনটি কথা। মিন্না 'প্রিয়তম ক্রিস্তফ্ আমার" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে। লুকাইয়া তাহাকে চিঠি লিখিয়াছে।

আরো কত কথা। মিন্‌না কাঁদিয়াছে, প্রতি সন্ধ্যায় সেই তারাটি দেখিয়াছে, ফ্র্যাঙ্কফোর্ট একটা বিরাট শহর, কি চমৎকার সব দোকান! কিন্তু সে কোন দিকেই মন দেয় নাই, শুধু তার কথাই ভাবিয়াছে। মিন্‌না মনে করাইয়া দিতেছে যে, সে যতদিন দূরে থাকিবে ক্রিস্‌তফ্ আর কাহারও সঙ্গে মিশিবে না, শুধু তাহার কথাই ভাবিবে। তার কাছে আজীবন বাঁধা থাকিবার প্রতিজ্ঞা সে যে করিয়াছে। জয়ী হইতে হইবে, যশস্বী হইতে হইবে। কাজ কর, সংগ্রাম কর। তার পরে যে ছোট্ট ঘরখানিতে শেষ বিদায় লইয়াছিল তার কথা কি ক্রিস্‌তফের মনে আছে? স্বপনে মিন্‌না সেইখানে তেমনি করিয়া কতবার ক্রিস্‌তফকে আদর করিয়াছে। চিঠির তলায় "চিরদিনের তোমারই—চিরকালের" বলিয়া মিন্‌না স্বাক্ষর করিয়াছে। পুনশ্চ দিয়া আবার লিখিয়াছে—"তোমার সেই বিশ্রী লক্ষ্মীছাড়া টুপিটা ফেলে দিয়ে একটা ভাল স্ট্র-হ্যাট্ কেন বেশ চওড়া নীল ফিতে-দেওয়া। এখনকার গণ্যমান্য লোকেরা সবাই এই রকম টুপি পরছে, নিশ্চয়ই কিনো, লক্ষ্মীটি!'

এক দুই তিন চার বার পড়িয়া তবে ক্রিস্‌তফ্ চিঠিখানার মানে বুঝিল। চিঠি পাওয়ার আনন্দে সে এমনিই বিভোর যে সে কতটা সুখী হইয়াছে তাহাও যেন ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারিতেছিল না। শ্রান্ত হইয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। তারপর চুমোয় চুমোয় চিঠিখানা ভরাইয়া দিল। মাথার বালিশের নীচে চিঠিখানি রাখিয়া তার ওপর হাত দিয়া সে যেন এক অপূর্ব্ব তৃপ্তি ও আনন্দের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নিদ্রায় ডুবিয়া গেল।

—ক্রমশ

আগামী কাল

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

দুরের গাঁ থেকে কে একজন ছেলের খোঁজে এসেছে।

পুরোণো বাসিন্দারা কেউ কেউ তাকে চেনে।

"আরে লখ্‌খিকান্ত যে, বলি এদিকে কি মনে করে! —মেটে ঘরের দাওয়ায় পাথর ধরে শিবু যেন ওৎ পেতে বসে থাকে – কারুর পেরুবার যো নেই।

শুক্‌নো মুখে লক্ষ্মীকান্ত দাঁড়িয়ে বলে, ছেলেটার খোঁজে এলাম ভাই, এই দুদিন পাত্তা নেই। মাগী ত দাঁত কপাটি লেগে পড়ে আছে। এদিক পানে দেখেছ নাকি?

কৃত্তিবাস তামাক টান্‌তে টান্‌তে চম্‌কে উঠে কলকে নামিয়ে জিজ্ঞাসা করে—কোন্ ছেলে গো!—তোমার সেই মরণ নাকি!

হ্যাঁগো—সেই পাঁচ বছরেরটি দেখেছিলে মনে নেই! সেও পাঁচে পা দিলে আর এখানকার বাস উঠোলাম না!

শিবুতে কৃত্তিবাসে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে। শিবু কি যেন ইসারা করে—কৃত্তিবাস কথা কইতে গিয়েও সাম্‌লে নিয়ে আবার হুঁকো মুখে তুলে টান দেয়।

লক্ষ্মীকান্ত আবার জিজ্ঞাসা করে—দেখেছ নাকি ভাই—এদিক পানে?

শিবু ঘাড় নাড়ে, তারপর বলে, এদিক পানেত আসেনি ভাই। গাঁয়ে ভাল করে খোঁজ করেছ ত?

লক্ষ্মীকান্ত এসে দাওয়ার একপাশে পা ঝুলিয়ে বসে, তা কি আর বাকি রেখেছি ভাই—এ দুদিন আর কারুর মুখে অন্নজল নেই।

শিবু কৃত্তিবাস দুজনেই চুপ করে থাকে।

লক্ষ্মীকান্ত খানিক বাদে নিজে থেকেই বলে, মাগীটা ক্ষেপে যাবে। দুটো মরল পেটে, আর তিনটে আঁতুড়ে। এটা হবার সময় সবাই বল্লে, হেলায়, অছেদ্দায় রাখ দেখি, শত্তুর হলেও যেতে পারবে না—তাই না মরণ নাম!

আবার সবাই চুপচাপ।

লক্ষ্মীকান্ত বলে যায়, তা লোকের কথা মিথ্যে নয়! হল যখন তখন যেন প্যাকাটির হাত পা, কাঁদতে পারে না—চিঁচি করে, ভাবলুম এও বুঝি চল্ল। কিন্তু বাঁচল, একটু একটু করে সেই প্যাকাটির হাড়ে মাংস লেগে এক বছরের ছেলে এমন দাম্বালে হল যে, সামলায় কার সাধ্যি! গুরুঠাকুর লোহার বেড়ি পায়িয়ে দিয়ে বলে গেলেন—কিছু ভয় নেই—এ ছেলে জলে ডুববে না, আগুনে পুড়বে না—ওর অখ্যায় পরমায়ু।

শুকনির মোটর লরি ইটখোলা থেকে রাস্তা কাঁপিয়ে চলে যায়।

কৃত্তিবাস মুখটা নীচু করেই রাখে, তোলে না! শিবু অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে লক্ষ্মীকান্তের কথা শোনে।

. . . দুদিন ধরে মাগীকে সেই কথাই ত বোঝাচ্ছি, তা মেয়েমানুষ কি বুঝতে চায়! আমি বলি তিন তিন বার অমন বাঁচা যে ছেলে বাঁচে সে ছেলের কখন কিছু হতে পারে না, দেখ্‌, ছেলে তোর ঠিক ফিরে আস্‌বে, ঠাকুর একটু ছলনা করছেন বই ত নয়। একবার কলেরায় ছেলে এই যায় সেই যায়, দুদিন বাদে ওলাবিবি ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন, আর একবার অমনি পয়সা গিলে ফেলে ছেলে নীল বরণ হয়ে একেবারে যায়—তবু কিছু হল না ত। মরবার হলে ও আগেই মরত। মাগী কিছুতেই বুঝবে না—খালি

বলে—ওগো পাছে যত্ন আত্তি করলে চলে যায় ভয়ে ভালো করে কোলে কোরে আদর যত্ন করতে পাই নি যে গো, বুকটা ফেটে গেছে, তবু বাছাকে বুক থেকে নামিয়ে নামিয়ে রেখেছি . . .

লক্ষীকান্ত চোখের জল মোছে।

শিবু কথার মোড় ফেরাবার চেষ্টা করে। বলে, আচ্ছা আমাদের অঘোরের খবর কি বলতে পার?—অঘোর হাজরার?—এখানকার জমি বেচে সাত আটশ টাকা পেয়েছিল না?

অঘোর ত এক মাস হ'ল মরে গেছে!

মরে গেছে কি রকম!

লক্ষীকান্ত মাথা নাড়ে। বলে, হ্যাঁ মরেছে—তবে মরেছে, না বেঁচেছে।

শিবু কৃত্তিবাস কৌতূহলি হয়ে থাকে।

সেই সুন্দরী বৌ-টা ছিল না!

হুঁ!

সে-ই মেরে গেল আর কি—! অঘোর ত বৌ বলতে অজ্ঞান। সাতশ টাকার ত ছ'শ বৌ-এর গয়নাই গড়িয়ে দিলে—চাষা ভূষোর ঘরে তেমন গয়নার নামও কেউ শোনে নি। আর ছুঁড়ি করলে কি—বছর ঘুরতে না ঘুরতে এক বেটা খোট্টা কাপড়-ফিরিওয়ালার সাথে জুটে বেরিয়ে গেল—

তারপর?

লক্ষীকান্ত ছেলে হারাবার কথা কতকটা বুঝি ভুলেছে, উৎসাহিত হয়ে বলতে থাকে, তারপর আর কি! অঘোর ত পাগলের মত হয়ে গেল—সারা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ায়, কোন দিন ঘরে ফিরে দুটো রাঁধে বাড়ে—কোন দিন ফেরেও না—ছেলেটাকে নিয়েই মুস্কিল আর কি! ছুঁড়ি এত বড় রাক্ষুসী, ছেলেটাকে ফেলে গেছে চলে!

শুধু পরের কথা বলেই মানুষ বোধ হয় নিজের কথা ভুলতে পারে।

লক্ষীকান্ত কৌতূহলি শ্রোতাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে,—ছেলেটাকে কোন দিন বা আমরা এনে রাখি, কোন দিন বা বিশুদের বাড়ি নিয়ে রাখে।

অঘোরকে বল্লে ত আর বুঝবে না। যে ডাইনি বেটি ভ তার-পুত যেচেই পালাল, তাকে খুঁজে কি হবে বলতে গেলে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, কোন দিন বা বুড়োমদ্দ কেঁদেই ফেলে। কাজ নেই কর্ম্ম নেই, ঘরে যে কটা টাকা ছিল তাতে আর কদিন চলবে, তবু তার খোঁজার বিরেম নেই।

কৃত্তিবাস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, সে কি আর খুঁজে পাওয়া যায়!

—না পেলে ত ভাল ছিল, পেয়েই যে হল গোল। আর পেল কোথায়? সেই পুরোণো শহরের উত্তরে একটা বেবুশ্যে পাড়ায়। ছুঁড়ির সেখানে হাড়ির হাল হয়েছে, থাকে একটা ঘুপসি খাপরার ঘরে; গয়নাগুলো সব সে বদমাসটা নিয়ে নিয়ে বেচেছে। সে বেটা কোন দিন আসে কোন দিন আসে না, এলে মদ খেয়ে মারপিট করে। ছুঁড়িটার দুরবস্থার আর সীমে নেই, কোনদিন খেতে পায় না, সর্বাঙ্গে মারের কালসীটে দাগ। তাই খুঁজে পেয়ে অঘোরের কি আহ্লাদ, যেন স্বগগ হাতে পেল। তারপর সে ছুঁড়িকে একটি কথা কয় না, তুই ঘরে চ, তোর গয়না আবার আমি রোজগার করে গড়িয়ে দেব—তুই শোন্, যা চাস্ তাই হবে, শুধু তুই ঘরে চল। কিন্তু সে এতবড় হারামজাদী ছুঁড়ি—না-খেয়ে মার খেয়ে সেখানে পড়ে থাকতে সেভি আচ্ছা, তবু কিছুতে এল না। বল্লে তোর গরজ থাকে তুই এখানে এসে দেখে যাস্!

রক্ত গরম হবার কথা বটে। শিবু বলে, আমি হলে অমন বৌকে খুন করে ফাঁসি যেতাম।

হুঁ! খুন করবে অঘোর! সবাই বল্লে, নালিশ কর—অঘোর ফুসলে বৌকে বার করে নিয়ে গেছে বলে নালিশ ঠুকে দে। ও বেটারও জেল হয়ে যাবে, আর তোর বৌকে চাস্ তাও পাবি। অঘোর শুধু বল্লে, 'উঁহু" তারপর কদিন দেখি না ভোর চারটে না বাজতে অঘোর বেরুতে সুরু করেছে। "কোথা যাও অঘোর?"

একটা কাজ পেয়েছি, ভাই কাজ করে জেটিতে, যেতে আসতেই পাঁচ কোশ! বল্লাম—পাঁচ কোশ হেঁটে কাজে যাবার কি দরকার, এখানে কি একটা কাজ যুটত না?

বলে, "একটু বেশী রোজগারহয় ভাই!" রোজগার না হয় বেশী কিন্তু প্রাণটা ত রাখা চাই, আর পেট ত দেড়খান', একটা মদ্দ আর একটা ছেলে বেশী রোজগারের দরকারই বা কি! অঘোর আর কথা কয় না। অনেক পেড়াপিড়ি করাতে বলে, সেখানে কিছু দিতে হয়— বড্ড কষ্ট।

শুধু যায় না, রোজগারের সমস্তটা সেখানেই ঢেলে দিয়ে আসে। ছেলেটাকে খাইয়ে নিজে আধপেটা হয়েই থাকে। তার ওপর হাড়ভাঙা খাটুনি, সকাল থেকে সন্ধ্যে, তাতেও হয় না, আবার রাতে বাড়তি খাটে—নইলে নাকি সেখানে চলে না! চলবে কি করে? অঘোর টাকা দেয় আর সে বদমাসটা তাতে মদ খায়। অঘোর রক্ত তুলে টাকা দেয়, পাছে ছুঁড়ির কষ্ট হয় বলে, আর রামা মাগী-মদ্দে তাতে ফুর্ত্তি করে। খেটে খেটে ছমাসে অঘোরের বিট্‌ পাঁজরা বেরিয়ে পড়ল!

দম নেবার জন্যে লক্ষ্মীকান্ত একটু থামে। কাছেই কোন নতুন বাড়ি থেকে তালে তালে ছাত পেটার শব্দ আসে।

গাঁয়ের সবাই বল্লে, অঘোর তুই পুরুষ মানুষ না কি? তোর বৌ বেশ্যে হয়ে আরেক জনকে নিয়ে পড়ে আছে আর তুই তার খরচ জোগাচ্ছিস্! অঘোর চুপ করে শুধু শোনে,—রা করে না। আমরা বল্লাম, পুরুষমানুষ তোর ভাবনা কি অঘোর? আবার একটা বে কর্, সুন্দুরী মেয়ে কি আর ত্রিভুবনে নেই, তার চেয়েও সুন্দুরী মেয়ে জোগাড় করে দেব। অঘোর শুধু একটু হাসে। ছুঁড়িটা ঘরে ঢুকতে দেয় এই যেন ওর কত বড় ভাগ্যি। দিনের পর দিন ট্যাঙস্ ট্যাঙস করে জেটিতে যায় জাহাজের মাল খালাস করতে, সেখান থেকে আবার লম্বা পাড়ি ছুঁড়িটার কাছে রাত এগারোটায় ধুঁকতে ধুঁকতে ঘরে ফেরে। তাই কি ছুঁড়ি ছেদ্দা করত—দুদিন টাকা না পেলে দূর করে দিত খেদিয়ে। তবু সেখানে যাওয়া চাই।

তারপর?

তারপর আর কি! ভগবানেরও বুঝি আর সইল না, এমনি ত হাড়গুলো জিরজির করত—সেদিন 'কেরেন' না কি বলে বাপু, তারই চেন খুলে গিয়ে একেবারে একশ মণের বস্তা পড়্‌ত পড়্‌ ওরি মাথায়।

একটু চুপ করে লক্ষ্মীকান্ত বল্লে, গিয়ে আর চিনতে পারলাম না, থেঁৎলে, গুঁড়িয়ে সে এক বিতিকিচ্ছি কাণ্ড, ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়।

সবাই মুখ নীচু করে কি যেন ভাবে।

লক্ষ্মীকান্তও বুঝি ছেলের কথা ভুলেছে! মাথা নীচু করেই বলে, এখানকার বাস্ টাকার লোভে যে কজন তুলেছে, তাদের ভালো আর কার হ'ল বল। হাজার হোক্ বাস্তু দেবতার অপমান ত একটা বটে! রাজবল্লভ ত সব ক'দিন ধানের কারবার করতে গিয়ে ফুঁকে টুঁকে দিয়ে হেথাকার ইট্‌খোলায় কাঁচা ইট্-গড়ছে। রঙ্গলাল ত দেশ-ছাড়া, হট্‌করে কাউকে না বলে কয়ে সস্তার লোভে বিঘে দশেক জমি কিনে বসল, তার দলীলপত্রই কাঁচা। জমি কিনতে যা গেছল তা গেছল, তার ওপর যে কটা টাকা এখানকার জমি বেচায় তবু ছিল, মকদ্দামার পর মকদ্দামা চালাতে তাও ঢাকশুদ্ধু বিসর্জ্জন হয়ে গেল। সব খুইয়ে কোথায় যে উধাও হয়ে গেল তার আর পাত্তাই নেই এই দু'বছর। ভালো কারুর হয় নি এখানকার বাস উঠিয়ে।

শিবদাস পথে যেতে যেতে আড্ডা দেখে চমকে দাঁড়ায়। বলে, আরে লক্ষ্মীকান্ত যে, খবর কি! তারপর এসে দাওয়ার ওপর উঠে বসে।

খবর আর কি ভাই; এই বলছিলাম,—বাপ-পিতমর ভিটে ছেড়ে গিয়ে ভালো কারু হয়নি, টাকার লোভ না করে এখানে থাকলেই ভালো হত।

শিবদাস উত্তেজিত হয়ে বলে, ভালো হয়নি? ভালো হয়নি কি রকম!—খুব ভালো হয়েছে। আমরা আহাম্মুক, তাই এখানে মরতে পড়ে আছি। আর আমিও এবার পাত্তাড়ি গুটোচ্ছি, সেই পয়লা স্তক জমিটা কেনবার জন্যে শুকনি ঝুলোঝুলি করছে—শেষে চটে গিয়ে কোন্ দিন আগুন লাগিয়ে দেবে—কাজ কি বাবা আমার ঝঞ্ঝাটে, আপনিই সরে পড়ব ভালোয় ভালোয়; তবু ছানাপনাগুলো নিয়ে শান্তিতে থাকব একটু! এই যে কাদের ছেলেটা পরশু...

শিবু কৃত্তিবাস প্রবল ভাবে ইসারা করে, কিন্তু কাণা শিবদাস বলে যায়, লরি চাপা পড়ে মরল, তার বাপমা'র কথা ভাব দেখি একবার ..সবেধন নীলমণি, পায়ে বেড়ি দিয়ে রেখেছিল, মরা দেখতে পাওয়া দূরে থাক, এখনও খরচটা পর্য্যন্ত পায়নি! আমার সহরের সুখে কাজ নেই বাবা, ছেলেপুলেগুলি অপঘাত থেকে ত বাঁচবে!

শিবু কৃত্তিবাস বোধ হয় মাটিতে মিশে যেতে চায়।

লক্ষ্মীকান্তের সমস্ত মুখ কাগজের মত শাদা হয়ে যায়, খানিক উদ্‌ভ্রান্তের মত বসে থেকে সে হঠাৎ হন্‌হন্ করে বেরিয়ে যায়।

শিবদাস হতভম্বের মত দুজনের মুখের দিকে চায় শুধু!

সন্ধ্যেবেলা হরি ময়রার দোকানে যেতে যেতে শিবু বলে, দেখ কৃত্তিবাস, আমি আর ঠাকুর-দেবতা মানিনে।

কৃত্তিবাস একেবারে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, তার মানে?

শিবু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলে, দেখ বিলেত থেকে শুধু মানুষ আসেনি, ঠাকুর-দেবতাও নতুন নতুন এসেছে!

কৃত্তিবাস আবার চলতে শুরু করে বলে, তুই পাগলের মত যা-তা বকিসনি, ঠাকুর-দেবতার কান আছে।

শিবু তাকে থামিয়ে বলে, থাকুক কান আমি পরোয়া করি না, কান থাকলেও জান্ আর আমাদের ঠাকুর-দেবতার নেই তুই জেনে রাখিস। বিলেতের দেবতাদের সঙ্গে তারা আর এঁটে উঠতে পারছে না।

পাপ হবার ভয়ে কৃত্তিবাস নাক কান মলা খায় কিন্তু শিবু ছাড়ে না, নিজের নতুনধর্ম্ম ব্যাখ্যা করতে করতে বলে—

পারলে আর তিন তিনবার যমের হাত এড়িয়ে লক্ষ্মীকান্তের বেড়ি-পরা ছেলে লরী চাপা মরত না...দে তা কত রকমই ত হতে পারে, ওই মোটর লরিরও যে দেবতা নেই কে বলতে পারে! আচ্ছা মা-শেতলার কথাই ধর, মা যদি জাগ্রতই হত তা হলে টীকে দিয়ে যারা বসন্ত আটকাতে চায় তাদের নির্ব্বংশ করে ছাড়ত না। তারা ত দিব্যি বেঁচে আছে দেখছি ভাই।

শিবুর সঙ্গ থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্যই বোধ হয় কৃত্তিবাস আরো জোরে জোরে পা চালায় কিন্তু শিবু তার নাগাল ধরে বলে তুই দেখিস এবার, আমি বারোয়ারীর চাঁদা দেব না।

* * *

সহর এগুচ্ছে না কি?

ডাকঘর

কল্লোলে বিজ্ঞাপিত "সরযূবালা স্মৃতিপদক"টি শ্রীযুক্ত দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পাইয়াছেন। গত সংখ্যায় এই সংবাদটি ভুলক্রমে প্রকাশিত হয় নাই। জয়পুরের শ্রীমতী বিমলা দেবী তাঁহার মাতার স্মৃতি-কল্পে ভাল ছোটগল্প রচনার জন্য একটি রৌপ্যপদক দিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দেন। এই ঘোষণার ফলে যতগুলি ছোটি গল্প আমরা পাই তাহার ভিতর শ্রীযুক্ত দেবীদাস বাবুর 'মৃগতৃষ্ণিকা' গল্পটিই উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্ব্বাচক মণ্ডলীদ্বারা বিবেচিত হয়। আমরা দেবীদাস বাবুকে সাহিত্যক্ষেত্রে সাদর অভিবাদন জানাইতেছি।

শ্রাবণের সংখ্যাতেও ছোটগল্প প্রতিযোগিতার জন্য একটি পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতা দ্বারা গল্প-সাহিত্যের উন্নতি হইবে মনে করিয়াই দাতা এই সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি মনে করেন, এই সামান্য অর্থ-পুরস্কার দ্বারা অন্ততঃ এক জন বাঙলার লেখকও নিজের ইচ্ছামত কোনও পুস্তক ক্রয় করিতে পারিবেন। আমরাও জানি, অনেকে একান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও বই কিনিয়া পড়িতে সমর্থ নহেন। এই সুযোগে হয় ত কেহ এককালীন কয়েকখানা বই কিনিবার সুবিধা পাইবেন। এই কারণে নগদ টাকাই পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হইবে।

গল্প-সাহিত্যের উন্নতির জন্য পূর্ব্বেও অনেকে এরূপ পুরস্কার দিতেন। তাহাতে গল্প-সাহিত্য রচনায় কোনও উন্নতি হইয়াছে কি না তাহা আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে জানি না। অনেক মাসিক পত্রিকার তরফ হইতে এরূপ পুরস্কার প্রতিযোগিতার আয়োজন হইত। তখন আমাদের মনে হইত এরূপ পুরস্কারের দ্বারা লেখকবর্গের অবমাননা করা হয়। আমাদের বিশ্বাস যাঁহারা ভাল লিখিতে পারেন তাঁহারা পুরস্কার না পাইলেও ভাল না লিখিয়া পারেন না। এবং শুধু মাত্র পুরস্কারের লোভে কেহ যে হঠাৎ ভাল গল্প লিখিয়া ফেলিবেন তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু পরে জানিতে পারিয়াছি, এরূপ প্রতিযোগিতায় অনেক অখ্যাত ও অবজ্ঞাত লেখক গল্প লিখিতে প্রবৃত্ত হন্।

আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন্ লেখক কত বেশী লিখিয়াছেন ও কতকাল ধরিয়া লিখিতেছেন তাহারই উপর নির্ভর করিয়া লেখকের খ্যাতি বা যশ হয়। এই খ্যাতি লাভ করিয়া যাঁহারা স্বনামধন্য হইয়াছেন তাঁহারা নিজের রচনা সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন এবং দাম্ভিক। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, এরূপ লেখকবর্গ তাঁহাদের রচনা যে কখনও খারাপ হইতে পারে এরূপ ধারণাও করিতে অক্ষম।

পূর্ব্বে যে ধরণের লেখা ভাল বলিয়া পাঠক গ্রহণ করিত, আজকাল সে সে লেখা ভাল বলিয়া বিবেচিত নাও হইতে পারে এ কথা খুব কম লেখকই বুঝিতে পারেন। পুরাতন লেখকদের ভিতর এই অবস্থাটি অত্যন্ত বেশী লক্ষিত হয়।

এই কারণে ঐরূপ অনেক লেখকের কাছে কোনও লেখা চাওয়াও অনেক সময় বিশেষ বিবেচনার বিষয় হইয়া পড়ে। প্রথমেই মনে হয়, লেখা চাহিয়া আনিয়া ভাল হয় নাই বলিয়া প্রকাশ না করা অত্যন্ত অসঙ্গত কার্য্য হয়। কিন্তু লেখা যদি একেবারে খারাপ হয় তাহা হইলে ছাপিতেও ইচ্ছা করে না। যাঁহারা প্রসিদ্ধ লেখক তাঁহাদের মধ্যে অনেকে যে কত খারাপ লিখিতে পারেন তাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া অবাক হইতে হয়। এইরূপ হইবার একমাত্র কারণ, বিষয় ও প্রকাশভঙ্গী সম্বন্ধে লেখকের নিশ্চিন্ত আলস্য এবং আত্মাভিমান। লিখিবার সময় এবং কাহাকেও তাহা ছাপিতে দিবার সময় লেখক মনে করেন তাঁহার শিরোনাম ঘোষিত যে কোনও লেখা ছাপা হইলেই লোকে আনন্দের সহিত পাঠ করিবে। কিন্তু বিপদ কাগজওয়ালাদের। সাধারণের নিকট সুপরিচিত লেখকের রচনা প্রকাশ না করিলে পাঠকেরা

অতৃপ্ত থাকেন, অথচ লেখা চাহিয়াও এইরূপ প্রমাদ ঘটে।

এইরূপ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের দিক্ হইতেও বলিবার যথেষ্ট আছে। তাঁহারা বলেন এবং আমরাও জানি যে, এক একটা মরশুমে এইরূপ লেখকদের নিকট এত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লেখার জন্য তাগিদ আসে যে, প্রত্যেককে একটা যা-তা কিছু না লিখিয়া দিলে আর তাঁহাদের রক্ষা থাকে না। অন্য দিকে, ইঁহাদের অনেকেই শুধু লেখা লইয়া থাকেন না, জীবনধারণের জন্য অন্য কাজও করিয়া থাকেন। এই কারণে সময়ও ইঁহাদের খুব অল্প।

কিন্তু তাঁহাদের হাতে যতটুকু সময় থাকে তাহার উপযুক্ত লেখাই বোধ হয় সব দিক দিয়া বিধেয়। তাহাতে সংখ্যায় অল্প হইলেও লেখাগুলি অন্ততঃ অপরের পক্ষে পাঠযোগ্য হয়। এইরূপ করিলে অবশ্য সব কাগজ-ওয়ালাকে খুশী করা যায় না। কিন্তু সব কাগজওয়ালাকেই যে লেখা দিতে হইবে এমনও কোনও কথা নাই। কারণ প্রত্যেক কাগজই যে তাঁহাদের লেখার প্রতি কোনও শ্রদ্ধা আছে বলিয়া লেখা চায় তাহা নহে. প্রসিদ্ধ লোকের লেখা ছাপিলে তাহাদের ব্যবসার দিক দিয়া কিছু সুবিধা হয় বলিয়াই দ্বারে দ্বারে অনেকে লেখা কুড়াইয়া বেড়ায়। এইরূপ ধরণের লেখা-ব্যবসায়ীদের হয় ত অন্য আরও অনেক ব্যবসাও আছে। এটাও তাহাদের একটা বাণিজ্য-বিলাস। কারণ তাহারা নিজ জীবনে বিশেষ ভাবে পরিচয় পাইয়াছে যে, সত্যই 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী'। সামনেই পূজার মরশুম আসিতেছে. এখন হইতেই লেখার জন্য দাদন দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে। আগামী আশ্বিনে কে কাহার চাইতে বেশী কথা বলিয়া ও বেশী দাম দিয়া কাহার লেখা ছিনাইয়া লইবে তাহারই জন্য ইহাদের চিন্তা লাগিয়া গিয়াছে। ইহা সত্য যে, যে অবস্থার ভিতর দিয়াই একটা ভাল লেখা প্রকাশিত হউক তাহাতে পাঠক-সাধারণের উপকার হয়। কিন্তু কোন্ কাগজ কি ধরণের পাঠক পড়ে তাহাও বিবেচনার বিষয়; কারণ আমাদের দেশে এমন লোকও আছে যাহারা রবীন্দ্রনাথের লেখাকে বলে হেঁয়ালী। এই ধরণের পাঠকেরা যে কাগজগুলি পড়ে সে কাগজে একটি উৎকৃষ্ট লেখা প্রকাশিত হইলেও যে তাহার উপযুক্ত সম্ভাবণ প্রাপ্তি ঘটে এরূপ মনে হয় না। আমাদের মনে হয়, এইজন্য প্রত্যেক চিন্তাশীল লেখকেরই উচিত, কোন্ কোন্ কাগজে তাঁহার লেখা প্রকাশিত হইলে উপযুক্ত পাঠকও পাইবেন সে বিষয়ে বিবেচনা করা। অবশ্য যাঁহারা গ্যালারী-লেখক তাঁহাদের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। লিখিতে লিখিতে যাঁহারা কোথায় করতালি পাইবেন কল্পনা করেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। এমন লেখকও আছেন যাঁহারা কেবল মাত্র অর্থের জন্য লেখেন না। অন্ততঃ তাঁহারা লেখা বিতরণ বিষয়ে সুবিবেচনা করিতে পারেন। ছোট হোক্ বড় হোক্ যে কাগজে তাঁহার লেখা দেওয়া অভিপ্রেত নয় সে কাগজওয়ালাকে তিনি স্পষ্ট বলিয়া দিতে পারেন যে তিনি লেখা দিবেন না।

বাঙালাদেশে যে ধরণের লেখা প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, বর্ত্তমানে তাহার ভিতর কিছু পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। ইহার মূলে লোকশিক্ষা ও লোকের চিন্তাশক্তির প্রসারতার পরিচয় পাওয়া যায়। আগে যেমন পাঠকদের ভিতর বিশেষ কোন শ্রেণীবিভাগ ছিল না, এখন আর সে অবস্থা নাই। পাঠকদের ভিতরও শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে। এক একটা কাগজের পাঠক আলাদা। সেইজন্য যে কোনও লেখক কাগজের প্রচলন-রীতি অনুসরণ করিয়া অনায়াসে ঠিক করিতে পারেন কোন্ কাগজে তাঁহার লেখার ভিতর দিয়া পাঠকের সহিত তাঁহার চিন্তা-ধারার পরিচয় স্থাপিত হইবে.

পুরাতন লেখকদের ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া এমন একটা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে. সত্য সত্যই অনেক প্রতিভাশালী নূতন লেখকের আর ঠাঁই নাই। কারণ নূতন লেখককে লোকে চেনে না, তাঁহাদের লেখা ছাপিয়াও কাগজের নাম হয় না। ইহাই সাধারণ মনোভাব। কিন্তু এমন অনেক কাগজও আজ কাল চলিতেছে যাহাদের সম্বল বেশীর ভাগ নূতন লেখকের লেখা। ফলে এই নূতন লেখকের লেখা পড়িবারও একটি পাঠকশ্রেণী আজ বাঙলাদেশে গঠিত হওয়া

সম্ভব হইয়াছে। অবশ্য কোনও কোনও নূতন লেখক বহু আয়াসে যখন কিছু কিছু খ্যাতি লাভ করে তখন কোনও কোনও কুলীন কাগজওয়ালা তাহাদের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিয়া থাকেন। তাহাতে নূতন লেখকের উপবাসের সংখ্যা না কমুক অন্তত নাভিশ্বাসটা অনেক কমিয়া যায়।

আমাদের দেশে কেবলমাত্র লেখক হইয়া বাঁচিয়া থাকা দুরূহ কাজ। যাঁহারা লেখক, তাঁহাদের অন্নের যেমন অভাব, পাঠ করিবার সুযোগেরও তেমনি অভাব। এ কথা সত্য যে, বিশ্বব্যাপী চিন্তাস্রোত হইতে আহরণ না করিলে কাহারও চিন্তাশক্তি, পরিস্ফুট হওয়া সম্ভব নহে। এই চিন্তার ধারার সহিত পরিচিত হওয়ার অনেক পথ। বই পড়া তাহার মধ্যে একটি। অন্তত শুধু বিভিন্ন দেশের চিন্তাশীল লেখকদের বই পড়ার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহা শতকরা একজন লেখকের ভাগ্যে ঘটে কি না সন্দেহ। কোনও চিন্তাশীল লেখকের পক্ষে ইহার অপেক্ষা কষ্টকর আর কিছু নাই। নানা দেশের লোকের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়, নানা দেশের সভ্যতা ও বিচিত্রতা হইতে তথ্যাদি আহরণ করা এ সকল ত বহু লোকের ভাগ্যেই ঘটে না। কিন্তু কেবল মাত্র যে খাওয়া তাহার খরচও অনেক নূতন লেখকের অদৃষ্টে এক প্রকার অসাধ্য ব্যাপার। এ জন্য আমাদের সমাজ বা কোন্ সম্প্রদায় বিশেষ দায়ী এ কথা বলিবার এখনও সময় আসে নাই। কিন্তু যে সকল প্রসিদ্ধ ও অর্থ-বৃত্তি দানে সক্ষম কাগজওয়ালা আছেন, তাঁহারা যদি নূতন লেখকদের মধ্যে যাঁহারা কিছুও শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাঁহাদের দিকে বারেক ফিরিয়া তাকান তাহা হইলে বাঙলা দেশের লেখার ধারার অনেক উন্নতি হওয়া অন্তত আশা করা যায়।

কেবল যে কাগজওয়ালা স্বত্বাধিকারী এই জন্য দায়ী তাহা নহে। তাঁহাদের বেতনভোগী যে সকল কর্ম্মচারী থাকে তাহারাও এ জন্য অনেকখানি দায়ী। হয় ত নানা উপায়ে কোনও কাগজের আপিসে একটি চাকরী পাইয়াছে। অথচ এককালে লেখার দিকে ঝোঁক ছিল এবং আকাঙ্ক্ষা ছিল নিজ রচনার পক্ষপুটে চড়িয়া একবার দিগ্বিজয় করিবে। মনের ওজন বুঝিতে না পারিয়া শেষকালে পাখা ছিঁড়িয়া মাটিতে পড়িতে হইয়াছে! এই সকল লোকেরাই নবীন লেখকদের প্রতি বিরূপ বেশী। ইহার ভিতর হিংসা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার অভাবজনিত দুঃখ দুই-ই আছে। ইহাদের পক্ষে পরশ্রীকাতর হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

সমালোচনার্থ সম্পাদকের নিকট যে সকল পুস্তকাদি আসে সময়ে সময়ে ইহারাই তাহার সমালোচক এই সকল লোকের সমালোচনাগুলি পড়িলেই বুঝা যায় কোনও বিশেষ কারণে হয় ত কোনও রচয়িতার প্রতি ইহাদের কাহারও বিদ্বেষ ভাব আছে বা বিশেষ কারণে কোনও রচয়িতার সহিত ইহাদের কাহারও বাধ্যবাধকতার বন্ধন আছে। খুব প্রসিদ্ধ বাঙলা কাগজেও এরূপ দুর্ঘটনা আজকাল ঘটিতেছে। খুব সম্ভব উক্ত কাগজগুলির সম্পাদক মহাশয়েরা এ বিষয়ে যথোচিত মনোযোগ দেন্ না। নচেৎ এরূপ দুর্বিনীত ও অসংবদ্ধ সমালোচনা কোনও কাগজে প্রকাশিত হওয়া শোভন নহে। এরূপ সমালোচনার জন্য আজকাল বাজারে কতকগুলি কাগজ এমনিতেই আছে। তাহাদের কাজ অন্যকে নিন্দা করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণিত করা। সে সকল কাগজের সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করার প্রয়োজনই নাই। কারণ পথে চলিতে গেলে ভদ্র ব্যক্তিরা সমস্ত উপদ্রব হইতেই নিজেদের বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করেন। সে কথা যাক্। কিন্তু বাস্তবিক যে সকল কাগজের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে লোকসাধারণের শ্রদ্ধা আছে, মতামত সম্বন্ধে আস্থা আছে, সেই সকল কাগজে যাহাই প্রকাশিত হউক সাধারণের কাছে তাহার একটা মূল্য থাকা স্বাভাবিক। সে জন্য সে সকল কাগজের দায়িত্বও বেশী। কাহারও নিন্দা করিয়াই কেহ বড় বলিয়া কোনও কালে প্রমাণিত হয় নাই। বিজ্ঞ সম্পাদক বা কাগজের কর্তৃপক্ষ বোধ হয় এ কথা জানেন। তৎসত্ত্বেও তাঁহাদের পরিচালিত কাগজে যেখানে সমালোচনার আব্দার ধরিয়া পরনিন্দার প্রশ্রয় দেওয়া হয়

সেখানে কাগজের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা কমিয়া যাওয়া কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অসংবদ্ধ সমালোচনার দ্বারা লোকশিক্ষার ত ব্যাঘাত ঘটেই, পরন্তু বিশেষ বিশেষ কাগজের মতামতের উপর সাধারণের যে একটা অনুরাগ তাহার উপরেও অন্যায় ভাবে হস্তক্ষেপ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায়, সমালোচনার্থ পুস্তক না পাঠাইলেও কোনও কোনও কাগজে তাহার সমালোচনা বাহির হয় এবং তাহা নিন্দায় পরিপূর্ণ থাকে।

আজকাল 'অচল সাহিত্য' বলিয়া সমালোচকবর্গ যে একটা আন্দোলন তুলিয়াছেন, তাহার মূলেও পরশ্রী-কাতরতার স্থানই অনেকখানি মনে হয়। এ ধারণা অমূলক নহে, লেখার ভিতর দিয়া অনেক সময় মানব-প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁহারা সাহিত্য চর্চ্চা করিতে যাইয়া পরচর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের উক্তিগুলিতেই ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সব কথার উপরে এই কথাই মনে হয়, আমাদের সাহিত্যের উন্নতি হইবে কেমন করিয়া! আমরা কথায় কথায় গর্ব্ব করিয়া থাকি, বাঙলা সাহিত্য ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। কিন্তু তবুও এ কথা বোধ হয় অনেকে স্বীকার করিবেন যে, ইংরেজী সাহিত্য পৃথিবীর অন্য অনেক সাহিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার একটা কারণ, ইংরেজেরা অন্য ভাষার অনেক পুস্তকের অনুবাদ করেন। এমন কি অনেক অসভ্য-জাতির ছড়া গান ও কাহিনী প্রভৃতির অনুবাদ করিয়াও ইংরেজেরা নিজেদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। প্রত্যেক জাতির ভাষার ভিতর যে রসশ্রী আছে তাহা রূপান্তরিত হইয়া বিশিষ্ট সাহিত্যের উন্নতির ও সৃষ্টির সাহায্য করে। এই কারণে বাঙলার প্রত্যেক পল্লীর যে বিশেষ চিন্তার ধারা আছে তাহার সহিতও পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। ভারতের যে সকল অন্যান্য জাতির সাহিত্য আছে তাহারও অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। তামিল, তেলেগু, হিন্দী, পার্শী, গুজরাটি সাহিত্য হইতে রস গ্রহণ করিয়া আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা করা উচিত। কেহ কেহ খাঁটি বাঙলা সাহিত্যের সৃষ্টির পক্ষপাতী। তাঁহারা আমাদের সাহিত্যের উপর কোনও বিদেশী সাহিত্যেরই প্রভাব চান না। তাঁহাদের এই অভিলাষকে যথোচিত শ্রদ্ধা দান করিয়াও মনে হয়, বাঙলা সাহিত্যের যে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব বর্জ্জিত হওয়া উচিত এ কথা সত্য নহে।

অন্য ভাষা হইতে কিছু অনুবাদ করিলেই সাহিত্য বিজাতীয় ভাবের সংস্পর্শে জাতিভ্রষ্ট হইবে তাহা মনে করা ভুল। মানুষের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও ভাবে জাতিভেদ নাই। প্রত্যেক মানুষ এই কারণে প্রত্যেক মানুষের অপরিচিত বন্ধু। তাই আমরা সকলে মিলিয়া একে অপরের শ্রেষ্ঠ চিন্তার রসাস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হই। আমাদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্ন দুইটি— রামায়ণ ও মহাভারত, বিদেশীয় সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শে রচিত। কিন্তু বিদেশীয়েরা এই দুইখানি মহাকাব্যও নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়া ইহার সমগ্র রসটুকু গ্রহণে চেষ্টা পাইয়াছেন। এই জন্যই যে বিদেশী সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাবে দূষিত হইয়াছে তাহা নহে। আজকাল বিদেশীয় সাহিত্য হইতে যে অবাধ অনুবাদ-প্রথা বাঙলা সাহিত্যে প্রচলিত হইয়াছে তাহাতে অনেক বাঙালী চিন্তান্বিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আমাদের গল্প বা উপন্যাসগুলি বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণেই রচিত হইয়া আসিতেছে। গল্প ও উপন্যাসের এই বিশেষ ধারাটিই সম্পূর্ণ বিদেশী। কিন্তু তবু এগুলি বাঙালীর সম্পূর্ণ নিজস্ব জিনিষ বলিয়া সমাদৃত। সুতরাং অনুবাদ-সাহিত্য যে দেশীয় সাহিত্যের কোনও রূপ অনিষ্ট করে এ কথা ভাবা ভুল।

মানুষের উদ্বৃত্ত শক্তি হইতেই সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু নানাপ্রকার বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে আমাদের এই উদ্বৃত্ত শক্তি শীর্ণ জলস্রোতের মত হইয়া উঠিয়াছে। এ দেশ পরাধীন, সেই কারণে এ দেশীয় লোকের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ পর-সম্পদের শ্রীবৃদ্ধির জন্যই ব্যয়িত

হয়। পরের শ্রীবৃদ্ধির জন্য এ দেশীয় লোকের নিরক্ষর থাকাও প্রয়োজন হইয়াছিল। এত দিন আমরা সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়াও উদাসীন ছিলাম। এক্ষণে শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টি ও চিন্তা এই দিকে নিবদ্ধ হইয়াছে। এই নিরক্ষর লোকেরা সংখ্যায় অত্যধিক এবং তাহারা বাস করে গ্রামে। গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল অনুষ্ঠানের সহিত লোকশিক্ষার আয়োজন করা সর্ব্ব প্রথমে উচিত। লোক হিতাহিত বুঝিবার শক্তি ও জ্ঞানটুকু না পাইলে গ্রামের স্বাস্থ্য বা অন্য প্রকার ত্রুটি দূর হইতে পারে না। আমাদের জনসাধারণ অশিক্ষিত বলিয়াই দেশের উন্নতির জন্য যে সকল আন্দোলন হয় তাহা সর্ব্বতোভাবে সফল হয় না। গ্রামকে শিক্ষিত করা সেই জন্য সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। এই লোক-শিক্ষার দ্বারাই গ্রাম উন্নত হইবে। এবং গ্রাম উন্নত হইলেই বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টিকার্য্যে সুযোগ পাইবে।

বাঙলার সাহিত্য-সৃষ্টিকার্য্যে যাঁহাদের অগ্রণী বলিয়া আমরা স্বীকার করিয়াছি, আষাঢ়ের কাজলঘন তপোবনে বুঝি আজ তাঁহারা স্বপ্নমগ্ন। চিত্ত-বিলাসী রামপ্রসাদ, মধুসূদন, সত্যেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন একদিন সমস্ত মেঘাবৃত আকাশ, ছায়াবৃত-অরণ্য, নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিখর ত্যাগ করিয়া প্রকৃতির বিচিত্র মর্ম্মতোরণ আপন হাতে খুলিয়া আষাঢ়ের মেঘ-যাত্রার সহিত চলিয়া গিয়াছেন।

একদিন ইহাদের হারাইয়া আমাদের মন ব্যাকুল হইয়াছিল। কিন্তু যত বর্ষ মাস ফিরিয়া চলিয়াছে—ততই মনে হইতেছে, জীবনকে সঙ্গে করিয়া এই যে জীবনান্তরে যাত্রা ইহাই মানবের মুক্তি। তাহা মৃত্যু নয়।

বাঙলার সাহিত্য-লোক হইতে আমরা এই আষাঢ়ে আবার একজন বিশিষ্ট সাধককে হারাইয়াছি। পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বাঙলার নাট্য-সাহিত্যে এক নবযুগ আনিয়াছিলেন। আমাদের নাট্য-সাহিত্যে যে mysticism আমরা দেখিতে পাই, ক্ষীরোদপ্রসাদই ইহার প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। সাধারণ নাট্য-লিখনপদ্ধতি হইতে ইনি প্রথমে এক ভিন্ন প্রকৃতির নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। 'আলিবাবা' নাটক ইঁহার অমর কীর্ত্তি।

চিরনূতন বসন্তসঞ্চারের মত তাঁহার আলিবাবা নাটক দর্শককে আনন্দোৎপল করিয়া তোলে। 'আলমগীর' নাটকের উদীপুরী ও আলমগীরের চরিত্রসৃষ্টি সাহিত্যের নূতন সম্পদ। বিশেষ আলমগীরের মনোরাজ্যের বিভীষিকা ও আত্মবিশ্বাসের ভঙ্গুরতা মানবচরিত্রকে বিশেষভাবে পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছে। বিরাট শক্তিশালী বাদসা,—তিনিও স্নেহে কোমল, মমতায় প্রশান্ত, চিরতৃষিত, প্রণয় পিপাসিত। সকল মানুষের মত আলমগীর বাদসাহও সত্যকে ভয় করেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের এই চরিত্রসৃষ্টি অপূর্ব্ব। বাঙলা নাট্যমঞ্চে ক্ষীরোদপ্রসাদের বহু নাটক অভিনীত হইয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ নিজে রসবেত্তা ছিলেন বলিয়া অপর কাহারও রসের চৌর্য্যবৃত্তি তাঁহাকে করিতে হয় নাই। শেষকালে তাঁহার রচিত 'নরনারায়ণে' যে কাব্য-সম্পদের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে—এমন আর বহুকাল কোনও নাটকে পাওয়া যায় নাই। বহুকালের এই প্রাচীন প্রদীপটি ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু তাঁহার রচনার ভিতর তিনি চিরঞ্জীব হইয়া রহিলেন। মৃত্যুর বাতাস জীবনের শিখাটি নিভাইয়া দিয়াছে—তবু জীবনহীন অন্ধকারে তাঁহার সৃষ্টিবৈচিত্র্য আজও উজ্জ্বল। আমাদের মনে হয়, বাঙলার সমস্ত নাট্য-মঞ্চগুলিতে মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাঁহার লোকান্তরের দিনে অভিনয় বন্ধ ছিল। অন্তত এটুকু সম্মানও বাঙলার এই কবিটির প্রাপ্য নিশ্চয়ই। আমরা আশা করি, অচির ভবিষ্যতে বাঙলার সমস্ত নাট্যসম্প্রদায় ও সাহিত্য-সমাজ মিলিত হইয়া ক্ষীরোদপ্রসাদের স্মৃতিরক্ষার্থ উদ্‌যোগী হইবেন।

গ্যাব্রিয়েল দ্য'আনুন্‌ৎসিয়ো

শ্রীগিরিজা মুখোপাধ্যায়

গ্যাব্রিয়েল দ্য'আনুন্‌ৎসিয়ো সম্বন্ধে আমরা যত না জানি, শুনেছি তার ঢের বেশী। সমস্ত বিংশ শতাব্দী সবিস্ময়ে এই অদ্ভুদ লোকটির বিবরণ শুনেছে এবং সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছে যে, এ রকম অদ্ভুদ মানুষ জগতের ইতিহাসে হাতে গোণা যায় এবং মধ্যযুগের পর থেকে এই প্রকৃতির লোক আর জন্মগ্রহণ করে নি।

মানুষের বাইরের বিবর্ত্তনের ফলে আমরা ক্রমশ আমাদের আদিম পূর্ব্ব-পুরুষদের চেহারা থেকে তফাৎ হয়ে এসেছি; মনের দিক দিয়েও আমরা আমাদের পৌরাণিক প্রপিতামহদের সঙ্গে অনেকখানি তফাৎ হয়ে গিয়েছি। আমাদের অনেক জিনিষের মাপ বদলে গেছে অর্থাৎ কমে গেছে। কল্পনায় আর অতিকায় দৈত্য-দানা আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে আসে না—মর্ত্ত্য-আঁখি মেঘের ওপারে মন্দাকিনীর সলিলসীকতায় যক্ষ-নারীর উষা-স্নান দেখে না—বাহুতে আর সে ধনুক নেই যার বলে ত্রিভুবন জয় করা যায়। অতিকায়-মানুষের যুগ চলে গেছে। আমরা আর এক নূতন মানুষের দল এসেছি—মনের গুহা থেকে। রক্তে আমাদের সেই গুহার অন্ধকার ভয়ের বীজাণু হয়ে মিশে আছে। আমরা মনোময় মানুষ—আমাদের দৈহিক কর্ম্মের পরিমাপ পরিমিত হয়ে এসেছে—চিন্তায় আমরা ভাষার ময়ূরপঙ্খীতে চড়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছি। আমাদের কল্পনায় যে দানব ঘুরে বেড়ায় তার নাম—নীট্‌শে।

* * *

কিন্তু আমাদের অতিকায় পৌরাণিক প্রপিতামহরা হয় ত আমাদের এখনও ভুলে যান নি। মাটীর মমতার টানে তাঁরা মাঝে মাঝে ছদ্মবেশে তাঁদের বিরাট বপুকে এই যুগের মত চালান-সই করে দেখা দেন—আমরা আমাদের চারিদিকে মাপের সঙ্গে তাকে খাপ খাইয়ে দেখতে যাই—ফিতেতে কুলোয় না। জগতের প্রচলিত জীবনধারার যে এক গতির ঐক্য আছে—তাতে এসে আঘাত লাগে। সে যেন প্রাচীন কোন্ লুপ্ত নগরীর রাজকোষের মুদ্রা—আজকালকার বাজারে মুদীর দোকানে তাকে ভাঙিয়ে খাওয়া চলে না—গুণী মহাজনের হাতে পড়লে হয় ত কাঁচের দেওয়ালের মধ্যে মিউসিয়ামে রাখা চলে—পৃথিবীর বিগত জীবনের কোনও এক অধ্যায়ের একজন জীবিত সাক্ষী হিসাবে। দ্য'আনুন্‌ৎসিয়োর জীবনও ঠিক তাই—সে যেন পৃথিবীর অতিকায় যুগের স্মৃতি। আজকালকার মাপ দিয়ে যখন তাকে মাপা গেল তখন ফরাসী ওজনদাররা বল্লেন—The greatest cad, ever born on earth. এত বড় নোংরা বদমাস আর পৃথিবীতে জন্মায় নি। এমন কি ফরাসী সাহিত্যিকরা প্রচার করলেন যে, দ্য'আনুন্‌ৎসিয়োকে যদি কোন দিন প্যারিসের বুলভারে পাওয়া যায় ত লাথি দিয়ে মেরে ফেলা হবে। তবে অনেক সম্ভ্রান্ত ফরাসী মহিলা জানেন যে, বুলভারে দ্য'আনুন্‌ৎসিয়োকে সে লাথি খেতে হয় নি।

* * *

দ্য'আনুন্‌ৎসিয়ো জীবনে যখন যে কাজ করেছেন বা করতে চেয়েছেন তার শেষ সীমায় উপনীত হয়ে তাকে পরিত্যাগ করে চলে এসেছেন। এই ভোগের বর্ব্বরতা-প্রবণ নিষ্ঠুরতা তাঁর সমস্ত যৌবনকে ছেয়ে আছে। এবং ইহা য়ুরোপের অন্যতমা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী এলেনোরা ডুসের জীবনে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এলেনোরা আপনার অসামান্য প্রতিভা, রূপ ও অর্থ দিয়ে একান্তভাবে চেয়েছিল ইতালীর অতীন্দ্রিয়-রূপমুগ্ধ এই কবির অন্তরকে বিকশিত করে তুলতে—হয়েছিলও তাই। দ্য'আনুন্‌ৎসিয়ো এবং এলেনোরার প্রেমের জীবনের মধ্যে দিয়ে বর্ত্তমান ইতালীর নাট্যমঞ্চ নূতন রূপে জেগে উঠে। দ্য'আনুন্‌ৎসিয়ো ডুসের জন্য অবিশ্রান্তভাবে অমর-নাট্য রচনা করে চল্লেন। কিন্তু একদিন এই মিলনের মধ্যে কোথায় পরিতৃপ্তির যতি পড়ে গেল—দ্য'আনুন্‌ৎসিয়ো ডুসের সম্মুখে অন্য নারীর সংস্রবে এত বড় প্রেমের বহু অবমাননা করেন। ডুসের জীবন-কাহিনীর সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন যে, এই অপমানের তীব্র-বেদনায় ডুসের অন্তিম জীবন ঘনিয়ে আসে।

* * *

দ্য'আনুন্‌ৎসিয়ো প্রথম জীবনের বহির্শক্তির কাছে নিতান্ত অসহায়। আপনাকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে, তলিয়ে দেওয়ার যে মধ্যে তৃপ্তি দ্য'আনুন্‌ৎসিয়ো প্রথম জীবন হ'তে তাই কামনা ক'রেছিলেন এবং পরবর্ত্তী জীবনে এই চিন্তাহীন অবসাদই তাঁর জীবনকে এক ঘটনা থেকে ঘটনান্তরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থান্তরকে তিনি কোনদিনই (অন্তত শেষ জীবন পর্য্যন্ত) প্রতিরোধ করেন নাই এবং এইখানেই তাঁর জীবনের সমস্ত মহিমা ও অক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে চিরদিনের জন্য

চিত্রিত হ'য়ে রয়েছে। ঘটনার হাতে, সামান্য প্রতিরোধের কল্পনা পর্য্যন্ত মনে না জাগিয়ে অক্ষম শিশুর মত তিনি জীবনের বিচিত্রতা সম্পাদন ক'রেছিলেন, জীবনকেই শ্রেষ্ঠ ক'রেছিলেন কিন্তু জীবনকে ভালবাসার রসে প্রাণময় ক'রে জীবনের চৈতন্য উপলব্ধি করতে পারেন নাই। এই অক্ষমতার বেদনা আজ যৌবনের সায়াহ্নে তাকে পীড়িত ক'রে তুলেছে। তাই দ্য'আনুন্‌সিয়ো "The Breaker of Ten Thousand Hearts," সহস্র সহস্র হৃদয়কে বাসনার আগুনে লুব্ধ ক'রে আজ নিজের হৃদয়ের তলদেশ পর্য্যন্ত অতৃপ্তির দুঃখে দাহন ক'রে শুদ্ধ ও অম্লান হবার ইচ্ছায় কৃচ্ছ্র ব্রত গ্রহণ ক'রেছেন। এবং তাঁর এই প্রত্যাবর্ত্তনকেই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ রোমান্স ব'লে প্রকাশ করেছেন। এলেনোরার প্রতি তাঁর দুর্দ্দম আসক্তি, ইদা রবিনষ্টাইনের সঙ্গে ইতিহাস-বিখ্যাত প্রেমলীলা প্রভৃতি তাঁর জীবনের প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলিকে অনায়াসে অস্বীকার ক'রে এই প্রত্যাবর্ত্তনকে তিনি তাঁর জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ব-গরিষ্ঠ অনুভূতি ব'লে মনে করেছেন এবং জগতের যৌবনের প্রতি তাঁর বাণী—"বাসনা-লুব্ধ ভালবাসা সার্থক নয়।"

—"I broadcast my story to the world so that the youth of genius will regard me as a figure symbolising the futility of profligate love-making....I heard the command: confess, and on confession, I believe, lies the greatest happiness of human soul."—

* * *

তাঁর এ পরিবর্ত্তন যেমন বিস্ময়কর তেমনি সুন্দর! অন্ধকারে তাঁর কাম্যবস্তুকে খোঁজার সমাপ্তি হয়েছে। শিশু তার আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। St. Francis of Assisi আজ তাঁর বিধাতা—দ্য'আনুন্‌ৎসিয়ো এসিসির ত্রাণকর্ত্তার ক্রীতদাস। তাঁর জীবনের এই অধ্যায়ই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও পরিপূর্ণ। দ্য'আনুন্‌ৎসিয়ো বিশ্ব-মানবের অসহায়, অক্ষম শিশু।

গার্দোনের ভিলা গ্যাব্রিয়েলের এই নব-লব্ধ পবিত্র চিন্তার গ্রহীতা। সেই জন্যই তিনি এই সর্ব্বাঙ্গশোভিত উদ্যানের নাম দিয়েছেন—'Cell of Pure Dreams.' বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী Guido Cadorin-এর হাতে-আঁকা—পৃথিবীতে যাঁরা ত্যাগের বার্ত্তা বহন ক'রে আনেন, ত্যাগের দানে যাঁরা ধরিত্রীর শোভা সম্পাদন করেন, সেই মাতা বেদনার চিত্রে অলঙ্কৃত গার্দোনের উদ্যান—পীড়িত, ব্যাধিগ্রস্ত, leper,—দ্য'আনুন্‌ৎসিয়োর শ্রেষ্ঠ-আকর্ষণের বস্তু।

ফ্রান্সিসের পদতলে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত দ্য'আনুন্‌ৎসিয়ো ক্ষমাভিক্ষার আবেদন ক'রেছেন, জগত প্রেমিক ফ্রান্সিসের বিগলিত হৃদয়ের ক্ষমার নির্ঝর তাঁকে আরও বেদনা দিচ্ছে, তাই তাঁর আলিঙ্গন হতে নিজেকে মুক্ত করবার দুঃখে দ্য'আনুন্‌ৎসিয়ো এক দৃষ্টিতে ক্ষমাপরায়ণা মাতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে আছেন—গার্দোনের উদ্যানে প্রবেশ করেই প্রথমে Cadrion-এর আঁকা এই ছবির প্রতি দৃষ্টি পড়ে! য়ুরোপের সর্ব্বত্র যাঁর বিলাস-ব্যসনের খ্যাতি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, যাঁর বস্ত্রাগার দ্রষ্টব্য জিনিষ হ'য়ে উঠেছিল, জীবনে ভোগ ও ব্যসনকে যিনি কোনো ছিদ্র দিয়ে অপূর্ণ রাখবার সুযোগ দেন নাই—দ্য'আনুন্‌ৎসিয়োর এই পরিবর্ত্তনের চেয়ে আধুনিক কালে বিস্ময়ের ঘটনা আর কি আছে?

দ্য'আনুন্‌ৎসিয়োর সাহিত্যিক প্রতিভার সমগ্র সমালোচনা এখানে সম্ভবপর নয়। তাঁর সাহিত্য তাঁর জীবন-শতদল হ'তে ক্রমশ উদ্ভূত হয়েছে, জীবনের বিকাশে সাহিত্য ক্রম-বিকশিত হ'য়েছে—সেই জন্য দ্য'আনুন্‌ৎসিয়োর সাহিত্য তাঁর জীবনের মতই অপ্রতিরোধ্য। তিনি তাঁর পাঠককে অভিভূত ক'রে দিতে চান, তাকে প্রেম-ভরা দৃষ্টিবাণে অবশ ক'রে দিতে চান—সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে। তাঁর ভালবাসার ইঙ্গিত যেমন কোনো নারীর পক্ষে প্রতিরোধ করা অসম্ভব হ'ত, সাহিত্যে সৃষ্ট তাঁর চরিত্রগুলিও নিজেদের জীবনের তেজস্বিতায় পাঠকের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে হরণ করে।

দ্য'আনুন্‌ৎসিয়োর জীবনের বিচিত্রতা যেমন ব্যাপক তেমনি গভীর। ব্যাভিচারের জন্য কারাগারে যাওয়া, ঋণদায়ে দেশ ছাড়া থেকে আরম্ভ করে সমগ্র দেশকে প্রবুদ্ধ করে তোলা এবং জাতির অন্তরের অধীশ্বর হয়ে থাকা পর্য্যন্ত সমস্ত অবস্থা তিনি সজাগ ভাবে কাটিয়ে এসেছেন। "ইতালীয়তার" (Italianity) তিনি জন্মদাতা। যে বাণীর উপর নির্ভর করে মুসোলিনী ফ্যাসিস্তিদল গড়ে তোলেন তার মূল হচ্ছে—দ্য'আনুন্‌ৎসিয়ো। প্রত্যেক ইতালীয়ের কাছে তিনি তরুণ-ইতালীর অন্তরের বাসনার প্রতীক। তাঁর জ্বালাময়ী বাণী প্রত্যেক ইতালীয় যুবককে আপনার দেশ সম্বন্ধে সজাগ করে তুলেছে। তাই এই আত্মময় কবি আপনারি বর্ণনা প্রসঙ্গে আপনি বলেছেন—I am the master of the fiery word—the column of never-consumed fire. একাধারে তিনি ইতালীর অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, নাট্যকার, সম্পাদক, যোদ্ধা, সেনাপতি, বিমান-অধ্যক্ষ ও বিলাসী।

* * *

আঠারো বছর বয়েসেই কবি-হিসাবে সমস্ত ইতালীর মধ্যে তাঁর যশ ছড়িয়ে পড়ে। তারপর কিছুকাল সেই তরুণ বয়সেই সম্পাদক হিসাবে এত সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন যে, তিনি দু'তিন বার নগরের প্রতিনিধি পদে নির্ব্বাচিত হন। যৌবনে তিনি সহস্র অপমান ও বিপদের মধ্যে দিয়ে "Hero of Thousand Beds' দুর্নাম অর্জ্জন করেন। তারপর যৌবনের শেষে ছাপ্পান্ন বছর বয়সে সহসা তিনি সমস্ত ইতালীকে আবার এক নূতন রূপে স্তম্ভিত করে দিলেন। সেনাপতি রূপে ফিউম প্রদেশ আক্রমণ করে ইতালীকে একেবারে য়ুয়োপের জাতি-মহলে টেনে তুললেন। তারপর ঋণদায়ে ইতালী থেকে পলায়ন এবং প্যারিসে গিয়ে সেখানকার লোকের অন্তরে একেবারে রাজপুত্র হয়ে অধিষ্ঠান করা। এই সময় ১৮৯৩ সালে পাঁচ মাসের জন্য তাঁকে ব্যাভিচারের দরুন কারাবাস করতে হয়। তারপর ফ্রান্সের নগরে নগরে তাঁকে দেখা যেত—আংটীতে বিষ-ভরা, যে-কোনও মুহূর্ত্তে জীবনকে শেষ করবার বাসনা চোখে মুখে সুস্পষ্ট।

* * *

ইতালীর বর্ত্তমান রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে দ্য'আন্নুন্‌ৎসিয়োর বিশেষ যোগ আছে; এমন কি এক কথায় বলা যায় যে, মুসোলিনী দ্য'আন্নুন্‌ৎসিয়োরই মানস-শিশু।—"Now and for ever, O Italy ; of thee alone, for thee alone, in thee alone"—দ্য'আন্নুন্‌ৎসিয়োর এই বাণীর মধ্যে ফ্যাসিস্ত দলের-যৌবন শক্তি লুকিয়ে আছে। মুসোলিনী যে ইতালীর যুবকদের নিয়ে আপনার দল পুষ্ট করেন—তারা সবাই ছিল দ্য'আন্নুন্‌ৎসিয়োর মন্ত্র-শিষ্য। এবং যে জাতীয়তার সহায়তা নিয়ে মুসোলিনী সমস্ত ইতালী জাতির ভাগ্যবিধাতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন সে জাতীয়তার বীজ অঙ্কুরিত করে তোলেন - দ্য'আন্নুন্‌ৎসিয়োর ফিউম অধিকার! ফিউমের সঙ্গে দ্য'আন্নুন্‌ৎসিয়োর জীবন বিচিত্র ভাবে জড়ান।

* * * *

আদ্রিয়াতিক সাগরের উত্তরে ফিউম প্রদেশ অধিষ্ঠিত। ১৮৭৬ সাল পর্য্যন্ত ফিউমের আভ্যন্তরিক শাসন-প্রণালীতে ইতালীয়দের বেশীর ভাগ অংশ ছিল। কিন্তু ক্রমশ ফিউম ইতালীয়দের দখল থেকে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর অধীনে গিয়ে পড়ে। হাঙ্গেরী তাদের বাণিজ্যের সুবিধার জন্য পুরা মাত্রায় ফিউমকে দখল করে বসে। ফিউমের যুবকরা ইতালীতে গিয়ে তার সৈন্যবিভাগ পুষ্ট করেছে—ফিউম আপনার বুকে ইতালিয়ান্ পলাতকদের লুকিয়ে রেখেছে—কিন্তু ১৯১৮ সালে ফিউমের যুবকদল যখন গোপনে বিদ্রোহের আয়োজন করে তখন নিটির গভর্ণমেণ্ট তাদের সহায়তা থেকে বিমুখ হন।

দ্য'আন্নুন্‌ৎসিয়ো জীবনে বড় হবার কোনও সুবিধা ছাড়েন নি। তিনি ফিউম-বিদ্রোহের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু এই সময় তাঁর অসুখ হ'য়ে পড়ে এবং সেপ্টেম্বর মাসের দশই তারিখ বলে' তিনি সে দিন আর রওনা হলেন না; কারণ প্রত্যেক মাসের দশই তারিখ দ্য'আন্নুন্‌ৎসিয়ো কিছু করেন না। পরের দিন দ্য'আন্নুন্‌ৎসিয়ো ফিউমে প্রবেশ করেন এবং ফিউম দখল করেন। এই সংবাদে সমস্ত ইতালীর মধ্যে একটা আনন্দের আন্দোলন পড়ে যায়। দ্য'আন্নুন্‌ৎসিয়ো ফিউমের অধীশ্বর হয়ে প্রচার করলেন—I go toward life.

ফিউমে দ্য'আন্নুন্‌ৎসিয়োর চারিদিকে ইতালীর বহু সম্মানিত ব্যক্তি ঘিরে বসল। ফিউম থেকে তিনি প্রচার করলেন—"The real Italy is in Fiume." এই প্রচার-উক্তিতে ইতালীয় গভর্ণমেণ্টের অধিনায়কগণ ক্ষুণ্ণ হলেন। এই সময় তাঁর কল্পনায় সিজারের রোমের স্বপ্ন জেগে উঠে। রোম হবে বৃহত্তর জগতের কেন্দ্র। এই কল্পনায় উদ্দৃপ্ত হয়ে তিনি আপনার সৈন্য বাহিনী নিয়ে রোম আক্রমণ করবার বিষয় চিন্তা করছিলেন। তিনি প্রচার করলেন যে, দু'বার রোম জয় করেছি—কথা দিয়ে, এবার রোম জয় করবো—তরবারি দিয়ে। যখন দ্য'আন্নুন্‌ৎসিয়ো রোমের সাম্রাজ্যবাদের কল্পনায় মত্ত তখন জেনেভার পথ ছেড়ে এক পাথর-ভাঙা কুলী যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে নূতন রোম গড়ে তোলবার জন্য গোপনে দল পাকাচ্ছিলেন। দ্য'আন্নুন্‌ৎসিয়োর কল্পনা তিনিই কার্য্যে পরিণত করবেন। দ্য'আন্নুন্‌ৎসিয়ো যা কল্পনা করে গেলেন, মুসোলিনী এসে তাকে রূপ দিলেন। বিজয়ী বীরের মত মুসোলিনী ফ্যাসিস্তিদল নিয়ে রোম দখল করলেন। এবং মুসোলিনীর রাজনীতি যাঁরা অনুসরণ করেন তাঁরাই জানেন যে, মুসোলিনীর রাজনীতির মূলে রয়েছে দ্য'আন্নুন্‌ৎসিয়োর সেই কথা—Now and forever, O Italy ; of thee alone, for thee alone, in thee alone. L'Illustration-এ একটি ফটো বেরোয়; মুসোলিনী ও দ্য'আন্নুন্‌ৎসিয়ো একসঙ্গে একখানা নৌকা (yacht) চালাচ্ছেন। সে নৌকাখানা বর্ত্তমান ইতালী।

———

Published by Sj. Dineshranjan Das from 10/2, Patuatola Lane and Printed by K. Lahiri, at the Britannia Printing Works, 1, Bibi Razia Lane, Calcutta.

এইচ্, জি, ওয়েল্‌স্

তারা প্রেস,

কল্লোল

ভাদ্র, ১৩৩৪

গজল

নজরুল ইসলাম

ভুখা আঁখি, কাজ কি ঢাকি' ওড়্না দিয়ে গুল্বদন।
পিয়েই না হয় নিলে ও-রূপ আঁখির ক্ষুধা আর্ত্ত মন ॥
"হারুত"সম সই হামেশা আশেক হওয়ার হয়রানী।
হায়, যদি না দেখ্ত কভু ও-রূপ আমার দুই নয়ন ॥
"হারুত" কি হায় বন্দী হ'ত চিবুক-টোলের রস্-কুঁয়ায়,
"মারুত" যদি না কইত গো সেই রূপসীর রূপ কেমন ॥
আমার মতন ও-রূপ দেখে ভুল বকে কি বুল্বুলি ?
তোমার মুখের খোশ্বু লেগে ফুলের বাসে মাত্ল বন ॥
তোমায় ভালবেসে সখি দুঃখ ব্যথার অন্ত নাই।
ঘোমটা খোলো, হাফিজ তোমার রূপ দেখে নিক্ মন্মোহন ॥

হারুত মারুত=দুইজন সেরা স্বর্গদূত। মানুষের প্রতি স্রষ্টার অতি-স্নেহ দেখে এদের হিংসা হয়। স্রষ্টা তাই এদেরে পৃথিবীর প্রলোভনের পরীক্ষাগারে পাঠান। এরা সুন্দর পৃথিবীতে এসে জোহরা নাম্নি এক সুন্দরীর রূপে মত্ত হয়ে তার স্বামীকে হত্যা করে। সেই অবধি এরা অভিশপ্ত হয়ে বাবিলনের কোন এক কূপে উর্দ্ধপদ হয়ে ঝুলছে এবং শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত ঝুলবে।

কলের নৌকা

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ

মা মারা গেল আগে, তারপর তার বাপ।

যাবার সময় রেখে গেল দু'শ টাকার দেনা আর তাই শোধ দেবার জন্য একখানা কুড়োল।

তাই সে তার বাপের মতই দিন-মজুর।...

সমস্ত দিনটা কারুর বাড়ীতে খেটে যখন সে বাড়ী ফিরত তখন আর পা দু'টো যেন দেহভার বইতে চাইত না। তবু ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর ঢুকতে হয়। মনে পড়ে তার ক্লান্ত হ'লে চ'ল্‌বে কেন? বহিনকে খাওয়াতে হবে, ঝড় বাতাসের আশ্রয় ঐ বুড়ো ঘরখানায়ও পোয়াল গুছি দিতে হবে, আর সব চাইতে বাপের আদরের গরুটাকেও দু'মুঠো ঘাস দেওয়া চাই। তারপর দেনার চিন্তা।...

সে-দিন বাড়ী ফিরতেই দুলালী বল্লে—এত খাটুনিতে তোর শরীর থাকবে না ভাই! না হয় কিছু কম পয়সা নিয়েই তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিস্।

রহিম ক্লান্তির ভাবটা লুকিয়ে ফেল্‌বার জন্যই রোদে-পোড়া তামাটে মাটির মত মুখখানায় একটু হাসি টেনে জবাব দিল—তোর যে ভারি দরদ্ দেখ্‌ছি দুলালী!—

তারপর একটুখানি থেমে বল্লে—দেনাটাও আর কয়েক মাসের মধ্যে শোধ করা চাই, না হ'লে যে বাড়ীঘর মায় গরুটি পর্য্যন্ত···

দুলালী সমস্তই বুঝল, তবু রাগ ক'রেই জবাব দিল—হ'ক্ বাড়ী ছাড়তে, ভাই-বহিনে গাছতলায় থাক্‌ব। সেখান থেকে আর কেউ তাড়িয়ে দিতে পারবে না। দাবীও নেই।

বোনের দিকে একবার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রহিম শুধু বল্লে—ক্ষেপী...

তারপর আরো দু'মাস কেটে গেল ফাল্গুন মাস। বসন্তের হাওয়ায় বনের বুকে ফুল ফোটে আর সেই হাওয়াতেই রহিমের ঘরের জীর্ণ খড়গুলি উড়ে যায়—যেন বুড়ো ময়নাটার ছেঁড়া পালক।

দুলালী দুপুর বেলা নাস্তা নিয়ে ভাইয়ের কাছে যাচ্ছিল। বড় বাগানের আড়ালের পথটায় ফিরোজার সঙ্গে দেখা। সে বল্লে—একটু দাঁড়া দুলালী, তোর সঙ্গে আমিও ঐ দিক পানে যাবো।

দু'জনে যেতে যেতে কথা হয়—

ফিরোজা বল্লে—তোকে অনেক দিন দেখি না, তুই যেন ঈদের চাঁদ হয়েছিস্।

—তুই বুঝি ফুলের মধু! তাই তোকেও সকলে দেখ্‌তে পায় না।

—দূর্ পোড়ার মুখী!

সইয়ের মুখের আদরের গাল! ও ফিরোজার দিকে হাসি মুখে চাইতেই ফিরোজাও হেসে ফেল্লে।

একটু পরে দুজন এসে একটা গাছের তলায় দাঁড়াল। রহিম রোদে দাঁড়িয়েই ঠক্ ঠক্ শব্দে হাতিয়ার চালাচ্ছিল। দেখ্‌তে পেয়ে বল্লে—একটু বোস্, আর দুটো চোপ...

রহিম কাছে আস্‌তেই আঁচলের খোটটা দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে দুলালী বল্লে—আমি একটু বাতাস করি, তুই বসে খানিকটা জিরিয়ে নে। এ-যে একেবারে কালী

হ'য়ে গেছিস।

একটু আগেই রহিম কি যেন একটা হাসির কথা ব'লতে যাচ্ছিল, বলা হ'লো না। বোনের সহানুভূতির সুরে মনে পড়ল দেনার কথা। দু'শ টাকার জন্যই ত রোদ বৃষ্টি অগ্রাহ্য ক'রে ওকে খাট্‌তে হ'চ্ছে; বহিনের মুখটিও ওর ভাবনাতেই শুকনো! চান ক'রবার সময় তার এক ফোঁটা তেল পর্য্যন্ত জোটে না, লম্বা লম্বা চুলগুলিতে জট বাঁধবার জোগাড় হ'য়েছে।

বোনের মুখের দিকে একটা উদাস দৃষ্টি হেনে দীর্ঘ নিঃশ্বাসটাকে ধীরে ধীরে চেপে বল্লে—দেখি কি এনেছিস্? —দে।

রহিমের কোন ভাবই দুলালীর চোখ এড়াল না। সে মুখখানাকে নিতান্ত মলিন ক'রে ভাতের থালাটা ভাইয়ের সাম্‌নে এগিয়ে দিল।

খাওয়া প্রায় শেষ হওয়ার মুখে দুলালী জিজ্ঞাসা ক'র্‌ল— আজো কি তোর দেরী হবে ভাই?

রহিম অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিল—না। ব'লতে পারি না।

ফিরোজা অনেকক্ষণ বাইরের লোকের মত দাঁড়িয়েছিল, এবার বল্লে—দুলালী, ঐ বাছুরটাকে নাড়িয়ে দিয়ে আসি তারপর দু'জনেই এক সাথে আজ ঘাটে যাবো।

গরুর খুঁটাটা আল্‌গাতে আল্‌গাতে ফিরোজা কেন জানি ভাবছিল—যদি দুলালীর মত ও রহিমকে ভাত বেড়ে দিতে পার্‌ত, আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিতে পারত... আহা এ রোদেও খাট্‌তে হ'চ্ছে...আরো অনেক কিছু।

ফিরোজার বাপ খাটে, মামারা খাটে, শুধু দুনিয়ায় রহিম একলাই খাটে না, তবু—ওরই জন্য—

সে-দিন সন্ধ্যার সময় যখন কাঁচা সোনার মত তরল আলো গাছের পাতায় কেঁপে বেড়াচ্ছিল তখন কুড়োলটাকে কাঁধে নিয়ে রহিম বাড়ী ফিরে আস্‌ছিল। পথের বাঁ-ধারে চোখ পড়তেই দেখে—ফিরোজা। সে নুয়ে গরুর দড়ি গুছিয়ে নিচ্ছিল,—বাতাসে পিঠের কাপড়টা অনেকখানি উড়িয়ে নিয়েছে, চুলগুলিও হাওয়ায় ভর ক'রে যেন নাচ্‌ছে—সে রহিমকে দেখ্‌তে পেয়ে তাড়াতাড়ি কাপড়টা দু'হাতে ধ'রে বুকের ও ঘাড়ের উপর দিয়ে শক্ত ক'রে টেনে কোমরে গুঁজে দিল। ফর্সা পিটখানিও ঢাকা বাকি রইল না।

অনেক দিন রহিম ওর চলা দেখেছে; হাসি দেখেছে, কিন্তু বয়সের সরম দেখ্‌ল এই প্রথম।

গভীর রাত। জেগে আছে রহিম আর তন্দ্রাতুর একটা প্রদীপ।

ভাব্‌ছিল—ফিরোজা হঠাৎ এত সুন্দর হ'লো কি ক'রে? অনেক দিন বাদে কাল্‌কে দেখেছে ব'লেই কি ওর সমস্ত রূপ—এতদিন যা রহিমের কাছে গোপন ছিল—হঠাৎ ধরা দিয়েছে! না, যে কটি মাস দেখা হয় নি সেই কটি মাস ও নিজেকে লুকিয়ে রেখে হঠাৎ মধুর ফাগুন সন্ধ্যায় তাকে চমকে দিল? ওর সঙ্গে কি সাদি হয় না?... এমন সময় সহসা ভাঙ্গা ঘরের খুঁটিগুলোর দিকে নজর পড়্‌তেই মনে হ'লো—না, হয় না! সে গরীব আর ফিরোজা মোড়লের মেয়ে। তার একখানা বই ঘর নাই, তাও আবার কখন একটু বাতাসে প'ড়ে যায়। সে নিজের ঘরখানাকে মেরামত ক'রতে পারে না, বহিনকে একখানি ভাল কাপড় পর্য্যন্ত দিতে পারে না, তার ফিরোজার মত মেয়ের চিন্তায় লাভ কি! চোখ নেই তবু দিনের আলো দেখার সখ! কিছুক্ষণ কি ভাবার পর সে আবার নিজের মনেই অধীর হ'য়ে ব'লে উঠ্‌ল—ফিরোজাকে পাওয়া চাই। গরীব? বড়লোক হ'তেই বা কয়দিন!—বড়লোক হবেই সে, তা আজ হ'ক্ আর কালই হ'ক্।

এমন সময় আবার রান্নাঘরখানা হাওয়ায় মচ্ মচ্ ক'রে উঠ্‌তেই রহিমের উৎসাহ ভেঙে গেল। সে চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পেল,—কুঁড়ে ঘরদুখানার ভাঙ্গা চালগুলি পর্য্যন্ত দেনার দায়ে নীলাম হ'য়ে যাচ্ছে। হাঁড়িপাতিল মায় ছোট্ট পানের বাসনটাও। গরুটি যেতে চাইছে না, দু'জন লোকে সেটাকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বহিন সুপারি গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছে আর ব'ল্‌ছে— গরুটাকে তোমরা ছেড়ে দিয়ে যাও। ও যে আমার হাতে ছাড়া কারুর হাতে খায় না। মরে যাবে গো না খেয়ে,

না খেয়ে মরে যাবে ;—তবু ওদের কঠিন প্রাণে দয়া হ'লো না দেখে বহিন ছুটে গিয়ে গরুর গলাটা জড়িয়ে ধ'রে ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়্‌ল। ওরা একটা ধাক্কা মেরে বহিনকে ফেলে দিয়ে বল্লে—টাকা দিতে পারে না আবার কান্না !...

—কি, বহিনকে অপমান—ব'লে রহিম কুড়োলটা তুলে প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছিল, ঘরের আড়ায় হঠাৎ হাতিয়ারটা ঠেকে গিয়ে সমস্ত স্বপ্ন এক নিমেষে ভেঙে গেল। ও স্তব্ধ হ'য়ে ছেঁড়া মাদুরটার উপর ব'সে পড়্‌ল যেন আকাশটা ঠক্ ক'রে মাথায় ঠেকেছে।

অনেকক্ষণ শূন্য মনে প্রদীপটার দিকে চেয়ে থাকার পরে রহিমের ছোট বেলার বইয়ের কথা মনে এলো। কে যেন গরম বাষ্পে, ভাতের হাঁড়ির, না চায়ের কেট্‌লির ঢাকনিটা নড়্‌তে দেখে একটা রেলের ইঞ্জিন তৈয়ের ক'রেছিল। সে কি ও রকম কিছু ক'র্‌তে পারে না? সেও ত' মানুষ। অনেক সময় ধ'রে ভাব্‌ল, তবু কিছুই ত' মনে পড়ে না। রহিম চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে হাতের কাছের একটা থালা টেনে নিয়ে একবার সাম্‌নে একবারে পিছনে ক'র্‌তে লাগ্‌ল। কিছুক্ষণ ঐ ভাবে কাটার পর ওর মনে পড়্‌ল যে, একজিবিসনে একটা কলের নৌকা ত' ঠিক তার হাতের থালাটার মতই জলের ভিতর এধার ওধার ক'রে বেড়াচ্ছিল, ও স্বচক্ষেই ত' দেখে এসেছে। ঠিক এমনি একটা নৌকা তৈয়ের করা চাই-ই। তা হ'লে এক দিনেই বড়লোক, আর ফিরোজা ত' হাতের মুঠোয়। রহিম আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে অর্থহীন একটা শব্দ ক'রে সেই গভীর রাত্রেই কুড়োলটা হাতে নিয়ে বাগানের মধ্যে ছুটে গেল। প্রকাণ্ড একটা গাছ কেটে তার ভিতরটা খুঁড়ে একটা নৌকা তৈয়ার ক'র্‌বে। তারপর তাতে হাতে ঘুরান একটি কল বসাবে। চমৎকার নূতন জিনিষ!

পায়ে হয় ত কাঁটা বিঁধতে লাগ্‌ল, কিন্তু তার দিকে মোটে নজর নাই। পাগলের মত ছুটে চলেছে। শিশির ভিজা পাতার স্পর্শে হয় ত' রহিমের মনে হচ্ছিল যে, পিছন থেকে ফিরোজার চুলের গোছা ওর সমস্ত দেহের উপর লুটিয়ে পড়েছে। সে যেন উৎসাহ দিচ্ছিল—এম্‌নি ক'রে কাজের মধ্যে দিয়েই আমাকে পেতে হয়।—ছোট্ট ফুলগুলি দূরে হাস্‌ছিল—যেন বহিনের খুশীর হাসি। দুই সইয়ে দুই রূপে তার কাছে আজ এসেছে যেন।—একজন স্নিগ্ধ কল্যাণময়ী বধূ—আর একজন কোমল হৃদয়া বন্ধু!

ফাল্গুন ফুরিয়েছে। চৈত্রের শেষ! রাখাল বালক দূর মাঠে অজানা আনন্দে গান গায়, গাঁয়ের বৌ-রা ঘাটে কলসী রেখে কথা কয়, ঠাট্টা তামাসা করে, কিন্তু এম্‌নি তর মধুমাসেও রহিমের ছুটি নাই। সে দিনরাত সুপারি গাছটার তলায় ব'সে ঠুক্‌ঠুক্ ক'রে কাজ ক'র্‌ছে। কোন দিকে লক্ষ্য নাই। কাজের আনন্দে সমস্তই ভুলে গেছে।

সে-দিন সন্ধ্যার সময় দুলালী এসে বল্লে—চল্ ভাই, খেয়ে আসবি। সারাদিনটা কেটে গেল তবু ত কিছুই খাস্‌নি। এম্‌নি ক'রে থাক্‌লে কয়দিন আর বাঁচ্‌বি?

রহিম মুখ না তুলেই জবাব দিল—এখন না, আরো কাজ বাকি আছে।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে দুলালী ফিরে এসে বল্লে—এই বার চল্।

রহিম উত্তর দিল না, কি যেন একমনে চিন্তা কর্‌ছিল।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দুলালী অন্য কোন উপায় না দেখে বল্লে—এখন পর্য্যন্ত তোর জন্য আমারও খাওয়া হয় নি। তোর খাওয়া না হ'লে আমিও খাব না।

রহিম এবার একটা অপ্রত্যাশিত ভাবে তাড়া দিয়ে বল্লে—না খেলি, না খেলি, আমার তাতে কি?

উত্তর শুনে দুলালী এক মুহূর্ত্তও না দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে বাড়ীর দিকে ফিরে এলো—ভাব্‌লো —সত্যি কি ও নিজের জন্যই ব্যস্ত, না, রহিমের জন্য? প্রাণের সরল কথা ভাই বোঝে না কেন? আগে ত' এমন ব্যবহার সে কোন দিন ভুলেও পায় নি বা ভাব্‌তে পর্য্যন্ত পারে নি।...

বাড়ীর ভিতর ঢুক্‌তেই দেখে—ফিরোজা দাঁড়িয়ে।

ফিরোজা জিজ্ঞাসা কর্‌ল—তুই কাঁদছিস্ কেন রে?

আজকাল রোজই ফিরোজা দুবার না হ'ক একবার এসে সই এবং তার ভাইয়ের খোঁজ নিয়ে যেতো।

দুলালী এক একটি করে সমস্ত কথাই খুলে বল্লে। সব শুনে ফিরোজার চোখেও জল এলো।

চোখের জল গোপন করবার জন্য সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ বুজল। তার মনে হ'লো যে, না খেয়ে খেয়ে নিজের শরীর শুকিয়ে ফেল্‌বার তার কি অধিকার আছে, একবার সে তাকে জিজ্ঞাসা করে আর বহিনের মনে কষ্ট দেবার জন্য ভাল ক'রে একবারটি শাসিয়ে দেয়।

দুলালী ডাক্‌ল—সই!

হাতের পিঠে চোখ মুছে ফিরোজা জবাব দিল—কি?

দুলালী ব্যগ্রভাবে ফিরোজার হাতখানা ধ'রে বল্লে—কোন্ রাত্তিরে ভাই আসে ঠিক নাই। একলা থাকি, বড় ভয় করে কিন্তু সাহস ক'রে ওকে কিছু ব'ল্‌তেও পারি না, শুধু বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদি। মাও নাই যে তার সঙ্গে দুটো কথা কইব।—অভিমানিনীর চোখের জলে ফিরোজার হাত ভিজে যেতে লাগ্‌ল। একটু চুপ করে থেকে বল্লে—তুই আজ রাত্রে আসিস্ সই।

ফিরোজাও অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে বল্লে—ছিঃ, কাঁদিস না। আমি আসব 'খন। এখন বাড়ী যাই।

ফিরোজা চ'লে গেলে দুলালী অস্ফুটস্বরে মাকে ডাকতে ডাকতে জীর্ণ কাঁথাটার মধ্যে মুখ গুঁজল। তবুওময়ী মা তাকে একটুখানি সান্ত্বনা দিল না, যেন হিমেল হাওয়ায় কান দুটো তার বধির হ'য়ে গেছে, মেয়ের আর্তনাদ পর্য্যন্ত তার কাছে পৌছয় না।

রহিম তাড়াতাড়ি হাতিয়ার বাটাল গুছিয়ে রেখে বাড়ীর ভিতর এলো। ঘরের এক কোণে প্রদীপটা কার যেন প্রতিক্ষা ক'রে তখনও জলছিল। রহিম বিস্মিত হ'য়ে চেয়ে দেখে ফিরোজা আর দুলালী শুয়ে। দুলালীর চোখের জলের দাগ তখন পর্য্যন্ত শুকোয় নাই। রহিম অপ-রাধীর মত দুলালীর পাশে এসে করুণ কণ্ঠে ডাক্‌ল—বহিন্!

দুলালী তাড়াতাড়ি ধড়্ মড়্ করে চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে বল্লে—কি? এসেছিস্?

রহিম আর কিছু ব'লতে পার্‌ল না। শুধু চুপ করে বসে রইল।

ফিরোজাও দুলালীর সাথে সাথে প্রায় উঠেছিল, সে বল্লে—কি রকম মানুষ তুমি, বহিনকে পর্য্যন্ত আগ্‌লা'তে পারো না, অপরের আস্‌তে হয়?

রহিম সরল ভাবে উত্তর দিল—তুমি অপর নাকি?

এমন সহজ এবং সোজা জবাবের উত্তরে কোনও নতুন কঠিন কথা আর ফিরোজার মনে এলো না। পথে আস্‌তে আস্‌তে যত কিছু ভেবেছিল সব গুলিয়ে গেল।

রহিমের খাওয়া শেষ হ'লে দুলালী ফিরোজাকে একটা পান সেজে দিতে ব'লে নিজে খেতে গেল।

পান সাজাত ফিরোজার নতুন নয়। তবে আজ কেন মিছা মিছি একলা ঘরে অনেক দিনের চেনা রহিমকে ওর পান সেজে দিতে হাত কেঁপে উঠ্‌ল। যেন কত দিন এ কাজে হাত দেয় নি। দুর্ছাই সুপারিগুলোও বড় বড় কাটা হ'লো। অনেকক্ষণ বাদে পানটা রহিমের হাতে দিতে গিয়ে হাতটার পোড়া আঙুলগুলো অবাধ্য হ'য়ে এ যাঃ, কি ক'রে ব'স্‌ল! ছুঁয়েছে। রহিম কিছু ভাব্‌ল নাকি? না কিছুই ভাবে নি। চ'লে গেছে। যাক্!

রহিম যতক্ষণ পর্য্যন্ত চোখের আড়াল না হ'লো ততক্ষণ পর্য্যন্ত ফিরোজা অজানা লজ্জায় মুখ তুলতে পার্‌ল না, লজ্জার আনন্দেই হয় ত।

আঁধিয়ার ঘনিয়ে এসেছিল। ঘাটের পথে কেউ চলে না। ফিরোজা শুধু একা। সে তাড়াতাড়ি কলসিটিকে নিয়ে দুলালীদের বাড়ী এসে ঢুক্‌ল। বল্লে—রহিম কোথায় গেছে রে? সে ত' কোন দিন ঐ সুপারি গাছগুলোর তলা ছেড়ে এক পাও নড়ে না।

দুলালী জবাব দেবার আগেই রহিম একহাঁটু ধুলো নিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুক্‌লো।

ফিরোজা বল্লে—কোথায় গিয়েছিলে, চেহারা অমন ঝামার মত হ'লো কি করে!

রহিম অত্যন্ত শ্রান্তিবশত দাওয়ার উপর একটা

খুঁটি ধ'রে ব'সে পড়ে বল্লে—সমস্ত দিনটা না খেয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরলাম তবু কেউ পঁচিশটা টাকা দিল না।—একটু থেমে জিরিয়ে নিয়ে আবার বল্লে—নৌকাটা একরকম ঠিক হ'য়ে গেছে, এখন কেবল একটা লোহার পাত চাই আর গোটা দুই লোহার কাঁচি।

ফিরোজা কলসীটা কাঁখে নিয়েই নিস্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। দুলালী কুড়োন কাঠগুলোকে একপাশে ফেলে রেখে ভাইয়ের কাছে এসে দাঁড়াল। সেও নির্ব্বাক।

ফিরোজা সুপারী গাছের তলা দিয়ে বাড়ী ফিরে যাবার সময় ভাব্‌ল নৌকাটা একলা যেন একটা বিরাট সর্ব্বনাশের মতই পড়ে আছে। মায়া নাই। রহিমকে যেন গিলে খেতেই ও চায়।

ঘরে চাল ছিল না। অস্বাভাবিক কিছুই নয়।

দুলালী শ্রান্ত উপবাসী ভাইকে ভাতের বদলে মুড়ি খেতে দিয়ে ভাব্‌ল যে, ও নিজেই বুঝি দোষী। কিন্তু ভাই বিনা আপত্তিতে অন্যমনস্কভাবে মুড়ি খেয়েই উঠে গেল। তার মুখের দিকে চাইলেই মনে হয় যে, কিছু না খেতে পেলেও যেন ওর কিছু বল্‌বার নেই।

যে একটা মাস গরুটার একটু খোঁজও নেয় নি, সে হঠাৎ সকালবেলা উঠে গরুটাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে? দুলালীর সন্দেহ হল, জিজ্ঞাসা কর্‌ল—কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ওটাকে?

রহিম ভগ্নকণ্ঠে বল্লে—বিক্রী কর্‌তে।

দুলালী কথা শুনে একেবারে ছুটে এসে ভাইয়ের হাতটা চেপে ধর্‌ল, বল্লে—তুই কি পাগল হয়েছিস্ নাকি?...না, আমি কিছুতে এটি বিক্রী ক'র্‌তে দেব না।—তারপর ভাইয়ের দিকে চাইতেই দেখে যে ভাইয়ের চোখ দিয়ে টস্‌টস্ ক'রে জল গড়িয়ে গরুটার পিঠে প'ড়্‌ছে। দুলালী রহিমের হাত ছেড়ে দিলে! রহিম একটি নিঃশ্বাস ফেলে গরুটাকে নিয়ে বাড়ীর বাইরে চলে গেল।

দুলালী চোখ মুছতে মুছতে বল্লে—হে খোদা, গরুটা গেছে গেছে, ভাই যেন না যায়, সে যেন পাগল না হয়।—তারপর গোয়ালের দিকে নজর পড়্‌তেই সে দেখে যে গোয়ালটা হা-হা ক'র্‌ছে, খুঁটিগুলো পর্য্যন্ত আর্ত্তনাদ ক'রে বল্‌ছে—গরুটা কই অভাগী?—যেন তাদের আজকে চিরদিনের মত কাঙাল ক'রে গেছে!...

তারপর দুটো দিন কেটে গেল।

ফিরোজা সন্ধ্যার সময় এসে বল্লে—সই লো, আজও শুতে আস্‌তে হ'বে নাকি?

দুলালী ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে উত্তর দিল—হ্যাঁ, আস্‌তে হবে বই কি।—তারপর বল্লে—একটা কাজ কর্‌তে পার্‌বি?

—কি?

—ভাই আজও সমস্ত দিন কিছু খায় নি। লোহা লক্কর কিনে এনে কি যে কর্‌ছে কিছুই বুঝি না। ডাকতে গেলাম, ঝাঁজিয়ে উঠ্‌ল। মনে মনে ভাব্‌লাম যে, ওটা আমার পাওনা জিনিষ—খানিকক্ষণ থেমে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্লে—তুই একবার গিয়ে একটু ডেকে নিয়ে আয়। তোর কথা শুন্‌লেও শুন্‌তে পারে।

ফিরোজা একটু ইতস্তত ক'রে প্রদীপটা নিয়ে রহিমকে ডাক্‌তে গেল।

রহিম তখন একটি কাঠ চেঁছে সরু ক'র্‌ছিল। মাথার সামনে একটা ল্যাম্প। ফিরোজা আজ প্রথম হঠাৎ গিয়ে রহিমের হাতটা ধ'রে বল্লে—খাবে এসো।—গলার আওয়াজ ঈষৎ কেঁপে উঠ্‌ল।

রহিম হঠাৎ কাজে বাধা পেয়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে জবাব দেবার জন্য মুখ তুল্‌ল। বহিন ছাড়া যে অপর কেউ এমন ক'রে হাত ধ'র্‌তে পারে তা রহিম স্বপ্নেও ভাবে নি।

স্নেহভরা কণ্ঠে ফিরোজা আবার বল্লে—উঠে এসো!

রহিম আপত্তি ক'র্‌তে পারল না। কলের পুতুলের মত হাতুড়ি বাটালি গুছিয়ে রেখে উঠে প'ড়্‌ল।

ল্যাম্পটার অস্পষ্ট আলোকে ফিরোজা দেখ্‌ল যেন রহিম অর্দ্ধেক হ'য়ে গেছে। চেনবার জো নাই। রাত জেগে জেগে চোখের কোণে কালির দাগ প'ড়েছে। চুলগুলি যেন ঘরের ছণের মত লাল। ফিরোজা হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে নিল।

রহিম বল্লে—ও কি ফিয়োজা! কাঁদ্‌চো?

—তুমি কি মানুষ যে তোমার জন্য কাঁদ্‌ব?

অন্ধকার চারিদিকে ঘনিয়ে এসেছিল কেউ কোথাও নাই, তাই বুঝি হঠাৎ দুজনার মাঝখানের ভঙ্গুর লজ্জার পাচিলটা খ'সে পড়েছিল। রহিম অধীর হ'য়ে বল্লে—ফিরোজা, আর কটা দিন পরেই দেখ্‌বে যে আমি ঠিক আগের মতই আছি, একটুও বদ্‌লাই নি।

দূরে দুলালীকে দরজার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে দুজনেই কথা বন্ধ ক'র্‌ল। কে কি ব'লেছে কিম্বা ব'ল্‌বে তা যেন তাদের আর দুজনার মনে নাই। ভুলে গেছে সব।

রহিমকে কাজ ছেড়ে উঠে আস্‌তে দেখে দুলালীর প্রাণে এমন আনন্দ হ'ল যে, সে একটা মস্ত বড় ঠাট্টার কথা ভাইকে ব'লে ফেল্‌ল—আমার থেকে ফিরোজা বুঝি বেশী কেউ, তাই তার কথায় তোমার নেশা ছুটল, না ভাই!

রহিম একটু হাস্‌ল। দুমাস বাদে এই তার প্রথম হাসি।

একে একে পাঁচটা দিন কাটল তারপর।

নৌকাটার তলিতে লোহার পাত বসিয়েছে। দুটো ষ্টীমারের চাকার মত দাঁড়ও তৈয়ের ক'রেছে, শুধু সেইগুলোকে জুত্‌সই ক'রে বসান বাকি। রহিমের প্রাণে আনন্দ ধরে না। সে অগাধ ফুর্ত্তিতে আত্মহারা হ'য়ে বোধহয় বর্ত্তমানের অনেক কিছুই ভুলে গেছে। মনে আছে শুধু ভবিষ্যৎ। একটা নূতন কোন জিনিষ সে নিজেই খাড়া ক'রে তুলবে। কেউ তার ভাগীদার নাই' কেবল সে একাই।

দু'তিন বার চেষ্টা ক'রেও লোহার রড্‌টা ঠিক বসাতে পার্‌ল না দেখে সে নিজেই একটু বিরক্ত হ'য়ে কি যেন ভাব্‌ছিল। হঠাৎ তার মনে হ'লো, দুপাশে দুটো বড় ছিদ্র ক'রে লোহার রড্‌টা গাড়ীর ধুরার মত বসাবে! তারপর তাতে দুখানা বড় দাঁড় জুড়ে দেবে, তা'হ'লেই ব্যস্‌, শেষ! প্রাণের আনন্দে সে তুর্পিন্‌টা নিয়ে একটা ছেঁদা ক'র্‌তে লাগ্‌ল। গর্ত্তটা তখনও শেষ হয় নি, এমন সময় পাগলের মত দুলালী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ছুটে এসে রহিমকে একটা ধাকা দিয়ে বল্‌লে—ভাই! শিগ্‌গীর্‌ চল্‌, কারা যেন লাঠি সোঁটা নিয়ে বাড়ীর ভিতর এসে ঢুক্‌ছে!

রহিম মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখ্‌ল—কাচারীর পেয়াদা, নিলামের পরওয়ানা নিয়েই বুঝি বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে।

রহিমের হাত থেকে বাটালিটা খ'সে পড়্‌ল, যেন ওর সমস্ত শক্তিই কে চুরি ক'রে নিয়েছে। ও শুধু বহিনকেই ব'ল্‌তে পার্‌ল—যা চেয়েছিলি হ'লো ত' তাই, এখন গাছতলায়ই থাক্‌বি।

দুলালীর মনের কথা খোদা শোনেন্‌ নি নিশ্চয়ই।

তারপর ঘর থালা বাসন গরীবের যা ছিল সবই একে একে পরের হাতে চ'লে গেল। তারা চ'লে যাওয়ার পর রইল শুধু শ্মশানের মত শ্রীহীন পৈত্রিক ভিটাটা আর নেড়া আমগাছটা।

দুলালী আর রহিম হাত ধরাধরি ক'রে একদৃষ্টে সবই দেখ্‌ল। কথাটি পর্য্যন্ত কইল না। গরীবের কী বা কইবার আছে?

বিকেল বেলা। ফিরোজা আর দুলালী ঘাটে দাঁড়িয়ে। দুলালী আজ মামাবাড়ী চ'ল্‌ল, কতদিনের জন্য তা কে জানে?

ফিরোজা বল্লে—সই, ভুলিস্‌ না।

দুলালী সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে সইকে দু হাতে বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে বল্লে—না, আমি কিছুতেই মামার বাড়ী যাবো না, সেখানে গেলে হয় ত তোদের না দেখ্‌তে পেয়ে মরে যাবো।

ফিরোজার মনে পড়্‌ল ছোট বেলার কথা। একসা'

খেলেছে, এক সাথে হেসেছে, কথা ক'য়েছে এক সাথে। আজ চিরদিনের সেই সাথী তাকে ছেড়ে চল্‌ল। যেন একটা নদীর জলের স্রোত আজ মস্ত বড় ধাক্কায় পৃথক হ'তে চ'লেছে।

রহিম নৌকার উপর ব'সেছিল, বল্লে—আর দেরী ক'রে লাভ নাই দুলালী, বেলা যায়। সুদূর পশ্চিমে সত্যি সত্যিই বেলা ডুবে গেল, সঙ্গে সঙ্গে দুলালীও গেল, রইল শুধু ফিরোজা আর বিষাদিতা মূক প্রকৃতি।

যে কান্নাটুকু ফিরোজা দুলালীর সম্মুখে ব'সে কাঁদে নাই, তার দুনো কাঁদ্‌ল বাড়ীতে এসে আর নিরাত্মীয় নির্জ্জন রহিমের ঘরগুলোর দিকে চেয়ে। . . .

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে সে চিরদিনের মতই দুলালীদের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়ে ডাক্‌ল—সই?—কেউ সাড়া দিল না আজ। কেউ হাত ধ'রে বাড়ীর মধ্যেও টেনে নিয়ে গেল না।

রহিম ঘুরে এসেছে। দুলালীকে দূরদেশে রেখে এসে প্রাণে যেটুকু ব্যথা লেগেছিল তা নৌকাটার দিকে চেয়ে সমস্তই দূর হ'য়ে গেছে। নৌকাটা যেন রহিমের প্রিয়া।

একদিন ফিরোজার ছোট্ট ভাইটা এসে বল্লে—বুবুর অসুখ ক'রেছে, তোকে একবার দুলালীর কথা জিজ্ঞাসা করবে ব'লে ডেকেছে।—

রহিম ভাব্‌ল যার আশায় সে ঘর গরু জীবন পর্য্যন্ত শেষ ক'রে দিতে ব'সেছে তার সাথে সে ফিরে এসে একবারও দেখা করার একটু অবসর পায় নি, কি বেইমান সে।

তারপর সে উঠে তাড়াতাড়ি ফিরোজাদের বাড়ী গেল। দেখ্‌ল ফিরোজা বিছানায় শুয়ে, তার কাঁচা হলুদের মত রং যেন কালি হ'য়ে গেছে।

রহিম জিজ্ঞাসা ক'র্‌ল—ফিরোজা তোমার কি হ'য়েছে?

সে কোন কথাই কইল না, শুধু দু'ফোঁটা জল তার চোখের কোণ বেয়ে গালে গড়িয়ে পড়্‌ল। মুখখানি অভিমানে পাণ্ডুর।

রহিম আবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌ল—কি হ'য়েছে তোমার?

এবার তার ঠোঁট দুখানি কেঁপে উঠ্‌ল; কি যেন ব'ল্‌তে যাচ্ছিল কিন্তু রুদ্ধ আবেগে বলা হ'লো না। একটু বাদে বুকে পিঠে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বল্লে—বড্ড ব্যথা! তারপর চোখ মুছে দুলালীর কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ল।

রহিম বল্লে—সে আসবার সময় কেবল বলছিল যে, তোমার খবর কাউকে দিয়ে যেন পাঠিয়ে দি।

রহিমের কথা শুনে ফিরোজা আবার মুখ ফিরিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল।

চার পাঁচ দিনের মধ্যেই নৌকা তৈ'য়ের শেষ হ'লো।

রহিমের প্রাণে আর আনন্দ ধরে না। বোধ হয় খোদা এই দুনিয়াটাকে সৃষ্টি করে যতখানি আনন্দ না পেয়েছিল, তার চাইতে বেশী পেল রহিম।

ভাঙ্গার আনন্দ নয়, গড়ার আনন্দ; তাই এত অসীম তৃপ্তি তার মনে।

সে স্বপ্ন দেখ্‌তে লাগ্‌ল যে, শহরের যত বড়লোক সকলে যেন টাকার থ'লে নিয়ে তার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। তার যেতেই যা দেরী, একবার পৌছলে এক, দুই ক'রে হয় ত' কেউ চারশ' টাকাই তার কাজের পুরস্কার দিয়ে দেবে। বিশ্বস্রষ্টাও রহিমের মত একদিন এম্‌নি স্বপ্ন দেখেছিল কি?

সেদিন রহিম সন্ধ্যার সময় ফিরোজাদের বাড়ী গিয়ে ফিরোজাকে বল্লে—নৌকা শেষ হ'য়েছে; শহরে বিক্রী ক'রতে যাবো।...বহিনকে নিয়েই ফিরে আসার ইচ্ছা আছে।

ফিরোজার রোগা বিবর্ণ মুখ আনন্দে একবার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। ধীরে বল্লে—বেশ।

কিন্তু যখন রহিম তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল তখন সে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। ইচ্ছা হ'চ্ছিল যে, রহিমের হাতটা ধ'রে পাশে বসিয়ে বলে—দুদিন পরেই যেয়ো, আর একটু থাক, একটুখানি—

দু'দিন বাদে রহিম শহর থেকে তার নৌকাটা নিয়ে

নিজের গ্রামে ফিরে এসে ঠিক জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের মত কম্পিত হস্তে নোঙর ফেল্‌ল। নৌকাটা কেউ নিল না। রহিমের প্রাণের গভীরতম ব্যথা কেউ একবার টেরও পেল না। বেশী চাল ধরে না, তিন জনার বেশী মানুষ ধরে না, তাই বোধ হয় কারুর পছন্দ হলো না, সবাই ঘৃণার চক্ষে চেয়ে তার নবীন উদ্যম ব্যর্থ করে দিল। সে কঙ্কালের মত গাঁয়ের পথে উঠে চেয়ে দেখে যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে আর নিকটের ডালিম গাছটার তলায় কে যেন চুপ ক'রে বসে আছে। রহিমের প্রাণ হঠাৎ ছ্যাক্ ক'রে উঠ্‌ল।

ঠিক পেছনে এসে জিজ্ঞাসা করল—কেগো, ভর সন্ধ্যায় একলা ব'সে কাঁদ্‌চ?

যে কাঁদ্‌ছিল সে মোটেই রহিমের কথা শুনতে পেল না, কারণ সে বড় অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করেছিল।

রহিম আবার কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—কে গো?

যে কাঁদ্‌ছিল সে এবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই চিন্‌তে পারল যে রহিম পিছনে দাঁড়িয়ে। রহিম প্রশ্ন করল—তুই এখানে কেমন ক'রে এলি রে? কি হয়েছে?

ক্ষণকালের জন্য কান্না থামিয়ে আঙুল দিয়ে সদ্য তাজা একটা কবর দেখিয়ে দিয়ে আবার করুণ কণ্ঠে কেঁদে উঠ্‌ল।

রহিম তার হাত ধ'রে একটা ঝাঁকি দিয়ে বল্লে—কী!... কার কবর?

এবার দুলালী বল্লে—ফিরোজার।...নাও পাঠিয়েছিল, কিন্তু আমার সাথে দেখা হলো না।

সমস্ত শুনে রহিম চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, যেন সে একটা প্রাণহীন বরফের পাহাড়ে পরিণত হয়েছে।

কিছুক্ষণ ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর রহিম একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ডালিম গাছটা থেকে কয়েকটা ফুল পেড়ে দুলালীর হাতে দিল। তারপরে নিজেও কতগুলি ফুল হাতে নিয়ে বল্লে—বহিন! আয় আমরা কবরটাকে সাজাই।—

কবরটা সাজান শেষ হ'লে রহিম ও দুলালী এক সাথেই সন্ধ্যা-লগ্নে মৃতার উদ্দেশে মাথা নোয়াল। কেউ কিছু মুখে বল্লে না।

অবশেষে রহিম দুলালীর হাত ধ'রে নদীর পাড়ে এসে নৌকার নোঙরটা তুলে গলইর ওপর রাখ্‌ল; নৌকাটা ঠেলে দিয়ে ধীরে ধীরে বল্লে—আমি এসেছি, তুমি ফিরে এসো, নাও পাঠালাম।

অন্ধের দৃষ্টি

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

নয় চকিতা-চঞ্চলা, নয় কৌতুকিনী হায় সে,—
খেলায় নাকো লুকোচুরি চোখের জানালায় সে।
দুয়ার-দেওয়া দেউলটিতে—
ধ্যান্-ধূপ-ছায়, মন্-নিভৃতে,
পূজারিণী পূজে যে তার প্রাণের দেবতায় সে!

নয় চকিতা-চঞ্চলা, নয় কৌতুকিনী হায় সে,—
দিনের আলো দুয়ার থেকে বৃথাই কেঁদে যায় যে।
নিশীথ-নিশায় তিমির মগন
নিখিল পৃথী নিথর যখন,
অনুভূতির আনন্দে—ঐ তারায় তারায় ভায় সে!

আকাশ পাতাল

শ্রীপরিমল গোস্বামী

পুরাতন লণ্ঠন, ভাঙ্গা চিমনি, ছেঁড়া জুতা, আরশুলা, উই, ইঁদুর, ফড়িং ইত্যাদি কতকগুলি অদ্ভুত খাপছাড়া বস্তু ও প্রাণী লইয়া ভৈরববাবু বসিয়া আছেন। তাঁহার হাতে কলম, সামনে প্রকাণ্ড একখানা খাতা। ইনি বর্ত্তমান যুগের গণতান্ত্রিক লেখক। যে কোন মাসিক পত্র খুলিলেই দেখা যায়, ভৈরববাবুর লেখা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহার লেখায় রাজা মহারাজার নাম গন্ধ নাই। চোর জুয়াচোর পকেট-কাটা ইঁদুর বিড়াল পোকা মাকড় মশা মাছি মাটি ঘাস বন জঙ্গল ইহারাই ইহার সাহিত্য প্রেরণা জোগাইয়া থাকে। ইনি কখনও গদ্যে লেখেন, কখনও পদ্যে লিখিয়া থাকেন। আজ সকালে উঠিয়াই স্ত্রীর সঙ্গে খুব এক চোট ঝগড়া হইয়া যাওয়াতে ভৈরববাবু মনে করিলেন হৃদয়ে আবেগ আসিয়াছে। কিন্তু কালি কলমে তাহা প্রকাশ না হইয়া সবেগে স্ত্রীর উপর দিয়া প্রকাশ হইয়া যাওয়ায় তাঁহার মনটা একটু বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। একখানা খাতা থাকিলে তাহাতে শত রকম চিন্তার ধারা শত রকম ভঙ্গীতে প্রকাশ হইয়া থাকে, কিন্তু আবেগের মুখে স্ত্রী থাকিলে ব্যাপারটা প্রায়ই একরোখা হইয়া পড়ে। ফল কথা, কবিতার জন্য দশখানা বই বরঞ্চ ভাল, কিন্তু কবির পক্ষে একটি বৌ লালন পালন করা কঠিন।

অতএব ভৈরববাবু সকালেই খাতা লইয়া বসিয়াছেন। পূর্ব্বে যে যে বস্তুর নাম উক্ত হইয়াছে সেই সব দিয়া প্রথমত একটি কবিতার চেষ্টা করিলেন। উই ইঁদুর আরশুলা প্রভৃতি দিয়া সাতনলী হার গাঁথিয়া নব প্রকাশিত একটি মাসিকের গলায় পরাইয়া দিবেন—মাসিক সম্পাদকের অনুরোধ ছিল এইরূপ। কিন্তু ভৈরববাবু সকাল বেলাতেই স্ত্রীর সঙ্গে যেরূপ ভৈরবী আলাপ করিয়াছেন তাহাতে হার গাঁথিবার সুরটি ঠিক ধরা পড়িতেছিল না! তাই তিনি পদ্য ছাড়িয়া গদ্যের আশ্রয় লইলেন। সম্মুখে একটি ভাঙ্গা লণ্ঠন ছিল—ভৈরববাবু মনে করিলেন বিষয়টি মন্দ হইবে না।

লণ্ঠন পুরাতন, তাহাতে আবার ভাঙা চিমনী। এই দুইটি হতভাগ্য অংশের ব্যথিত মিলন ভৈরববাবুর ক্ষুদ্র আঙ্গিনার আকাশবাতাসকে দেখিতে দেখিতে করুণ রসে সিঞ্চিত করিয়া দিল। এই যে ক্ষুদ্র চৌকোণ লণ্ঠন, ইহাতে রামধনু রঙের ত্রিশির কাঁচ নাই, ঝাড়ের জাঁকজমক নাই, ইহা অতি সাধারণ লণ্ঠন, দীন গৃহস্থের একমাত্র ভরসা; পল্লীর যশোহীন দরিদ্রের আঁধারের সম্বল। ধনীর কারখানায় ইহা কলে তৈয়ার হয় না, লিমিটেড কোম্পানীর আধিপত্য ইহার উপরে নাই। ইহা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত পারিপাট্যহীন পল্লীবাসীর অনুগত বন্ধু।

ইহার টিন আর কাঁচ উভয়েই বিলাতি বটে কিন্তু এদেশে আসিয়া কেমন আমাদের সমাজভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের কাহারও কোন জাতিগত অহঙ্কার নাই—দরিদ্রকে দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চন নাই। ইহারা উভয়েই বিদেশী বটে, কিন্তু দেশী লোকের হাতে ইহারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাই ইহারা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নয়—একেবারে ভারতীয়।

ইহার মূল্য চারি আনা বটে কিন্তু ইহারও আলোক বিতরণ করিবার ক্ষমতা আছে। ইহারা ডিট্‌জের মত প্রখর আলো লইয়া দারিদ্র্যকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে না, অভাবের সঙ্গে ইহার এমনি একটা সামঞ্জস্য হইয়া গিয়াছে।

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন এমন সময় ভৈরববাবু দেখেন তাঁহার স্ত্রী কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে আসিতেছেন। কবির স্ত্রী কবিকে তামাক সাজিয়া দিতেছেন ইহাতে অনেক কথা উঠিতে পারে, সে জন্য আগেই বলিয়া রাখা ভাল যে, উহা তামাক নয়—গাঁজা। এবং গণতন্ত্র, কাব্য সাহিত্য ইত্যাদি কথার মধ্যে হঠাৎ গাঁজার কলিকা আসিয়া পড়ায় শুধু যে রসভঙ্গ হইল তাহা নয়, অনেকে মনে করিতে পারেন যে, লেখকের নিজেরই আবগারি বিভাগের প্রতি সহানুভূতি আছে। ইহার জন্যও সামান্য একটা কৈফিয়ৎ দিয়া বক্তব্য আরম্ভ করা যাক। বস্তুত সহজেই যাহা ধারণায় আসে ব্যাপারটি তাহা নহে। এই দেশেই যখন সাহেব আর বাঙালীর মধ্যে অবাধ মেলামেশা ছিল তখন সাহেবেরা অধিকাংশই বাঙালীর চালচলন গ্রহণ করিত। এ বিষয়ে নানা রকম গল্প প্রচলিত আছে, কিন্তু অ্যাণ্টনি সাহেব যে গাঁজা খাইতে শিখিয়াছিলেন এ কথার সর্ব্বত্র উল্লেখ দেখা যায়। সাহেবেরা যে বাঙালীর কতখানি ঘনিষ্ঠ হইতে পারে তাহা ঐ গঞ্জিকা সেবন ব্যাপারেই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ভৈরববাবুও এ কথা বিশেষ ভাবেই চিন্তা করিয়াছেন, কেননা অভিজাত বংশ সম্বন্ধে যে লেখক যাহা কিছু লিখিয়াছেন সেখানেই মদের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু গাঁজা দীন দরিদ্রের নেশা বলিয়াই কি সাহিত্যে তাঁহার স্থান হইবে না? সাহিত্য যখন জীবনেরই অভিব্যক্তি, তখন, যাহা সাহিত্যে স্থান পাইবে—তাহা জীবনেও স্থান পাইবে। আরও একটি বিষয় এই যে, ভৈরববাবু নিজে গণতান্ত্রিক হইয়া বাড়ীতে চাকর রাখার বিরোধী। তাঁহার যাহা কিছু কাজ স্ত্রীই সম্পন্ন করিয়া দেন। লোকে যাহাই বলুক, ধনী ও অভিজাতের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই, দৈনিক দুই পয়সার নেশা করিয়া তিনি দীন শ্রমিকের সঙ্গে সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়াছেন। এখন কথা হইতেছে, মুটে মজুরেরা ত মদও খাইয়া থাকে তবে ভৈরববাবু একমাত্র গাঁজার ভক্ত হইলেন কেন? ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, ভৈরববাবু কাণ্ডজ্ঞানহীন নহেন, তিনি মাঝে মাঝে মদও খাইয়া থাকেন। যাহা হউক কবি-গিন্নী কলিকাটি স্বামীহস্তে অর্পণ করিয়া সুমধুর ভাষায় তাঁহাকে বলিলেন, 'তোমাকে এই শেষবার বলিতেছি, এ সব ছাড়িয়া দাও, ইহাতে কোন লাভ নাই—লোকে কেবল ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া বেড়াইতেছে।'

ভৈরববাবু কাতরভাবে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, একটু সবুর কর, নইলে আগুন নিভিয়া যাইতে পারে। তুমি না হয় একটু বাহিরে যাও।

স্ত্রী স্থান ত্যাগের কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া বলিলেন, 'আমি কোন কথা শুনিতে চাহি না। আমার কথার উত্তর দাও, নইলে খাতাপত্র গেল।'

ভৈরববাবুর হাতের কলিকা স্তব্ধ, চক্ষু স্থির। বোধ করি জীবনের প্রতি ক্ষণকালের জন্য একটু বিতৃষ্ণাও আসিল। মুহূর্ত্ত পরেই বলিলেন, 'দেখ, তুমি এত নির্ব্বোধ হইবে না। আমরা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি আর তুমি বল কি না লেখাপড়া ছাড়িয়া দাও—খাতা ছিঁড়িয়া ফেলিব! ধন্য তোমার স্বামী-ভক্তি! আমাকে লোকে পাগল বলে?—বলুক, লোকের কথায় কি হয়? লোকে যদি বলে আমি তোমার স্বামী নই, তুমি কি তৎক্ষণাৎ প্রতারণার দাবীতে আমার নামে নালিশ ঠুকিয়া আসিবে? দেখ, আমরা যাহা করিতে যাইতেছি তাহা সম্পূর্ণ নূতন। আমি হাতাহাতির বিরোধী। যে সব লেখক এতকাল যুঁই ফুল মলয় হাওয়া আর জ্যোৎস্না লইয়া কবিতা লিখিয়া আসিতেছেন, আমি চলিয়াছি তাহাদের বিরুদ্ধে নৈতিক যুদ্ধ ঘোষণা করিতে। মলয়, চাঁপাফুল এ সব ধনীর বিলাস—সুতরাং যে কবি ঐ সব লইয়া কিছু লিখিবেন তাঁহাকে হয় দরিদ্র ভাণ্ডারে বেশ কিছু দান করিবার জন্য অনুরোধ করিব, না হয় প্রতি কবিতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দশটি করিয়া মূলার ক্ষেত প্রস্তুত করিয়া দিতে বাধ্য করিব।

স্ত্রী এ কথা শুনিবামাত্র স্বামীর পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কহিলেন, 'নাথ, দাসীকে ক্ষমা কর। আমি মূর্খ জ্ঞানহীনা অবলা নারী, আমি তোমার গণতন্ত্রের কি বুঝি? আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর কখনও আরশুলা তাড়াইব না, ইঁদুর ধরিব না, মশা মারিব না।'—বলিয়াই স্বামীর পায়ের ধুলা মাথায় মাখিলেন।

ভৈরববাবু ইহাতে গদগদ হইয়া স্ত্রীকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন। স্ত্রীর পায়ে লুটাইবার ঝোঁক যখন বেশ কাটিয়া গেল, তখন বলিতে লাগিলেন, 'দেখ, পৃথিবীতে পোকা মাকড় কেমন স্বাধীন ভাবে লম্ফ ঝম্ফ করিয়া বেড়ায়, আমাদের কোনও অধিকার নাই যে উহাদিগকে হত্যা করি। সমাজে নিম্ন শ্রেণীর মানুষকে উন্নত করিয়া এক শ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে, ছোট বড়র প্রভেদ ঘুচাইয়া একাকার করা হইতেছে, এই সময় কোন মহাপুরুষ, এমন কথা ভাবিতেছেন না যে, এই সব নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী-গুলাকেও সমাজে স্থান না দিলে আমাদের মুক্তি কেবল কাগজে কলমেই থাকিয়া যাইবে। মশা মাছিকে এমন করিয়া উচ্ছেদ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আধুনিক সভ্যতা কেবল তাহার নিজের হৃদয়হীনতারই পরিচয় দিতেছে। কি বল গিন্নি ?'

স্ত্রী জিজ্ঞাসু নয়নে স্বামীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, মশা মাছিকে মারিয়া ফেলিলে ক্ষতি কি ?'

ভৈরববাবু হতাশ ভাবে নির্ব্বাণোন্মুখ কলিকার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, 'জান কি গিন্নি, ঐ মশা মাছির ভিতরে কি সত্য লুকাইয়া রহিয়াছে ? মানুষ কতকগুলি যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিয়া মনে করিতেছে সে সকলের উপর টেক্কা মারিবে ! তাহা কি হয় ? মানুষ তাহার উদারতা আর সভ্যতার যতই বড়াই করুক, সে যে ঘোর অসভ্য ইহাই আমি প্রমাণ করিব। কুসংস্কার এমনি আজ সকলকে অন্ধ করিয়াছে যে, কতকগুলি নামের মোহকে সে আর কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। সভ্যতার বেড়া দিয়া সৃষ্টির এক অংশকে ঘিরিয়া সে আজ মানুষকে জগৎ হইতে পৃথক করিতে চাহিতেছে—অহো কি অধঃপতন !

কবি-স্ত্রী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, 'আমি না হয় তোমার কলিকায় আবার আগুন আনিয়া দিতেছি—তুমি বাক্য ছাড়িয়া একটু বিশ্রাম কর। একটু সংসারের দিকে মন দাও। কয়েক দিন ধরিয়া একটি মশারি কিনিয়া আনিতে বলিতেছি, তুমি সে দিকে কান দিলে না, কিন্তু খোকা যে মশার কামড় আর সহ্য করিতে পারিতেছে না।'

ভৈরববাবু কলিকাটি আগাইয়া দিলেন, কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার অশ্রু চোখের প্রায় পনর আনা আসিয়া থামিয়া গেল। কেন এই অশ্রু ?—আর কিছুই নয়, যে স্ত্রীর কাছে মশা মাছি সম্বন্ধে এত বক্তৃতা দিলেন সে-ই কি না বলে মশারি কিনিতে ! ভৈরববাবু রোদন করিতে করিতে রোদন করিলেন না।

এমন সময় বাহির হইতে শব্দ শোনা গেল,—'ভৈরব-বাবুর কি এই বাড়ী ?'—

ভৈরববাবু দরজা খুলিয়া দিলেন। যিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন তিনি তাঁহার নব পরিচিত কবি-বন্ধু বিমানচন্দ্র।

বিমানচন্দ্র আসন গ্রহণ করিয়াই বলিতে লাগিলেন, 'দেখুন ভৈরববাবু, মাটি হইতে যে যত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে সে তত সভ্য। অ্যামেরিকানরা আধ মাইল উঁচু বাড়ীতে বাস করে, আজ জগতে তাহাদের মত সভ্য কে ? তারপর, দেখুন এরোপ্লেন আবিষ্কার হওয়াতে সভ্যতার চরম উন্নতি হইয়াছে। আমাদের দেশেও কি ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে ? যাহারা অসভ্য অমানুষ তাহারা দারুণ গ্রীষ্মেও মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করে, কিন্তু যাহারা উন্নত তাহারা সেই মুহূর্ত্তে হিমালয়ের বিপুল উচ্চতায় উঠিয়া কাঞ্চনজঙ্ঘার উপরে আলোর খেলা দেখে।'

ভৈরববাবু এই কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।—'বিমানচন্দ্র যে কবি এই কথা শুনিয়াই তিনি তাঁহার সঙ্গে মৌখিক পরিচয় করিয়া আসিয়াছিলেন—কিন্তু তিনি যে ভৈরববাবুর বিপরীত মতাবলম্বী তাহা জানি-তেন না। সুতরাং যতদূর সম্ভব ভদ্রতা রক্ষা করিয়া, অথচ উহারই মধ্যে একটু তীব্রতা মিশাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'রাখিয়া দাও তোমার হিমালয় ! যে টাকার জোরে তাহারা আকাশে উঠে তাহার জন্মস্থান এই মাটির নীচে। মাটিকে যাহারা ছাড়িতে চায়, তাহাদের দলে আমি নই। হাঁ, তাহারা যদি মাটির খাদ্য মাটির জলকে ত্যাগ করিতে পারে তবেই বুঝিব বাহাদুর। কত বেটাকেই দেখিলাম, তাহারা কিছুদিন ঐ ভাবে উড়িয়া বেড়াইতে চায়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কেহই টিঁকিয়া থাকিতে পারে না।—মাটিকে ভাল-

বাসিতে শেখ—দেখিবে মাটির মশা মাছিটিও কেমন সুন্দর!

বিমানচন্দ্র বলিলেন, 'কেন মশা মাছিও ত উড়িয়া বেড়ায়।'

ভৈরববাবু সে কথার কোন উত্তর না দিয়া ডাকিলেন, 'মৃণ্ময়ী, মা, দুটো পান দিয়ে যাও ত।'

ভিতর হইতে মৃণ্ময়ী বলিল, 'এই যাই বাবা।'

ভৈরববাবু এইবার তাঁহার খাতা খুলিয়া বিমানচন্দ্রকে দেখাইতে লাগিলেন। খাতায় গদ্য এবং পদ্য উভয় প্রকার লেখা প্রায় দুই শতটি রহিয়াছে। বিষয়, মাটি, জল, প্রদীপ দাসদাসী, মুটে, মজুর, ছারপোকা, মশা, ধেনোমদ, গঞ্জিকা সিদ্ধি, ঘেঁটুফুল, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভৈরববাবু বলিতে লাগিলেন, 'মাটির কোন্ বস্তুটি খারাপ? এই যে ছারপোকা ইহারা পরের রক্ত খাইয়া জীবন ধারণ করে। কিন্তু ইহারা আমাদের মত রাখিয়া ঢাকিয়া সভ্যতার পোষাক পরিয়া পরোপকারের নামে পরের সর্ব্বনাশ করে না। ইহারা যাহা খায় তাহার সহজ নাম রক্ত, সভ্য নাম রক্ত, অসভ্য নাম রক্ত। তারপর মশা। ইহারা আরও 'সত্যাগ্রহী'। ছারপোকার মধ্যে যেটুকু গোপনতা আছে ইহাদের মধ্যে তাহাও নাই। ইহারা রীতিমত সশব্দে আসে এবং সহজ ভাবে রক্তপান করে। আরও একটি কারণ আছে যাহাতে ইহারা আমাদের সহানুভূতি দাবী করিতে পারে। ইহারা যে ম্যালেরিয়ার বিষ আমাদের শরীরে ঢুকাইয়া দেয় তাহাতে ইহাদের কিছু মাত্র দোষ নাই। ম্যালেরিয়া জীবাণুই চোরের-মত রক্তের সঙ্গে ইহাদের পেটে গিয়া লুকাইয়া থাকে এবং চোরের মতই গোপনে অন্য দেহে সংক্রামিত হয়।'

বিমানচন্দ্র বলিলেন, 'আপনি মদ গাঁজা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন কেন? ইহাতে কি শ্লীলতা রক্ষা হইয়াছে?'

ভৈরববাবু বলিলেন, 'নিশ্চয়ই! কেন না ইহা আমার নিজের আদর্শের পরিপন্থী। আমি গণতন্ত্রী এ কথা ভুলিবেন না। গণতন্ত্র দাবী করে দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে, ক্ষুদ্রকে শ্রদ্ধা করিতে। আর ধেনো মদ যে দরিদ্রের বন্ধু, দরিদ্র দেশের পল্লীতে পল্লীতে ইহার দোকান থাকাতেই প্রমাণ হয়। শেরী, শ্যাম্পেন, হুইস্কি ব্র্যাণ্ডি পান করিলে মেজাজটা আমীরি হইয়া পড়ে, কিন্তু খাঁটিতে প্রাণ-খোলা ভাব। মজুরেরা যখন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর সারাদিনের উপার্জ্জন অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়া বসে, তখন তাহাদের স্ত্রী-পুত্রদের লইয়া যে কি একটি মধুময় লীলা হয় তাহা দ্রষ্টা যে সে ছাড়া আর কেহ দেখিতে পায় না। আমরা সভ্যতার কৃপায় অনেক রকম ভদ্রতার ভাষা শিখিয়াছি, কৃত্রিম বিনয় সৌজন্য দেখাইতে অভ্যস্ত হইয়াছি, কিন্তু শুঁড়ীর দোকান ফেরৎ এই সব মুটে-মজুরদের মধ্যে সে সব কিছু নাই। ইহারা প্রাণ খুলিয়া অকথ্য বলে, হাতের সাধ মিটাইয়া স্ত্রীকে প্রহার দেয়, পুত্র-কন্যাদের অনাহারে রাখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জনও করে। তাহাদের ভাষায় শ্লীলতার বাঁধ নাই, এবং এই জন্যই তাহা এত প্রাণস্পর্শী। —আপনি কি বলেন?'

বিমানবাবু বলিলেন, 'আপনার কথা পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি যদি সাহিত্যিক কিংবা কবি হইতে চান, তাহা হইলে আপনার এ সব কথার কোন মানেই হয় না। যাহা স্পর্শের অতীত, তাহাই হইল কবিতার প্রাণ। যাহা পৃথিবীতে বিচরণ করে, যাহা ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, কাব্যে তাহার কোন মূল্য নাই। কবি কাব্যে যাহা ফুটাইয়া তুলেন, সেই অতীন্দ্রিয় বস্তুই ভবিষ্যৎ মানুষের উদরের এবং অন্তরের আহার জোগাইবে। আমাদের আদর্শ এবং লক্ষ্য সেই অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, যাহার বিস্তৃতি আছে কিন্তু স্থিতি নাই। আমাদের কাব্যেই হোক জীবনেই হোক, পার্থিব বস্তুকে অগ্রাহ্য করিতেই হইবে। আসুন, আমি আপনাকে দীক্ষা দেই।'

ভৈরববাবু এইবার ধৈর্য্য হারাইলেন। নিজের মতের বিরুদ্ধ কথায় অনেকেরই উহা হারাইবার কথা, সুতরাং ভৈরববাবুরই যে ষোলআনা দোষ এ কথা বলা চলে না। অধিকন্তু বিমানচন্দ্র বয়সেও অনেক ছোট। ভৈরববাবু বলিলেন, 'বর্ত্তমান যুগের তুমি একটি অপদার্থ জীব। মাটির প্রাণী হইয়া তুমি কিনা আকাশবাতাস লইয়া মাতামাতি করিতে চাও! মূর্খ, আমাকে চাও দীক্ষা দিতে?—শীঘ্র এখান হইতে বাহির

হইয়া যাও। আমার এ মাটির বাড়ী, আমরা মাটিতে বাস করি, তোমার মত শূন্যচারী বিমানের এখানে কোন স্থান নাই। এই কথা বলিতে বলিতে ভৈরববাবু বিশেষ উত্তেজিত হইয়া বাড়ী হইতে নিজেই বাহির হইয়া গেলেন। বিমানচন্দ্রও বেকুফ হইয়া আস্তে আস্তে উঠিলেন। কিন্তু ভৈরববাবু বিমানচন্দ্রের অভ্যর্থনার জন্য যে পান চাহিয়াছিলেন, তাহা তিনি ভুলিয়া গেলেও মৃণ্ময়ী ভোলে নাই। এই মেয়েটি পিতার আদর্শে কিছু কিছু অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। তাহার বয়স যদিও পনেরো, তবু এই অল্প বয়সেই সে নানাবিষয়ে চিন্তা করিত। মৃণ্ময়ী মাটিকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছিল—সে মাটির শিব গড়াইয়া পূজা করিত, অন্ধ খঞ্জ ভিখারীকে ভিক্ষা দিত এবং সময় সময় মাটিতে শুইয়া থাকিত। মৃণ্ময়ী যখন পান লইয়া অঙ্গনে আসিল তখন বিমানচন্দ্র গমনোদ্যত হইয়াছেন। সুতরাং উভয়ের দেখা হইয়া চারি চক্ষুর মিলন হইল। বিমানচন্দ্রের মস্তিষ্কের কোন একটি অংশে মৃণ্ময়ীর দেহের প্রতিফলিত আলো তাঁহার রেটিনা ভেদ করিয়া চক্ষুতন্ত্রীকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল এবং সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার মগজে একটি রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়া তাহার মধ্যে মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির ছাপ বসিয়া গেল। ইহা যে বিমানবাবু বলিয়াই হইল, এ কথা বলিলে তাঁহার প্রতি অন্যায় কটাক্ষপাত করা হয়। ইহা অন্যের হইলেও ঠিক এই রকমই হইত। যাহাহউক ইহাতে মৃণ্ময়ী বোধ হয় একটু লজ্জা পাইয়া সংক্ষেপে বলিল, 'এই যে পান।'

বিমানচন্দ্রের উত্তেজিত চিন্তারাশি দেখিতে দেখিতে হঠাৎ খুব হাল্কা হইয়া প্রায় শত যোজন উর্দ্ধে উঠিয়া যাওয়াতে এখন তিনি শূন্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মৃণ্ময়ীর কথা তাঁহার কানে গেল কিনা তাহা ঠিক বুঝিবার উপায় নাই, কিন্তু তিনি যাহা বলিলেন তাহার সঙ্গে পানের কোন সংশ্রব ছিল না। কারণ ইহার পরেই বিমানচন্দ্র মনে করিলেন তাঁহার গুরুতর অপরাধ হইয়াছে। এই অপরাধটি যে কি এবং কেন হইল, এবং এ রকম অবস্থায় পড়িলে আর পাঁচজনেরও হয় কিনা, এ সব কথা গল্পে আলোচনা করিলে তত্ত্ব আলোচনার মত শুনাইবে বলিয়া নীরব রহিলাম। বিমানচন্দ্র বলিলেন, 'আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।—আচ্ছা, ছোটখাটো তুচ্ছ জিনিষকে অযথা বড় করিয়া তোলা সম্বন্ধে আপনার মত আমি জানিতে চাই। আমার ধারণা জন্মিয়াছে আপনি এ বিষয়ে কিছু চিন্তা করিয়াছেন।

মৃণ্ময়ী বলিল, 'আমরা মেয়েমানুষ, ওসব বিষয়ে কোন তত্ত্বকথা শুনাইতে পারিব না। কিন্তু আমার বোধ হয় মশা মাছি একদিন মানুষকে উদ্ধার করিবে। অতবড় একখানা রামায়ণ সম্ভব হইল কেবল হনুমান ছিল বলিয়া অথচ বাঙালীর জীবনে হনুমানের কোন স্থান নাই। হনুমানের যথেষ্ট টাকাপয়সা ছিল না বলিয়াই বোধ হয় এইরূপ।'

বিমানচন্দ্র উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ঠিক বলিয়াছেন। আমরা যাহাকিছু সৌন্দর্য্য উপভোগ করি তাহা কোথা হইতে পাই?—একমাত্র মাটি হইতে। এমন কি, যে অভিজাত বংশ শূন্যে থাকিয়া উচ্চতার গৌরব অনুভব করে তাহারা মাটির সরল সৌন্দর্য্যকে দেখিতে পায় না বলিয়াই অর্থ দিয়া, অলঙ্কার দিয়া, পাউডার দিয়া নকল সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে থাকে। যাহাকে এতকাল তুচ্ছ বলিয়া ভাবিয়াছি তাহাই যে মহামূল্য জিনিষ, এ কথা এখন আমি বেশ বুঝিতেছি। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, আজ হইতে মজুর-সভার সভ্য হইব, আর ক্ষুদ্রকে অশ্রদ্ধা করিব না। ওঃ কি অন্যায়ই আমি এতকাল করিয়াছি! আপনার মত উচ্চশিক্ষিতা মেয়ের একটি কথা সারা জীবনের দুর্ব্বুদ্ধিকে নষ্ট করিয়া দেয়। আপনার সঙ্গে যতই কথা কহিতেছি ততই আমার অন্তর উত্তরোত্তর প্রশস্ত হইতেছে।'

মৃণ্ময়ী লজ্জায় নত হইয়া বলিতে লাগিল, 'আমি উচ্চ শিক্ষিতা নাহি, কোন রকম শিক্ষাই পাই নাই, এরূপ অবস্থায় আমার সামান্য একটি কথায় আপনার মত বদলান কি ভাল হইবে?' বিমানচন্দ্র অধীর হইয়া উঠিলেন। ফল কথা, ক্রমশই তাঁহার ভাষা এলোমেলো হইয়া পড়িতে

লাগিল। তিনি মৃণ্ময়ীর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বলেন কি? আপনি উচ্চ শিক্ষিতা নহেন? ও বুঝিয়াছি। আপনারা কোন কিছুর উচ্চতা স্বীকার করেন না। তা হোক, ক্ষুদ্রের মধ্যেই বৃহতের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে—আমরা অন্ধ, তাই দেখিতে পাই না। আমি আপনাকে আদর্শ রাখিয়া একটি সমিতি স্থাপন করিতে চাই—একটি প্রতিষ্ঠান, তাহার মাঝখানে আপনি দেবী রূপে অধিষ্ঠান করিবেন। আপনি আমাকে যে রত্ন দান করিলেন তাহা আমি জগৎকে দেখাইতে চাই। আপনার সহকর্ম্মী হইবার জন্য আমার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, এমন কি আপনি আমার শূন্যের মেঘে আচম্বিতে বৃষ্টির ধারা বহাইয়া একেবারে মাটিতে ফেলিয়াছেন—একেবারে আপনার পা যেখানে রহিয়াছে ঠিক ঐ খানটাতে—না না, আপনার পা সরাইবার দরকার নাই। ও, আপনি চলিয়া যাইতেছেন?—কেন? আচ্ছা আমিই না হয় যাই—কিন্তু একটা কথা।—আপনি কি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইলেন?' বিমানচন্দ্র মনে করিলেন, তিনি মৃণ্ময়ীর কাছে যতগুলি কথা বলিতেছেন তাহার প্রত্যেকটিই বোধ হয় পিনাল কোডের কোন না কোন ধারায় গিয়া পড়িতেছে, তাই তিনি একবার বলেন আর পাঁচবার করিয়া ক্ষমা চান। বিমানচন্দ্র বলিলেন, 'আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন—আমি আমার এত দিনের সংস্কার সমস্ত বিসর্জ্জন দিলাম—আপনি আমার জীবনে নূতন আলো দান করিয়াছেন—আমাকে ক্ষমা করিবেন।'

মৃণ্ময়ী তেমনি সঙ্কুচিত হইয়াই বলিল, 'আমার জীবনের কোন মূল্যই নাই, আমি দেবী নই, আমি মাটি।'

বিমানবাবু বলিলেন, 'ছি ছি, অমন কথা বলিতে নাই। আচ্ছা আপনি কি বিবাহিত?—কিছু মনে করিবেন না।'—বলিয়াই চাহিয়া দেখেন মৃণ্ময়ী অদৃশ্য হইয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে মৃণ্ময়ীর মাতা সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি বিমানচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বিমানচন্দ্র, শুনিলাম তুমি উঁহার নবপরিচিত বন্ধু মাত্র! এরূপ অবস্থায় কাণ্ডজ্ঞানহীন অভাগী মেয়েটাকে কি সব বলিতেছ, তাহাতে সে ভয় পাইয়াছে। বিধবা মেয়ের তোমাদের সমাজে কোন মূল্য নাই, তাহার দ্বারা কোন কাজও হইবে না। আর তাঁহার অনুপস্থিতিতে তোমার এখানে থাকা আমি উচিত মনে করি না।'

বিমানবাবু এইবার আত্মস্থ হইয়া বলিলেন, 'বেশ আমি চলিলাম। আপনারা যে রকম অপমান করিয়াছেন, ইহার পরেও যে আমি এখানে আছি ইহাই আশ্চর্য্য। আমার শেষ কথাটি বলিয়া যাই—ভৈরববাবুর গণতন্ত্র মতের সঙ্গে আমার কোন সহানুভূতি নাই—এ সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ব মতই বহাল থাকিল।

বেলা শেষের আলো

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

মৃত্যুর মতই রাতটা স্তব্ধ।—নিঃশ্বাসটুকুও পড়ে না—

ওয়ার্ডের সমস্ত আলোগুলো নিভানো। কেবল একটি মাত্র আলো জ্বেলে নার্স একমনে সবুজ একখানা চিঠি পড়চে। লম্বা টেবিলটার ওপর একেবারে ঝুঁকে পড়েচে ও!

আশপাশের সব ক'টি রোগীই ঘুমুচ্চে।

কেবল আমারই ক্লান্ত চোখের পাতায় তার পরশ লাগে নি এতটুকু!—ঘুমের মরুভূমি!

শুয়ে শুয়ে দেখ্চি—নার্স তখনও চিঠি পড়চে। বেশ বুঝতে পারচি একবার শেষ হয়ে গেছে চিঠিটা, ও আবার নতুন করে সুরু করেচে ওর পড়া।

সবুজ চিঠিখানির ওপর ও এমন করে চেয়ে আছে, যেন তরঙ্গ নীল আদিধরণীর মুখের ওপর আদি নিশীথাকাশের সকরুণ সজল দুটি তারা!

ওর মুখখানির প্রতি চেয়ে মনে হচ্চে—ওর এই একান্ত সেবারত শান্ত মূর্ত্তিখানির আড়ালে, সকলের অগোচরে, অহরহ একটি ব্যথার ক্লান্ত ধ্বনি বেজে উঠ্চে।

...হয় ত ওর কোনো প্রিয়জন ওর খোঁজ করেচে। তাই রাত্রির এই স্তব্ধ প্রহরে ওর নিরুদ্ধ-নারীটি বারবার চঞ্চল হয়ে উঠ্চে।...বাসি রজনী-গন্ধার মত শুকনো ওর মুখখানির প্রতি চেয়ে মনে হয়, আজকের এই চিঠির আহ্বানে সাড়া দিতেও পারচে না, পারবেও না।

...ওকে কাছে ডেকে কথা কইতে ইচ্ছে করচে। ইচ্ছে করচে ওর স্বর্ণরেণুর মত চুলগুলিতে একটু নাড়া দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, কি তোমার বেদনা?...যদি গোপনই কিছু হয়, তবু ক্ষতির সম্ভাবনা তোমার কিছুই নেই!... বল তুমি—

ওর গোপন-ইতিহাস আমার সঙ্গে সঙ্গেই এই অসম, ব্যথা-সর্ব্বস্ব পৃথিবী থেকে মুছে যাবে।..সেও ক'দিনই বা আর?—দেরী ত' নেই বেশী!

তখন আবার এই একশ' বিয়াল্লিশের বেডে নতুন রোগী আস্‌বে, আমারই মত তার সেবা করবে এরা!... মানুষের মৃত্যুর ওপর বিস্মৃতির পর্দ্দা এরা যত তাড়াতাড়ি টেনে দিতে পারে তত আর কোথাও না, কেউ না! কি জানি, চোখের ওপর নিত্য নতুন মরণ দেখে ও জিনিষটার কোনো বিশেষত্ব, কোনো মানেই হয় ত আর এদের কাছে নেই।..

ওকে জিজ্ঞাসা করে বসলাম, মানুষের মৃত্যুকে তোমরা এত তাড়াতাড়ি ভোল কি করে?

ও কোনো জবাব দিলে না, হাসলে শুধু!

অপরূপ ওর ঐ হাসিটুকু!

বল্লাম, উত্তর দিতেই হ'বে, ছাড়বো না—

ও আমার ঠোঁটের ওপর তর্জ্জনীটি ছুঁইয়ে বললে, আস্তে, রুগীদের ঘুমেরব্যাঘাত হ'বে।

ইচ্ছে করল বলি, ওদের ঘুমের ব্যাঘাত হ'বে তারই ভাবনা, আর কেউ যদি সারা রাত্রি ঘুমুতে না পারে?

ওকে আঘাত দিতে ইচ্ছে হ'ল না।

চুপ করেই রইলুম।

ও আপনা হ'তেই খানিক পরে বললে, তোমার প্রশ্নের উত্তর শুনবে না?

শুনবো, যদি বলো।

ও বললে, বলবো।

কিন্তু যা বললে তা আমার প্রশ্নের উত্তর নয়। নতুন একটা প্রশ্ন।

বললে, মরুভূমি কি মেঘের স্বপ্ন দেখে না?

কি জানি!

হাসবার চেষ্টা করে বললাম, এর উত্তর শুধু মরুভূমিই দিতে পারে নার্স।

ওর মুখখানি হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে উঠ্‌ল।

বললে, তুমি সুখী। মরুভূমির উর্ব্বরতা তোমার জীবনকে বিড়ম্বিত করে নি।

কোনো জবাব দিই না। দিতে গেলে—এই জীর্ণ জীবনের পাতাগুলো খুলে ওকে দেখাতে হয়।

খানিক চুপ করে থেকে ও হঠাৎ বল্‌লে, আমায় ক্ষমা করো। জীবনে তুমিও বোধ হয় সুখী হ'তে পারো নি!

—কি করে জানলে?

তোমার চোখ ছুটি তাই বলে। আরো দেখেছি, যখন চোখ বুজে পড়ে থাকো—

হঠাৎ মনে হয় ও আমার পরম নিকট, ওর সঙ্গে আমার চিরকালের চেনাচিনি! ভুলে যাই এ আমার ছু'দিনের মায়া-নীড়। ডাক এলে কালই আমায় এই স্নেহের স্বর্গ ছেড়ে যেতে হ'বে...

তবু এই রুগ্নশয্যা আজ আর আমার পর নয়, একে এই ছু'দিনেই আমি ভালবেসেচি।

কানে কানে কোত্থেকে কে বলে, তোর সবটুকুই শূন্য নয়। যাত্রাকালে বাঁশীতে তোর নতুন সুর বেজেচে, শুনে যা!

কিন্তু কি এ?

এ আমার বেলা শেষের গান, না কান্না?

জুঁই ফুলের মত শুভ্র কোমল ওর হাতখানি ধরে ফেলে জিজ্ঞাসা করি, তোমার নাম বলো,—

ও বলে, তুমি ভারি দুষ্টু, এতটুকু সঙ্কোচ নেই তোমার!

ওর তিরস্কারের আড়ালে খুসীর সুর বাজে। বলি, কেন, কিসের সঙ্কোচ?

—কেন? কোনো রুগীই ত' এমন অনাবশ্যক প্রশ্ন করে না, করে নি।

আবার বলি, বলো তোমার নাম। এড়িয়ে গেলে চলবে না। সঙ্কোচ লজ্জা পারিয়ে এসেচি আজ।

ওর নাম শুনলুম—বিয়াট্রিস।

হয় ত ওরি মত আর একটি মেয়ের তনুমন চুরি ক'রে কবি তাঁর কাব্যকে অমর ক'রে গেছেন।

বেশ স্পষ্ট ক'রেই ওর সামনে আবৃত্তি করি, বিয়াট্রিস! বিয়াট্রিস!

ও রাগের সুরে বলে, পাগল!

থামতে ইচ্ছে করে না, স্মৃতির ভাঁড়ার শূন্য করে বর্ণনা করি—হ্রদের ধারে—বিয়াট্রিস-মিলনের কাহিনী!

ও বিস্ময়ে অধীর হয়ে বলে, তুমি দান্তে পড়েচো?

বলি, আরও কত!...হোমর পর্য্যন্ত, কিন্তু কেউ কাজে এল না!

পাশের রুগীটি 'জল জল' ক'রে চীৎকার ক'রে উঠল, নার্স তাড়াতাড়ি গিয়ে থামালে ওকে।

আজ সন্ধ্যে থেকে জল পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে ওর। বুড়ো রুগী—ক্রমাগত চীৎকার করতে লাগল, জল না খেলেই আমি বেঁচে থাকব? ক'দিন রাখবে এমনি জল বন্ধ করে? জল না খেয়ে মানুষ বাঁচে?

নার্স তবু জল দিতে পারে না; হাউস-সার্জ্জনের অনুমতি নেই। তাই বুড়ার আবেদন ও কানে আনে না। আমি ভাবি, নার্স সরে গেলেই ওকে একটু জল দেব। জল বন্ধ করে হয় ত চিকিৎসাশাস্ত্রের নিয়ম পালন করা হ'বে, কিন্তু বাঁচানো যে যাবে না এ আমি বেশ বুঝতে পারচি।

নার্সের ওপর একটা বিরক্তিকর ভাব এসে জড় হ'তে লাগল।

বিয়াট্রিস এসে পাশে বস্‌ল। আমার রুক্ষ মাথার ওপর

কোমল হাত দু'খানি রেখে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কাউকে ভালবাসো নি ?...তোমার ভালবাসার গল্প বলো—

আস্তে আস্তে মাথা থেকে ওর হাত দুখানি নামিয়ে দিয়ে বললাম, আমার পাশে একজন জলতেষ্টায় ছট্‌ফট্‌ করবে, আর আমি তোমার হাত ধরে প্রেমের কাহিনী শোনাবো,—এই কি তোমার ডাক্তারের হুকুম ?

নিঃশব্দেই ও উঠে গিয়ে নিজের টেবিলের ধারে বসল। অস্পষ্ট আলোয় দেখতে পেলুম ওর চোখে মুক্তা বিন্দুর মত দু'ফোঁটা জল !

ওর চোখের জলে আমার বেদনার নবজন্ম হল।

নিজের কাছে হঠাৎ মস্ত অপরাধী হয়ে উঠলুম।

কেন ওকে রূঢ় কথা বললুম ?

ও কি করতে পারে ? নিয়মের ফাঁদে ও বন্দী

টেবিলের ধারেই হাত দু'খানির ওপর মাথা রেখে বিয়াট্রিস ঘুমিয়ে পড়েচে।

আমার চোখে ঘুমের লেশ পর্য্যন্ত নেই।

হঠাৎ পাশের রুগীটি হাত বাড়িয়ে আমায় টেনে ধরে বলল, জল একটু দিতে পারেন বাবু ? সন্ধ্যে থেকে এরা আমায় জল দেয় নি। চুরি করে একটু জল দিন আমায়—

চুরি করেই জল দিই ওর মুখে !

হয় ত রোগ বিগড়ে দাঁড়াবে, তবু হাত গুটিয়ে থাকা যায় না।

বুড়ো আমার হাত দুখানি ধরে বল্লে, আপনি কালই সেরে উঠ্‌বেন। মানুষের ওপর যার এত দয়া ভগবান তার ওপর নিষ্ঠুর হবেন না।

...মানুষের দুর্দ্দশায় ভগবানের দুঃখ ?

হাসি এল।

তবু ওর আন্তরিক আশীর্ব্বাণীতে অনেকখানি তৃপ্তি হল।

ঘুমের লোভে চোখ বুজলুম।

*

* *

সকালে ঘুম ভেঙে দেখি বিয়াট্রিস তার ডিউটি শেষ ক'রে চ'লে গেছে।

আজকের এই নতুন প্রভাতটিকে ভারি বিশ্রী লাগচে। যেন কার বিচ্ছেদের বেদনায় আমার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হয়ে গেছে, তাই আজকের ভোরকে আমি অভিনন্দন দিতে পারলুম না।

কিন্তু, এ আবার কি ?

গোধূলির তীরে দাঁড়িয়ে দীপ্ত দিনের স্বপ্ন !

কিন্তু স্বপ্ন নইলে কি মানুষ বাঁচে ? মানুষের চিরটা কালই ত' কাটে এই স্বপ্নঘোরে। হয় ত তাই, মানুষের জীবন বিধাতার এক অর্থহীন স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু আমার এ কার প্রত্যাশা ?—এই নির্ব্বান্ধব, মৃত্যুর জন্মভূমিতে পড়ে প্রেমের স্বপ্ন—বাঁচবার সাধ ?

নারীর বুকে অক্ষয় নীড় রচনা করবার সাধ আজও বুঝি মরে নি ! কিন্তু আঁধার যে ঘনিয়ে এল ! মৃত্যুর আরতি-শঙ্খ যে আমার দেহের মন্দির মুখর করে তুলেছে !

তবুও স্বপ্ন ছাড়ে না।

এই কি মানুষের চিরন্তনী ?—আপনার মধ্যে আর একটির কামনা ?

ঘর ত' বাঁধতে চেয়েচি—কতবার। নিষ্ঠুর আঘাতে আমার স্বপ্নের মতিমহল ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে—বার বার ! নারীকে আপন করতে আমি পারি নি, ঘর-বাঁধা আমার হয় নি !

—আমি অসম্পূর্ণ, আমি অতৃপ্ত। তাই ত' যাযাবর জীবনের বোঝা বহন করে ঘুরে মরলুম দেশদেশান্তর !

আজ ঘুরে মরবার শক্তিটুকুও নেই ! নিজেকে মৃত্যুর দুয়ারে এনে বিছিয়ে দিয়েচি—

তবু ঘর বাঁধবার কামনা আমার মরে নি ! আজও ভাবি,—আমি বাঁচব ! আমার ঘর হ'বে, ঘরণী হ'বে—এই বিয়াট্রিসেরই মত অপরূপ কেউ !

উঃ !...মানুষের মত দুর্ব্বল বুঝি কেউ নয়। সন্ধ্যের আগে ওর সঙ্গে দেখা হ'বার উপায় নেই। রাতের কাজ ওর। সমস্ত দিনটা কি করে কাটাবো ?

সকালের নার্স আমার চুল আঁচড়ে দিলে।

পাশের রুগীটি চেয়ে চেয়ে তাই দেখ্‌চে।

নার্স সরে যেতেই বিড়বিড় করে বললে, যত্নের বলিহারি যাই! কেউ মরবে ছট্‌ফট করে—এক গণ্ডূষ জল পাবে না, আর কেউ বসে বসে কেতাব পড়বে, নবেল পড়বে—মেম এসে চুল আঁচড়ে দেবে! চুমুও দেবে কোন দিন্!

সময় কাটাবার জন্যে আমার মাথার কাছে রাজ্যের খাতাপত্র আর বই জড় করা থাক্‌ত। ওর কথা শুনে রাগ করতে পারলুম না। হাসিও এল না। মাথা নীচু করে চুলগুলোকে এলোমেলো করে দিলাম।

বুড়ো আবার চীৎকার সুরু করেচে,—জল, জল! যে আসে, তাকেই বলে, শুনচেন? কাল থেকে জল পাই নি এতটুকু, একটু জল দিতে বলে দিন,—

বেলা বোধ হয় আটটা হবে। রোদের আলোয় ঘর ভরে উঠেছে।—

হাউস-সার্জ্জন ঘরে ঢুকতেই ও চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল। ডাক্তারবাবু, কাল সারারাত্তির চীৎকার করেচি, কেউ একটু জল দেয় নি। আপনার দয়ার শরীর, একটু জল দিতে বলে দিন—

ডাক্তার জলের বদলে ফোঁড়বার যন্ত্র নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

—এতেই তেষ্টা কমবে।

বুড়ো কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসে ডাক্তারের হাত চেপে ধরে বল্লে—খবরদার, ফুঁড়তে দেবো না আমি। উঃ, ফুঁড়েই সাবাড় করবে এরা আমায়! খবরদার, আর এগিয়ো না; আমি বাড়ী চলে যাব। হ্যাঁ, দাও আমায় ডিস্‌চার্জ করে, পাল্কী করে বাড়ী চলে যাই, গঙ্গাজল খেয়ে মরিগে। না, না, সে হ'বে না, জল না খেয়ে মরতে পারবো না। ডিসচার্জ করে দাও আমায়। দেবে না? আচ্ছা ফোঁড়ো, তোমাদের হাতে পড়েচি। কিন্তু, মরণকালে এক গণ্ডূষ জল দেবে বলো?

এমনি ওর চীৎকার!

কিন্তু বেশীক্ষণ চীৎকার চল্‌ল না ওর। জল জল করতে করতেই ওর গলা ভেঙে গেল।

ওর সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। নার্স এসে বার বার মুছিয়ে দিলে।

ডাক্তার এসে বারবার নাড়ী টিপ্‌লে, ফুঁড়লেও বার কতক,—

তবু জল দিলে না এক ফোঁটা!

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর এ জন্মের জলতেষ্টা মিটে গেল।

বাইরে ওর মা-বউ এসে কাঁদচে। ভিতরে এসে একবার শেষ দেখবার জন্যে ডাক্তারের হাতে পায়ে কত কাকুতি মিনতি!

ডাক্তার হুকুম দিলে না। অপর রোগীদের শান্তির ব্যাঘাত হ'বে।

ডাক্তারদের কি মা-বউ নেই!

খানিক পরেই ওর আত্মীয়রা এসে বেড খালি করে ওকে নিয়ে গেল।

জলও পেলে না এক ফোঁটা!

চোখের সামনে এমনি কঠিন করুণ মরণ কখনো দেখি নি। এমনি করেই আমারও চোখের পাতায় একদিন চির-নিবিড় হিম-ঘুম নেমে আসবে। কিন্তু কোনো জননীর মমতার অশ্রু, কোনো পতিব্রতার অন্তরের উচ্ছ্বাস আমার মরণকে সিক্ত করবে না।

সে এক নির্বান্ধব ভীষণ মৃত্যু—অনুকম্পাহীন। ভাবতে ভয় হয়।

এত বড় এই দুনিয়া—এত ঘর দ্বার, এত লোক—অথচ তার একখানিও আমার আপনার নয়, ওর একখানিতেও আপনার বলতে আমার কেউ নেই! তাই, মরণের পর যখন এরা আমায় টেনে গাদায় ফেলবে—তখন কেউ এক ফোঁটা চোখের জল বা একটু ছোট্ট দীর্ঘশ্বাসও ফেলবে না।

সন্ধ্যের সময় দেখি—পাশের বেড্ আবার ভর্ত্তি। নতুন রুগী। ঝাড়বার, মারবার নতুন আয়োজন উদ্যোগ।

মৃত্যুর সতীর্থ হয়ে পড়ে থাকা অসহ্য হয়ে উঠ্‌চে।

রাত্রে ডিউটিতে এসে বিয়াট্রিস চমকে উঠল ; ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলে, বুড়াবাবু মরে গেল ?···কখন্ ?

...উঃ, জল দেয় নি এরা একটুও ?

ওর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ে। ওর কালকের রাতের প্রশ্ন মনে পড়ে, মরুভূমি কি মেঘের স্বপ্ন দেখে না ?

জবাবও পাই।

মনে হয়, অনন্ত অশ্রুর রাশ জ্বলে' শুকিয়ে অন্তহীন মরুর জন্ম দিয়েচে।

এ ওয়ার্ডের শেষের বেডটিতে ছোট্ট একটি ফুটফুটে ছেলে পড়ে ঘুমুচ্ছে। কাল সন্ধ্যার সময় এসেছে ছেলেটি। চলন্ত একটা মোটর কাল ওর দুরন্ত পা দুটিকে অবশ করে দিয়ে গেছে।

বিয়াট্রিস আমার টেম্পারেচার নিলে, পাল্‌স ও দেখলে। ওর মুখখানি হঠাৎ শুকনো হয়ে গেল ! চার্টের ওপর কলম যেন আর চলে না।

জিগ্‌গেস করলুম, ভয়ের কিছু দেখলে বুঝি ?

ও বললে, না, কিছু নয়।

হেসে জিগগেস করলুম, তা হ'লে বাঁচবো, ঠিক ?

বিয়াট্রিস তাড়াতাড়ি আমার মুখ চেপে ধরে বললে, এত দুষ্টু কেন তুমি ?

বললাম, কেউ কখনো শাসন করে নি যে, তাই।

ওর মুখের হাসিকে ছাপিয়ে চোখের জল ঝরে পড়ে।

বলি, এ জীবনের মেয়াদ ফুরুলো বিয়াট্রিস—

ও বলল, আমি নার্স। বিয়াট্রিস নই। নাম ধরে চেঁচিয়ো না, সকলে শুনবে।···তার পর বললে, মিথ্যে মন ভারি করো না, মরা কি সহজ !

বললাম, বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য্য বিয়াট্রিস, মরাটাই মানুষের সবচেয়ে বড় সত্যি। আমায় ঠকিয়ে কি কর্ব্বে ? ধরে রাখতে ত পারবে না !

ওর চোখের কোলে আবার জল এসে পড়চে। হয় ত বেশী দেরী নেই আর !

খানিক পরে ওকে বললাম, বসো পাশটিতে।

ও বসলে বলি, আমার অন্যায় উপদ্রবে রাগ করো না বিয়াটিস। আমি বড় দুঃখী, বড় একা—

ওও বল্লে, আমিও একা—এ পৃথিবীতে। তোমার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই।

কেন, আমি কি ?

কি আবার !—ব'লে ও মুখ নীচু করলে। ওর চোখের পাতা তখনো অশ্রুসরস।

খানিক চুপচাপ বসে ও চলে যায়। অনাবশ্যক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রুগীদের টেম্পারেচার নেওয়া শুরু করে।

বাঁচতে ইচ্ছে করে !

আপনার অন্তরের দিকে চেয়ে শিউরে উঠি ! সেখানে দেখি, এক বিশীর্ণ ভুখারী বসে বসে চোখের জল ফেলচে।

এ জীবনে সে উপবাসী রয়ে গেল ! বর্ষা-বেলার সন্ধ্যার মেঘ এখনো আমায় আকুল করে তোলে, আজও নারীর মৌন দৃষ্টিতে আমি লক্ষযুগের কাব্য খুঁজে পাই।

তবু যেতে হ'বে। পাওনা মিটিয়ে পাবার আগেই দুনিয়ার দেনা আমার চুকিয়ে যেতে হ'বে।

রাত একটা পার হয়ে গেছে—অনেকক্ষণ। দূরের আলোগুলোকে মনে হচ্চে—অতৃপ্ত বিগত আত্মাদের অভুক্ত কাতর দৃষ্টি।

নিঃশ্বাসটা কেমন অসরল ঠেক্‌চে।—রাত্রি বুঝি ঘনিয়ে এল !

বিয়াট্রিস ঘুরে বেড়াচ্চে।

হঠাৎ ও থমকে দাঁড়াল—সেই ফুটফুটে ছোট্ট ছেলেটির পাশে। চোখে ওর নিরুদ্ধ স্নেহের অপরূপ কাতরতা !

ও ঝুঁকে পড়ল ছেলেটির বিছানার ওপর—

তারপর ওর ঘুমন্ত মুখখানির ওপর নিবিড় মমতায় আপনার মুখখানি চেপে ধরলে।

পাছে ও লজ্জা পায়, তাই পাশ ফিরে শুলুম।

মস্ত অপরাধীর মত বিয়াট্রিস ঘরের মধ্যে ছট্‌ফট্ করে বেড়াচ্চে। এ-ধার থেকে ও-ধার।

কালকের সবুজ চিঠিখানি ও বার করে দেখ্‌ছে—চলা আর থামে না!

হাতছানি দিয়ে ডাকলুম ওকে, কথা কইতে কষ্ট হচ্চে।

ও ভয়ে ভয়ে এসে শিয়রে দাঁড়াল।

হাসবার চেষ্টা করে বললাম, তোমার চুরি দেখে ফেলেচি বিয়াট্রিস!—তুমি ভারি লোভী!

ও জিগ্‌গেস করলে, কেন? কিসে?

তুমি চুমু-চোর।

বিয়াট্রিস বললে, ওমনি ছোট্ট ছিল আমাদের জ্যাকী,—ছোট ভাইটি আমাদের। ঐটুকু বেলায় ছেড়ে এসেচি তাকে।—কাল ওর চিঠি পেয়েচি—দশবৎসর পরে। দিদিকে ওর মনে পড়েচে!

চিঠিখানি বার করে ও আস্তে আস্তে চুমু দিলে। চিঠি নয় ত' যেন ফুল—চাপ লাগলে ভেঙ্গে যাবে!

এমনি মমতা ওটুকুর প্রতি!

ওর হাত দু'খানি ধরে বললুম, আজ রাত্রেই আমার শেষ,—বেশ বুঝতে পারচি। তোমার এই দু'দিনের বন্ধুকে বিদায় দাও! কখনো কখনো তাকে মনে করো, তার কথা ভেবো। এত বড় এ পৃথিবীতে তার জন্যে ভাববার আর কেউ নেই!

ও কোনো কথা বলে না। পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে শুধু।

আবার বলি, সে সময়টা কাছে কাছে থেকো। আমার মৃত্যুপুরীর বান্ধবী, বেলা শেষের আলো!

কঠিন কণ্ঠে বিয়াট্রিস বল্লে, ছিঃ, কি কচ্চো? তোমার কি হয়েচে আজ?…শুধু শুধু,—

শেষ মুহূর্ত্তে ও আমায় ফাঁকি দিতে চায়! ধরা ও দেবে না কিছুতেই!

বললাম, তোমার হাসপাতালের রীতি রাখ বিয়াট্রিস। নার্সের খোলস ছুঁড়ে ফেলো। সত্যি ক'রে শুনিয়ে দাও আর কতক্ষণ!

বিদ্যুতের রেখার মত ওর শুভ্র দেহখানি কেঁপে উঠ্‌ল! ও কিছু বলতে পারলে না।

কে জানে আরো কত দেরী!

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম বোধ হয় –

তন্দ্রা ভাঙ্গতে বুঝলুম, বিয়াট্রিস আমার হাতখানি ওর মুখের কাছ থেকে নামিয়ে বালিশের ওপর রেখে দিলে।

তখনো চোখ খুলি নি।

ও আমার পায়ের তলার, ও বুকের উত্তাপ নিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল!

চোখ মেলে দেখলুম, রাত্রির আঁধার যবনিকার ওপর ভোরের আলো গলে পড়চে।

বিয়াট্রিস চলে গেল;—ডিউটি শেষ হয়ে গেছে। সারাদিন আর ওর দেখা মিলবে না।

বিকেলের দিকে যন্ত্রণা আর উপসর্গ হঠাৎ একযোগে বেড়ে উঠ্‌ল—যেন পরামর্শ ক'রে। কতবার কত রকমে ফুঁড়লে এরা আমায়!… বাঁচাতে চায়!

সন্ধ্যার মুখে সায়েব এসে হাউস-সার্জ্জনের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর রায় দিয়ে গেল, একশ' বিয়াল্লিশের রুগী আর তিন ঘণ্টার বেশী নয়।

কাল আবার নতুন রুগী আসবে,—নতুন এক্সপেরিমেণ্ট চলবে মানুষের জীবন নিয়ে। মনে হ'ল সেই আনন্দে ওদের মুখখানি উজ্জ্বল। আমার দরকার ফুরিয়েচে। আমার আসন্ন-মৃত্যুর ব্যথা ওদের পাষাণ মনকে ছুঁতেও পারে নি!

শয়তানের শাস্ত্র!

কষ্ট হচ্চে না এতটুকু!

আমার বিশীর্ণ হাতের গায় দুটি ভীরু ঠোঁটের কাঁপা পরশ শিউরে শিউরে উঠ্‌চে!

—একটি চুম্বনেই ও আমার সমস্ত ব্যথা নিঃশেষে শুষে নিয়েচে!

এখুনি দেখা হবে ওর সঙ্গে।

ডাক্তারের রায় শুনে ও কি করবে?

হয় ত ওর দেখা পাবার আশাতেই এখনো মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে চলেচি।

রাত ক্রমশ বাড়্‌চে!

বিয়াট্রিস এখনো আসে নি!

ও দিকে দেখচি নতুন নার্স এসেচে একজন!

ও কি আসবে না আজ?

তবে—?

ওয়ার্ড-কুলীকে ডেকে জিগ্‌গেস করলুম, বিয়াট্রিস-মেম আসবে না আজ?

কুলী বললে, না বাবু, উনকো আজ কাল ছুটী আছে দু'দিন

ওর উত্তরে মরণ যেন অনেকখানি এগিয়ে এল!

তার পায়ের চলা নিজের ভাঙা বুকে বেশ অনুভব করচি!

বিয়াট্রিস! বিয়াট্রিস!

এখানকার নিয়মের পরদা ছিঁড়ে আমার ডাক কি ওর কাছে গিয়ে পৌছুবে?

ডাক যদিও পৌছায়, পর্দ্দা তবু অটুটই থাকবে! অপ্রয়োজনে প্রবেশ যে নিষিদ্ধ।

দেখা হল না বিয়াট্রিস,—দেখা হ'ল না।

শীর্ণ ডান হাতটা নিজের হিম ঠোঁটের ওপর চেপে ধরলাম!—

আমার বুভুক্ষু বাসনার প্রথম ও শেষ মরণ।

আরও কতক্ষণ কে জানে?

এক একটা সেকেণ্ডের ওপর যেন যুগের বোঝা চাপানো। চলতে আর চায় না!

আরও দুটো দিন এই জীর্ণ জীবনের বোঝা টেনে নিয়ে যেতে পারলে ওর দেখা মেলে!

কিন্তু দেরী বোধ হয় অত আর নেই!

দুটো দিন পরে ঘরে ঢুকে ও দেখবে—একশো বিয়াল্লিশের বেড খালি।

কিম্বা নতুন লোকে ভরতি!

ওর পা দুটো থরথর করচে, ওর চোখে জল?

ও কাঁদচে—আমারই জন্যে?

রুদ্ধ ঘর

শ্রীঅজিতকুমার দত্ত

আমার রুদ্ধ-ঘরের প্রতিটি দ্বারের পিছনে আজি
নৃত্য-পাগল ঝঙ্কার রোল ওঠে গর্জ্জনে বাজি'।
দৃঢ়-গবাক্ষ কেঁপে কেঁপে ওঠে নিষ্ঠুর নিপীড়নে,
বন্ধ-দুয়ারে বাধা পেয়ে ঝড় কাঁদে ক্রূর নিঃস্বনে,—
আমার কক্ষে তবু
উন্মাদ ঝড় খুন্-মদ্ ল'য়ে পশিতে পাবে না কভু।

শান্তি পিয়াসী নর—
গৃহ হ'তে নির্ব্বাসিত করেছি উৎশৃঙ্খল ঝড়;
ইঁটের উপর ইঁট গেঁথে মোরা রচেছি শান্তি-কারা,
আকাশের দেশে বন্দী করেছি ঝড়ের ঝাপট-ঝাড়া।
গগনের লোহু ছাতের ছাতায় আড়াল করিয়া রাখি,
আখার ধুঁয়ায় মেচুর করেছি তৃষ্ণা আতুর আঁখি।
ঝড়ের দোলনে বেপমান তরু মেলে' যে আলিঙ্গন
তার বাহুপাশে দেয়নাকো ধরা আমাদের ভীরু মন।
তীক্ষ্ণ তুফানে তীব্র-তাড়নে তৃণ যবে নু'য়ে পড়ে
তার ছায়াপাত হয় না মোদের বাঁধানো ভিটার ঘরে,—
আমাদের দৃঢ় গেহে
ঝঞ্ঝা-পাগল ভাঙে না আগল রুদ্র-নিঠুর স্নেহে।

যাযাবর যত পাখীর ছিন্ন-পালক পন্থহারা
তাদের ছন্দে নাচে না মোদের বন্দিনী আঁখিতারা।

শাখার শিখরে শিখী নটরাজ-পবনের সনে নাচে,
দ্বার খুলে মোরা হাতে তালি দিয়া যাই না তাহার কাছে।
জল নিতে গিয়া ঝড়ে যে রাখালী হারায়েছে পথরেখা,
তাহার নয়নে আকুল শঙ্কা মোরা দেখি নাই লেখা।
মাঠে যে দামাল রাখাল ছেলের কালো কুন্তল ওড়ে
ঝটিকার সাথে তার কোলাকুলি পড়ে নাই আঁখি 'পরে।
মোদের জগতে ভাই,
প্রলয়-প্রয়াসী অতিথি ঝড়ের কোনো উদ্দেশ নাই।

মীনকেতন

ন্যুট হামস্থন

অনুবাদক—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নিদাঘ রাত্রি, ঘুমন্ত জল,—আর অনন্ত কালের জন্য সুষুপ্ত অরণ্য। কোনো কোলাহল নেই,—রাস্তা থেকে কোনো পদশব্দ আসে না,—আমার হৃদয় যেন মদিরায় ভরা।

রাঁধা মাছের গন্ধ পেয়ে রাতের পোকারা আওয়াজ করতে করতে আমার জান্‌লা দিয়ে আসে, উনুনের আগুনে লুব্ধ হয়ে। ছাতের গায়ে ধাক্কা খায়, আমার কানের কাছ দিয়ে বোঁ করে' ঘুরে যায়,—আমার বুক কেঁপে ওঠে,—তারপর দেয়ালের শাদা বারুদদানের ওপর বসে। ওদের দেখি ওরাও কাঁপে আর আমার দিকে তাকায়। কারু কারু পাখা ফুলের মতো দেখায়।

কুটীরের বাইরে আসি, শুনি। কিছু নেই, একটি রা-ও নেই,—সব ঘুমিয়েছে। উড়ন্ত পোকায় বাতাস ছেয়ে গেছে। বনের ধারে ছোট ছোট ফুল ফুটেছে—ঐ ছোট ফুলগুলিকে ভালোবাসি। যে কয়েকটি ফুলন্ত মাঠ দেখলাম তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,—ওরা যেন আমার পথের ধারের টুকটুকে রাঙা গোলাপ, ওদের প্রতি ভালোবাসায় আমার চোখে জল আসে।

রাতে হঠাৎ শাদা ফুল ওদের হৃদয় খুলে দিয়েছে, ওরা নিঃশ্বাস ফেল্‌ছে। লোমশ ধূসর পোকারা ওদের পাপড়িতে মুখ গোঁজে,—ছোট গাছটা কাঁপে। আমি এক ফুল থেকে আরেক ফুলে যাই,—ওরা সব মাতাল, কামাতুর,—কি করে' ওদের নেশা জমে তাই দেখি।

লঘু পদপাত, মানুষের নিঃশ্বাস নেওয়ার হাল্কা শব্দ, আনন্দিত "শুভ সন্ধ্যা"।

আর আমিও উত্তর দিই,—রাস্তার ওপর নুয়ে পড়ি, দুটি হাঁটু আর একটি জীর্ণ জামা জড়িয়ে ধরি।

"শুভ সন্ধ্যা, এড্‌ভার্ডা!" আবার বলি। আনন্দে আমি শ্রান্ত হয়ে পড়েছি।

"তুমি আমাকে এত স্নেহ কর।" ও আস্তে বলে ফিস্‌ফিস্ ক'রে।

আর আমি বলি—"তুমি যদি জানতে তোমার কাছে আমি কি কৃতজ্ঞ! আমার বুকের মধ্যে আমার হৃদয় সারাদিন স্তব্ধ হয়ে থাকে, যখন ভাবি—তুমি আমার, এই ধূলার পৃথিবীতে তুমি সব চেয়ে সুন্দর, তোমাকে আমি চুম্বন করেছি। আমি তোমাকে চুম্বন করেছি এই কথা যখন ভাবি, মাঝে মাঝে আনন্দে আমি অবশ আত্মহারা হই।"

"আজ্‌কে সন্ধ্যায় তুমি আমাকে কেন এত আদর করছ?" ও শুধোয়।

তার ঢের কারণ আছে; ও বুঝুক যে আমি আদর করছি ওকে—এই টুকুই শুধু বুঝ্‌তে চাই। বাঁকানো ভুরুর অন্তরাল থেকে ওর সেই চাউনি,—আর ওই গায়ের চামড়া,—উজ্জ্বল, উগ্র।

"আদর করব না তোমাকে?" বলি। "তুমি সুস্থ আর সবল এই কথা ভাবি, আর আমার পথের প্রত্যেকটি গাছকে অভিবাদন করি। একবার এক নাচে একটি তরুণী মেয়ে প্রত্যেকটি নাচের পর নিরালায় বসে জিরোচ্ছিল, আমি ওকে চিন্‌তামও না, কিন্তু ওর মুখখানি আমার হৃদয় স্পর্শ কর্‌ল,—আমি ওকে নমস্কার কর্‌লাম। তারপর? না, না, ও শুধু মাথা নাড়্‌ল। 'আমার সঙ্গে নাচবে?'—ওকে জিগ্‌গেস কর্‌লাম। ও বল্লে—'তুমি ভাবতে পার এ কথা? আমার বাবা সুন্দর কান্তিমান পুরুষ, মা সেরা সুন্দরী,—আমার বাবা ঝড়ের মতো তাঁকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। আর আমি খোঁড়া—জন্ম থেকেই।'

এড্‌ভার্ডা আমার দিকে তাকাল।

'এস বসি।' বল্লে।

বুনো মাঠটায় দু'জনে বস্‌লাম।

'আমার বন্ধু তোমার বিষয় আমাকে কি বলে জান?' ও বলতে সুরু কর্‌ল,—"তোমার চোখ নাকি জানোয়ারের মতো। মেয়েটি বলে—যখন তুমি ওর দিকে তাকাও, ওকে পাগল করে' দাও নাকি। তুমি যেন ওকে স্পর্শ করছ,—ও বলে।'

শুনে অপূর্ব্ব সুখে চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লাম, আমার জন্য নয়, এড্‌ভার্ডার। ভাব্‌লাম, পৃথিবীতে ত' মাত্র একজনকে ভালোবাসি, আমার চোখ দেখে সে কি বলে? বল্লাম—'কে সে তোমার বন্ধু?'

'তা বল্‌ব না।' ও বল্লে,—সে দিন দ্বীপে যারা গিয়েছিল তাদেরই একজন।'

'তা হলে ত' বেশ।'

তারপর আর সব বিষয়ে কথা হোল।

'বাবা দু' একদিনের মধ্যেই রাশিয়ায় যাচ্ছেন।' ও বল্লে—'আমি একটা পার্টি দিচ্ছি। তুমি কখনো কোরহোলমার্ন-এ গেছে? এবার কিন্তু আমাদের দুই ধামা মদ চাই, মাঠ থেকে সেই মেয়েরাও আস্‌ছেন, বাবা আমাকে এর মধ্যে মদ দিয়েও দিয়েছেন। বল, সত্যি করে বল, তুমি সেই বন্ধু-মেয়েটির দিকে ফিরেও চাইবে না? সত্যিই চেয়ো না কিন্তু লক্ষ্মীটি। তা হলে ওকে কখনো নিমন্ত্রণ করব না।'

আর কোনো কথা না বলে' ও আমার গলার ওপর নিজেকে নিবিড় আবেগে সমর্পণ করলে, আমার মুখের দিকে অপলক চোখে চেয়ে রইল,—জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। ওর দৃষ্টি যেন ঘোর অন্ধকার।

আচমকা উঠে পড়লাম, তাড়াতাড়ি বল্লাম—'তোমার বাবা তা হ'লে রাশিয়ায় যাচ্ছেন?'

'তুমি ও রকম করে' হঠাৎ উঠে পড়লে কেন!'

'দেরি হয়ে গেছে এড্‌ভার্ডা।' বল্লাম—'শাদা ফুলগুলি বুজছে, সূর্য্য উঠছে, দেখতে পাচ্ছ না এখুনি ভোর হয়ে যাবে।'

বনের মধ্য দিয়ে ওকে নিয়ে এগোলাম। যদ্দূর চোখ যায় ওকে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম, অনেক দূর গিয়ে ও পেছন ফিরে অতি ধীরে শুভরাত্রি জানালে। তারপর হারিয়ে গেল। তক্ষুণি কামারের বাড়ীর দরজা খুলে গেল, শাদা-

সার্ট-পরা একটি লোক বেরিয়ে এল, চারিদিক চাইতে লাগ্‌ল, টুপিটা কপালের ওপর আরো একটু টেনে দিল—তারপর সিরিল্যাণ্ড-এর পথ ধরে পাড়ি দিল।

এডভার্ডার শুভরাত্রি এখনো আমার কানে লেগে আছে।

চৌদ্দ

মানুষ আনন্দে মাতাল হয়ে যেতে পারে। গুলি ছুঁড়ি, পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি জাগে—সে-ধ্বনি ভোলা যায় না,—সমুদ্রের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায়, কোনো ঘুমন্ত মাঝির কানে বেজে ওঠে হয় ত। কি জন্যই বা আনন্দ করব? কি কথা যেন মনে হয়,—ক্ষণিকের স্মৃতি, বনের একটি অস্ফুট শব্দ, একটি মেয়ে। ওর কথা ভাবি, চোখ বুজে রাস্তার ওপর দাঁড়াই, মুহূর্ত্ত গুণি।

পিপাসা পায়, ঝর্‌না থেকে জল খাই। ইচ্ছে হ'লে সাম্‌নের দিকে একশো পা হাঁটি, পেছনের দিকেও; নিশ্চয় এতক্ষণে আসবার সময় ফুরিয়ে গেছে, মনে মনে বলি।

কোনো বিপদ হয় নি ত? এক মাস কেটে গেছে—একমাস আর কিই বা সময়—না, কোনো বিপদ হয় নি। ঈশ্বর জানেন এই মাসটা ভারি স্বল্পায়ু। কিন্তু রাত্রি ভারি দীর্ঘ, যতক্ষণ ওর আশায় পথ চেয়ে থাকি, টুপিটা ঝর্‌নার জলে ভিজিয়ে খালি শুকোই,—এই সময় কাটার জন্য।

রাত দিয়ে সময়ের হিসাব কষি। কোনো কোনো রাতে এড্‌ভার্ডা আসত না, একবার একসঙ্গে দু'রাত ও দেখা দেয় নি। দু' রাত। না, কোনো বিপদ হয় নি ওর। কিন্তু তখুনি মনে হল আমার সুখ চরম চূড়ায় পৌঁছেছে।

তাই কি নয়?

"এড্‌ভার্ডা, শুন্‌তে পাচ্ছ, আজকের বন কি রকম চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে? তৃণে আগাছায় কি অবিশ্রান্ত কোলাহল, বড় বড় পাতাগুলি কাঁপ্‌ছে। কি যেন চেঁচাচ্ছে, হবে, থাক্ সে কথা। ওপ:র, পাহাড়ে একটা পাখীর আওয়াজ শুন্‌ছি,—ওখানে বনে দু'রাত ধ'রে ও আলাপ করছে। তুমি সেই, সেই পুরোনো চেনা আওয়াজ শুন্‌তে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি। কেন জিগ্‌গেস করছ এ কথা?'

'এম্‌নি। দু'রাত ধ'রে ও ওখানে—শুধু এইটুকু। আজ যে এসেছ তার জন্য ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে। এখানে ব'সে আজ সন্ধ্যায় তোমার প্রতীক্ষা করছিলাম, হয় ত বা কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্তও কর্‌তাম,—যতক্ষণে তুমি আসবে।'

'আমিও তোমার জন্য প্রতীক্ষা ক'রে আছি। খালি তোমার কথা ভাবি।—সেই যে গ্লাশটা উল্টে ভেঙে দিয়েছিলে,—মনে আছে? তার সেই ভাঙা টুক্‌রোগুলি আমি যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছি। বাবা কাল রাতে চলে গেলেন। আমি আসতে পারি নি, জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা নিয়ে মহা হাঙ্গামা,—সব জিনিষ গুছিয়ে মনে করিয়ে দিতে হচ্ছিল তাঁকে। আমি জান্‌তাম তুমি এই বনে আমার প্রতীক্ষায় ব'সে আছ,—জিনিষপত্র বাঁধছি, আর কাঁদছি।'

কিন্তু দুটো রাত,—নিজের মনেই ভাব্‌লাম। প্রথম রাতে কি করছিল ও? ওর চোখের কোণে খুশীর ছোপ আগের চেয়ে কম কেন?

একঘণ্টা কাটল। পাহাড়ের সেই পাখীটা চুপ করে' গেছে, বন যেন মরে' আছে। না, না, কিছুই বদলায় নি, সবই যে-কে-সে। শুভরাত্রি জানাতে ও ওর হাতখানি বাড়িয়ে দিল, স্নেহে আমার দিকে তাকাল।

'কাল? কেমন?' বল্লাম।

"না। কাল হবে না।" বল্লে।

কেন নয়, জিগ্‌গেস কর্‌লাম না।

'কাল আমাদের পার্টি।' হেসে ও বল্লে। 'তোমাকে অবাক ক'রে দেব ভাব্‌ছিলাম, কিন্তু তুমি এম্‌নি মন-মরা হয়ে আছ যে, ব'লে ফেল্লাম। তোমাকে কাগজে লিখে নিমন্ত্রণ পাঠাব ভেবেছিলাম।

আমার মন একেবারে হাল্কা হয়ে গেল।

ও চলে গেল ঘাড় নেড়ে বিদায় জানিয়ে।

"আরেক কথা।" যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকেই বল্লাম,—'সেই যে গ্লাশের ভাঙা টুকরোগুলি গুছিয়ে রেখেছিলে—কতদিন হ'ল?'

'কেন? এক হপ্তা আগে, দিন পনেরো আগে হয় ত। হাঁ দিন পনেরো আগেই।

কেন এ কথা জিগ্‌গেস করছ? যাঃ, সত্যি কথা বল্‌ছি তোমাকে,—কাল।

কাল! কালও ও আমার কথা ভেবেছে। সব আবার ঠিক হ'য়ে গেল।

পনেরো

নৌকো দুটো তৈরীই ছিল, সবাই চেপে বস্‌লাম। হল্লা আর গান। দ্বীপ ছাড়িয়ে কোরহোলমার্ন,—দাঁড় বেয়ে যেতে অনেকক্ষণ কেটে গেল, পথে এক নৌকো থেকে আরেক নৌকোয় তেম্‌নি গল্পগুজব করছি। মেয়েদের মতো ডাক্তারও পাৎলা পোষাক পড়েছে, এর আগে ওকে এত খুশী কোন দিন দেখি নি। চুপ করে কিছুই শুন্‌ছে না, সবারই সঙ্গে খালি কথা কইছে। বোধ হয় বেশ একটু টেনেছে, তাই আজ ও এত দিলখোলা। পারে যখন ভিড়্‌লাম, ও সবাইর মনোযোগ আকর্ষণ করে' হঠাৎ আমাদের সবাইকে অভ্যর্থনা কর্‌লে। বুঝ্‌লাম, এড্‌ভার্ডা ওকে আজ অতিথি-সংকারের ভার দিয়েছে।

খুব বিনয়ের সঙ্গেই ও মেয়েদের আনন্দবর্দ্ধন করতে লাগ্‌ল। এড্‌ভার্ডার কাছে ও ত নেহাৎই নম্র ও স্নেহশীল,—বাপের মতো; আগের মতোই বিদ্যা ফলিয়ে উপদেশ দিচ্ছে। এড্‌ভার্ডা হয় ত কোনো তারিখের কথা উল্লেখ করে' বল্‌ছে, 'আমি আটত্রিশ সালে জন্মেছি,।' ও জিগ্‌গেস কর্‌লে, 'আঠারো শো আটত্রিশ নিশ্চয়?' যদি এড্‌ভার্ডা উত্তর দেয়, 'না, উনিশ শো' আটত্রিশ'। ও একটুও না ভড়্‌কে' ওকে শুদ্ধ করে দেবার জন্যই যেন বল্‌লে, 'তোমার ভুল হয়েছে।' আমি যদি কিছু বলি, ও বিনয়ে মনযোগ দিয়েই শোনে, আমাকে অবহেলা করে না।

একটি মেয়ে এসে আমাকে অভিবাদন কর্‌লে। আমার মনে নেই ওকে, আর কোনদিন দেখিও নি; অবাক হ'য়ে দু'একটা কথা বল্লাম, ও হাস্‌ল। 'ডিন্'-এর মেয়ে হয় ত। যেদিন দ্বীপে বেড়াতে এসেছিলাম, দেখেছিলাম ওকে, আমার কুঁড়েতে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। কিছুক্ষণ দু'জনে আলাপও হয়েছিল।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। ভালো লাগ্‌ছিল না কিছুই, মদ খেলাম, সবাইর সঙ্গে মিশে কলরব সুরু কর্‌লাম। আবার দু'একটা ভুল করে ফেলেছি, ছোটখাটো ভদ্রতা বিনিময়ে বাঁধা বুলি আওড়াতে পারি না। বাজে বকি, কখনো বা মুখে কথাই জুয়ায় না,—ভারী বিশ্রী লাগে।

পাহাড়ের টিলাটা আমাদের টেবিল, ডাক্তার ধারে বসে' ভঙ্গী করে' বল্‌ছে—আত্মা? আত্মা কি? 'ডিন্'-এর মেয়ে ওকে নাস্তিক বল্‌ছিল,—বাঃ, মানুষ বুঝি স্বাধীন ভাবে চিন্তা কর্‌বে না? লোকে ভাবে নরক বুঝি মাটির তলার কুঠুরী, শয়তান বুঝি সেখানকার অতিথি-সেবক, সেখানকার রাজা। তারপর ও গির্জ্জার খ্রীষ্টের মূর্ত্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করলে,—ধারে পাশে নাকি কয়েকটি য়িহুদি ও য়িহুদি মেয়েও আছে,—মদের মধ্যে জল, —বেশ, বলুক ওর যা খুশী। কিন্তু যীশুর মাথার চারদিকে আলোকমণ্ডল। আলোকমণ্ডল কাকে বলে? তিনটে চুলের সঙ্গে একটা হল্‌দে রঙের খেল্‌না-চাকা লাগিয়ে দেওয়া।

দু'টি মহিলা দারুণ বিস্মিত হয়ে ওর হাত আঁকড়ে রইল, কিন্তু ডাক্তার ছাড়িয়ে নিয়ে ঠাট্টার সুরে ব'লে চল্‌ল—"খুব ভয়ঙ্কর শোনাচ্ছে, না? মানি। কিন্তু যদি এই কথাই বার সাত আট নিজেদের মনে আওড়ান ও একটু পরে ভাবেন এ কথা, ত' শিগ্‌গিরই সব সোজা হয়ে যাবে।... আপনাদের স্বাস্থ্য কামনা করি!"

এই বলে' ও সেই দু'টি মেয়ের পায়ের কাছেই ঘাসের ওপর নতজানু হয়ে, মাথাটা পেছনের দিকে নুইয়ে গ্লাসটা শেষ ক'রে ফেল্লে, টুপিটা কিন্তু মাথার থেকে নামিয়ে সামনে রেখে দিল না। ওর ব্যবহারের এই স্বচ্ছন্দতা দেখে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম; ওর সঙ্গেই নিজে মদ খেতাম, কিন্তু ওর গ্লাস একদম ফাঁকা হয়ে গেছে।

এড্‌ভার্ডা দুটি চোখে খালি ওকেই দেখে বেড়াচ্ছে। ওর সামনে এসে দাঁড়ালাম, বল্লাম—'এক্কি' খেলব আজ?"

ও একটু চম্‌কাল। উঠে দাঁড়াল।

"তুমি" বলে এখন আর ডেকো না। সাবধান!" আস্তে বল্লে।

আমি ত' এখন ওকে মোটেই 'তুমি' বলে ডাকি নি। চলে গেলাম।

আর এক ঘণ্টা ফুরোল। দিন যেন ক্রমেই লম্বা হচ্ছে, —আর একটা নৌকো থাকলে আমি কখন্ একাই দাঁড় বেয়ে বাড়ী চলে যেতাম,—কুঁড়েতে ঈশপ বাঁধা রয়েছে, আমারই কথা ভাবছে হয় ত। এড্‌ভার্ডার ভাবনা এখন আমার থেকে অনেক দূরে, নিশ্চয়ই; বেড়াতে কি মজা, ও এখন সেই কথাই বল্‌ছে, বিভুঁই দেখে বেড়াতে কত সুখ! এ কথা ভাব্‌তেই ওর গাল রাঙা হয়ে উঠ্‌ছে,—কথার মধ্যে হোঁচট্ খেয়ে পড়্‌ছে পর্য্যন্ত।

"সেইদিন আমার চেয়ে অধিকতর বেশি সুখী কেউ হয় নি..."

"অধিকতর বেশি সুখী...?" ডাক্তার বল্লে।

"কি?"

"অধিকতর বেশি সুখী।"

"বুঝ্‌তে পারছি না।" ও বল্লে।

"তুমি বল্লে কি না, অধিকতর বেশি সুখী, তাই।"

"বলেছি নাকি? ভুল হয়ে গেছে। সেইদিন জাহাজে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছিলাম আমার চেয়ে অধিকতর সুখী কেউ নেই। যা নিজে জানি না, দেখি নি, সে সব জায়গার জন্যই মন কাঁদে।"

ও দূরে চলে' যেতে চাইছে, ও আমার কথা ভাবছে না। ঐখানে দাঁড়িয়ে ওর মুখে যেন পড়তে পেলাম, ও আমাকে ভুলে গেছে। না, কিছুই বলবার নেই এতে,—কিন্তু ঐখানে দাঁড়িয়ে ওর মুখে সেই লেখাটাই পড়লাম। মুহূর্ত্তগুলি কি ভীষণ আস্তেই যে চলেছে। এখুনি আমরা ফির্‌ব কি না কতলোককে জিগ্‌গেস করলাম। ভীষণ দেরী হয়ে যাচ্ছে যে, ঈশপকে কুঁড়েতে একলা বেঁধে রেখে এসেছি;— কত লোককে বল্লাম, কেউই ফিরে যেতে চায় না।

'ডিন্'-এর মেয়ের কাছে ফের গেলাম,—তৃতীয়বার। মনে হ'ল ওই বলে' থাক্‌বে যে আমার চোখ ঠিক জানোয়ারের মতো! দু'জনে একত্র মদ খেলাম,—ওর চঞ্চল চোখ, কখনো জিরোয় না, খালি আমার দিকে তাকায়, আবার চোখ ফিরিয়ে নেয়।

বল্লাম—"আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় এদেশের লোকেরা এই গ্রীষ্মের মতোই স্বল্লায়ু? মানে, তাদের হৃদয়-ব্যাপারে? সুন্দর, কিন্তু ক্ষণিক।"

কথাটা জোরে বল্লাম, খুব জোরে,—উদ্দেশ্য ছিল। জোরেই বলে চল্লাম, জিগ্‌গেস করলাম তরুণী মেয়েটি দয়া করে' আমার কুটীর দেখতে আস্‌বেন কি না। বেদনায় বলে ফেল্লাম—"ঈশ্বর আপনার ভালো করুন।" নিজের মনে ভাবছিলাম ও যদি আসে, তবে কেমন করে ওকে কি উপহার দেব? বারুদদান ছাড়া ওকে দেবার ত' আমার কিছুই নেই।

ও আস্‌বে বল্লে।

এডভার্ডা মুখ ফিরিয়ে বসে' আছে, আমাকে যা খুশী তাই বলতে দিচ্ছে। অন্য লোকে যা যা বলছে তাই শুন্‌ছে; মাঝে মাঝে দু একটা কথাও বলছে। ডাক্তার তরুণী মেয়েদের হাত দেখে ভাগ্য গুণছে,—বক্‌ছে ঢের! ওরও হাত দু'খানি ছোট, পাৎলা,—আঙুলে একটি আংটি। আমাকে কেউই চায় না, একটা পাথরের ওপর একা চুপচাপ ব'সে আছি। সন্ধ্যাও কাবার হয়ে এল। এইখানে আমি একেবারে একা—নিজের মনে বলি—পাথরের ওপর ব'সে আছি, আর যে লোকটিই খালি আমাকে চঞ্চল ক'রে দিতে পারে, সে আমাকে এম্‌নি স্তব্ধ নিঃসম্বল ক'রে বসিয়ে রেখেছে। বেশ, ওর মতো আমিও কিছু গ্রাহ্য করি না আর।

আমি নির্ব্বাসিত, নিরালা। আমরা পেছনে ব'সে ওরা কথা কইছে শুনতে পাচ্ছি, এড্‌ভার্ডা কেমন হাস্‌ছে তাও শুন্‌ছি;—চট ক'রে উঠে প'ড়ে তক্ষুণি পার্টিতে যোগ দিলাম। যেন ক্ষেপে গেছি।

"এক মিনিট।" বল্লাম,—"ওখানে ব'সে ব'সে মনে হ'ল আপনাদের কাউকে আমার মাছির খাতাটা দেখানো হয় নি।" মাছির খাতাটা বের করলাম। "এ কথাটা যে কেন আগে মনে হয় নি, তার জন্য আমার সত্যিই দুঃখ

হচ্ছে। দেখুন। আপনারা দেখলে আমি খুব খুশী হব, সবাই দেখুন, - লাল আর হলদে মাছি দুইই আছে।" ব'লে টুপি তুল্লাম। টুপি তোলাটা অন্যায় হ'ল বুঝলাম, তাই তাড়াতাড়ি ফের মাথায় রাখলাম।

এক মুহূর্ত্তের জন্য গাঢ় নীরবত'—কেউই খাতাটা দেখতে চাইল না। শেষকালে ডাক্তারই হাত বাড়িয়ে নম্রস্বরে বল্লে,—"অশেষ ধন্যবাদ। দেখি। মাছিগুলি কি ক'রে কাগজে জুড়ে রাখা হয়েছে, দেখবার জিনিষ বটে, আশ্চর্য্য!"

ওর প্রতি ধন্যবাদে আমার মন ভ'রে গেল। বল্লাম,—"ওগুলো আমি নিজেই বানাই।" কি ক'রে কি হ'ল তাই ওকে তখুনি বোঝাতে লাগলাম। খুব সোজা,—পালক আর হুক্‌গুলি আমিই কিনেছি,—খুব ভালো তৈরী হয় নি,—আমারই নিজের ব্যবহারের জন্য কি না। দোকানে তৈরী মাছি কিনতে পাওয়া যায়,—সুন্দর জিনিষ।

এড্‌ভার্ডা আমাকে একবার একটি শিথিল চাউনি দিলে। ওর মেয়ে-বন্ধুদের সঙ্গে কথাই কইছে।

"এই যে কয়েকটি পালক।" ডাক্তার বল্লে,—"দেখ, ভারি সুন্দর কিন্তু।"

এড্‌ভার্ডা তাকাল।

"সবুজগুলি বেশী সুন্দর।" ও বল্লে,—"দেখি ডাক্তার।"

"ওগুলো তোমার কাছে রেখে দাও।" আবেগে বল্লাম, —"হাঁ রেখে দাও, আমি বল্‌ছি। দুটো সবুজ পালক। আমাকে এই দয়াটুকু কর, আমার স্মৃতিচিহ্ন।"

ও ওদু'টির দিকে তাকাল, বল্লে,—"রোদ্দুরে ধর্‌লে সবুজ আর সোনালি এক সঙ্গে। আমাকে যদি দাও, তা হলে ধন্যবাদ তোমাকে..."

"আনন্দের সঙ্গে।" বল্লাম।

ও পালক দুটি নিলে।

খানিক বাদে ডাক্তার ধন্যবাদের সঙ্গে খাতাটা আমাকে ফিরিয়ে দিলে। উঠে পড়ে জিগ্‌গেস কর্‌লে—এখন ফিরে যাবার সময় হয়েছে কি না।

বল্লাম,—"হাঁ, সত্যিই হয়েছে। ঘরে আমার কুকুর বাঁধা আছে—আমার দেরী [illegible] ভাবছে কি না, ওই আমার বন্ধু। ও ওখানে বসে' আমার কথা ভাবে, আর যখন ফিরে যাই, ও জান্‌লার ওপর ওর সাম্‌নের থাবা দুটো বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করে। চমৎকার দিন গেল আজ,—এখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, এবার যাই চলুন। আপনাদের সবাইর কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।"

পারে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম এড্‌ভার্ডা কোন্ নৌকোটায় গিয়ে ওঠে,—আমি অন্য নৌকোটায় উঠ্‌ব, ঠিক কর্‌লাম। হঠাৎ ও আমাকে ডাক্‌লে। বিস্ময়ে ওর দিকে তাকালাম, ওর মুখ রাঙা। আমার কাছে এসে ওর হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে স্নেহে বল্লে—"পালক দুটির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি আমার সঙ্গে এক নৌকায় আস্‌বে না?"

"তোমার ইচ্ছা।"

নৌকোয় ও আমার পাশেই বস্‌ল, ওর হাঁটু আমারটা স্পর্শ কর্‌ছে। ওর দিকে তাকালাম, তাই ওও আমার দিকে তাকাল—একটি মুহূর্ত্তের জন্য। ওর হাঁটু দিয়ে ও আমাকে স্পর্শ করছে,—এ ওর দয়া। এই তেতো দিনটা হঠাৎ যেন মিঠা হয়ে উঠ্‌ল এখন, আবার খুশী লাগ্‌ছে। কিন্তু হঠাৎ ও জায়গা বদ্‌লে আমার দিকে পিছন ফিরে বসে' দাঁড়ের কাছে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বল্‌তে সুরু কর্‌লো। প্রায় মিনিট পনেরো আমি ওর কাছে মরে' রইলাম।

তারপর এমন একটা জিনিষ ক'রে ফেল্লাম যার জন্য আজো অনুতাপ হচ্ছে,—আজো ভুলি নি। ওর জুতো খুলে গেল; আমি ওটা তুলে নিয়ে দূরে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম,—ও আমার কাছে বসে' আছে এই আনন্দেই হয় ত, হয় ত বা আমিও যে ওর কাছেই আছি, বেঁচে আছি—সে সম্বন্ধে ওকে সচেতন করে' দিতে। এত তাড়াতাড়ি ঘটে' গেল ব্যাপারটা,—কিছু ভাব্‌লাম না পর্য্যন্ত, ঝোঁকের মাথায় করে' ফেল্লাম। মেয়েরা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, আমি যেন পক্ষাহতের মতো পঙ্গু হয়ে গেছি, কিন্তু কি হবে? যা হ'বার তা ত' হয়েই গেছে। ডাক্তার আমাকে বাঁচালে, বল্লে—"দাঁড় টানুন।"

[illegible] দিকে [illegible] সেই

মুহূর্ত্তেই মাঝি জুতোটা ধরে' ফেল্লে—জল খেয়ে এখুনিই ডুবে যাচ্ছিল ওটা। মাঝির হাতটা কণুই পর্য্যন্ত ভিজা। তারপর অনেকের মুখ থেকেই তুমুল আনন্দধ্বনি উঠ্‌ল—জুতোটা বেঁচেছে।

আমার দারুণ লজ্জা করতে লাগ্‌ল, আমার মুখ শাদা হয়ে গেছে,—রুমাল দিয়ে জুতোটা মুছে দিলাম। একটিও কথা কইল না এড্‌ভার্ডা। নিল। পরে বল্লে—"এ রকম আর কখনো দেখি নি।"

"দেখ নি?" বল্লাম। বলে' হাস্‌লাম, এম্‌নি ভাণ কর্‌লাম যেন কোনো বিশেষ কারণেই এই ঠাট্টাটা করে' ফেলেছি। কিন্তু কিই বা কারণ? ডাক্তার ঘৃণায় আমার দিকে তাকাল—এই প্রথম।

আরো একটু সময় কাট্‌ল—বাড়ীর মুখে নৌকো ভেসে চলেছে,—ধীরে ধীরে এই ব্যাপারের বিসদৃশতাটা মুছে গেল; আমরা গান গাইলাম,—ডাঙা এসে গেছে।

এড্‌ভার্ডা বল্লে,—"মদ এখনো ফুরোয় নি, ঢের পড়ে' আছে। আমাদের আরেকটি পার্টি দিতে হবে, নতুন পার্টি একটা,—নাচ হবে, একটা প্রকাণ্ড ঘরে নাচ।"

পারে নেমে এড্‌ভার্ডার কাছে মাপ চাইলাম।

"তুমি যদি জান্‌তে কুঁড়েতে ফিরে আস্‌বার জন্য আমার কি দারুণ ব্যাকুলতা হচ্ছিল!"

বল্লাম—"এ দিনটা বড্ড বড়, ভারি দুঃখের।"

"খুব দুঃখের লেফ্‌টেনেণ্ট্?"

"মানে, নিজের ও অন্যের কাছে কি বিসদৃশ হয়েই দেখা দিলাম।" কথাটা ঘুরিয়ে বল্লাম—"তোমার জুতো জলে ফেলে দিলাম পর্য্যন্ত।"

"হাঁ, এ একটা অসাধারণ ব্যাপার।"

"তোমার ক্ষমা চাই।"

—ক্রমশ

এস

শ্রীবিমলা দেবী

কোথা তুমি, কোথা আমি, কি অনন্ত দীর্ঘ ব্যবধান!
বার বার ফিরে চাই,—বুক ভরা বিফল সন্ধান।
এঁকে দিয়ে গেলে মোর জীবনের পাতায় পাতায়
কি অতৃপ্তি, কি আকাঙ্ক্ষা! শুধু ক্লান্তি শুধু বেদনায়
ভরে দিয়ে গেলে মোর জীবনের দীর্ঘ দিনগুলি.
কোথা তুমি কোথা তুমি ক্লান্ত প্রাণ উঠে যে আকুলি।
কোল ভরে পাই নি যে বুক ভরে পাই নি পরশ;
তোমার মধুর কণ্ঠে গৃহে মোর জাগে নি হরষ,
অসম্পূর্ণ সকলি যে, অতৃপ্ত যে জীবন আমার
এলে আর চলে গেলে দিয়ে গেলে বেদনার ভার।
অতীতে ফিরিয়া চাই, কখন কি আসিবে না ফিরে
অনন্ত সাধনা মোর, ছোট দুটি বাহু ডোরে ঘিরে
লবে নাকি কণ্ঠ মোর, কখন কি ডাকিবে না আর
সব ব্যথা ভুলাইয়া শিশু-কণ্ঠে 'মাগো মা আমার!'
তোমার সে মুখখানি তোমার সে নাহি-বলা কথা
বুক ভরে জাগাইছে তৃপ্তিহীন চির-আকুলতা!
ফিরে এস ফিরে এস, বুকে ফিরে এস আরবার
পিয়াসী জীবন মোর, ডাক তুমি 'মাগো' মা আমার!'

পল্লী-গীতি

শ্রীচিত্তরঞ্জন আচার্য্য

পূর্ব্ববঙ্গের কৃষকও নাবিক-কণ্ঠে তথাকার নিরক্ষর বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত গ্রাম্য-কবিগণের রচিত নানাবিধ গান শুনিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ গানগুলি 'ভাটিয়াল-সুর' অবলম্বন করিয়া রচিত। গ্রাম্য-কবিগণ তাঁহাদের প্রাণের সরল কবিত্বমাখা ভাবগুলি এত সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহা বর্ণনাতীত। সাধারণতঃ নৌকা যখন 'ভাটি চলিতে থাকে, তখন এই সকল গানগুলি গীত হয় বলিয়া গানের সুরের 'ভাটিয়াল-রাগিণী' নামকরণ হইয়াছে।

আমরা নিম্নে অজ্ঞাত গ্রাম্য-কবির রচিত একটি 'ভাটিয়াল-গান' প্রকাশ করিলাম। গানটি প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে জনৈক মুসলমান নাবিকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, সংস্কৃত-সাহিত্যে মেঘ হংস প্রভৃতিকে যেরূপ দৌত্যে বরণ করিবার কথা লিখিত আছে, সেইরূপ নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে গ্রাম্য-কবি তাঁহার নায়িকার দ্বারা 'বাঐ' অর্থাৎ বাবুই পক্ষীকে দূতরূপে বরণ করিয়াছেন।

(ভাটিয়াল সুর)

ও বাঐ রে, ওরে ঝাঁকে ওড়, ঝাঁকে রে পড়\
তারে বল সাড়া,\
কইও মোর বঁধুয়ার আগে বাঐ\
পিরীতি জানুমারা। (রে বাঐ)\
(কি জঞ্জাল করুলি বনের বাঐ রে।)

ও বাঐ রে, ওরে নলের আগে নলফুল,\
বাঁশের আগে টিয়া,\
কইও মোর বঁধুয়ার আগে বাঐ,\
না যেন্ করে বিয়া। (রে বাঐ)\
(কি জঞ্জাল করুলি বনের বাঐ রে।)

ও বাঐ রে, ওরে যখন করিলাম প্রেম,\
বাঐ তুমি আমি জানি,\
ওরে এখন কেন সে সব কথা বাঐ\
লোকের মুখে শুনি রে,—\
(কি জঞ্জাল করুলি বনের বাঐ রে।)

ও বাঐ রে, যখন করিলাম প্রেম\
বাঐ শানবাঁধা ঘাটে,\
ঐ যে আকাশের চন্দ্র যেমুন\
তুইলা দিলা হাতে। (রে বাঐ)\
(কি জঞ্জাল করুলি বনের বাঐ রে।)

ও বাঐ রে, হায় রে ওপারে বুনিলাম ধান\
বাঐ, টিয়ায় কাইটা খাইল,\
ঐ যে কইও মোর বঁধুয়ার আগে\
যৌবন বইয়া গেল রে,—\
(কি জঞ্জাল করুলি বনের বাঐ রে।)

ও বাঐ রে, ও পারে কদমের গাছ বাঐ\
বায়ে হালে আগা,\
ওরে শিশুকালে কইরা প্রেম বাঐ\
যৌবনকালে দাগা। (রে বাঐ)

যাদুঘর

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(৮)

কেশবের বাড়ী থেকে ঘুরে এসেই দ্বিজেন দেখলে, ক্ষিতীশ এসে তার বৈঠকখানায় বসে চা খাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলে—কিরে ক্ষিতীশ, তুই কতক্ষণ এসেছিস্ ?

—আর ভাই, সন্ধ্যে থেকেই এসে বসে আছি, তুমি যে এ সময় বাড়ী থাক না তা' কে জানে ?

—সন্ধ্যের সময় আর কোন্ ভদ্রলোক বাড়ীতে বসে থাকে বলো ? এই তো, তোমাকে যারা খুঁজতে যাবে তারা কি পাবে ?

—তা যা বলেছো, সন্ধ্যেটা বাড়ীতে ব'সে থাকবার পক্ষে একেবারেই উপযুক্ত সময় বলে মনে হয় না—

সেটা মনে হয় শুধু নিজের বাড়ীতে। অন্য বাড়ীতে—যেখানে একটা আড্ডা জমে—সেখানে সন্ধ্যেটা কিন্তু বেশ উপভোগ্য ! তা যাক্, তুই যখন এসে পড়েছিস একটা গান শোনা ! চা দিলে কে তোকে ?

—কেন ? বাড়ীর ভিতর থেকে ! আমাকে চাইতেও হয় নি ! এসে বস্‌বার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চা' পান সিগারেট সব এসে হাজির ! আমি যে একটি 'চাতাল' সেটা তোমার বাড়ীর সবাই জানে কি না !

কেশবের আড্ডা ছেড়ে আজ এখানে পদার্পণ হ'ল কেন শুনি ? আবার কোনও মামলা মোকদ্দমায় ফেঁসে পড়ো নি ত ?

—আরে, না না, ওই নীলাম্বরবাবু বড্ড ধরেছেন ভাই, তাই আস্‌তে হ'লো, ওঁর মেয়েটিকে তুমি একবার দেখে আসবে চলো।

—আজ কাল কি ঘটকালিও সুরু করছো ? শুধু গান গেয়ে বুঝি আর সংসার চলছে না ?

—এটা আমি এ্যামেচার প্রফেশন্ হিসাবে মাঝে মাঝে করি ! Social Service কি না, তাই পয়সা নিই নে—honorary worker. এটা আমার Voluntary কাজ।

—বেশ ! বেশ ; এরকম Social Service-এ কিছু না হ'ক অন্ততঃ গরদের জোড় আর রূপোর ঘড়া মারে কে ?—তা সে মেয়েটিকে তুমি দেখেছ ?

—নিশ্চয় ! চমৎকার মেয়ে ! বছর উনিশ বয়স—

—এঃ নেহাৎ ছেলেমানুষ যে !

—ওহে, না হে না, একবার দেখেই আস্‌বে চল না, মেয়েটি আমাদেরই যোগ্য হয়ে উঠেছে ! খুব বাড়ন্ত গড়ন, দেখলে পঁচিশ বছরের মেয়ে বলে মনে হয়। তোমার সঙ্গে ঠিক ম্যাচ্ করবে !

—কি করে জানলে ?

—বিলক্ষণ ! লেখাপড়া গানবাজনা সবেতেই বেশ তৈরী মেয়ে ! যেমনটি তুমি খুজছ,—তা ছাড়া ঠিক তোমারই মত রং তোমারই মতো দেখতে, বেশ লম্বা-চওড়া healthy মেয়ে !—

—তোমার কি ধারণা দেহের দিক দিয়ে মিললেই

মনের দিক দিয়েও ম্যাচ্ করবে ক্ষিতীশ? স্বভাব চরিত্র প্রকৃতি ও জীবন-যাত্রার অভ্যাস তো পরস্পরের বিভিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই থাকৃতে পারে। তা ছাড়া তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, আমার একবার বিবাহ হয়েছিল—আমার একটি সন্তান রয়েছে! আমাকে চট্ ক'রে ভালবাস্তে পারা অন্য মেয়ের পক্ষে একটু কঠিন।

—আরে রেখে দাও তোমার ভালবাসা। কিছুদিন এক সঙ্গে ঘর করতে করতে ও ঠিক এসে যায় চাঁদ! জন্ম এস্তক কত দেখলুম—

—হ্যাঁ, তা হ'য়ে দাঁড়ায় বটে, কিন্তু সে উনিশ বছরের মেয়ের নয়, ন' বছরের মেয়ের।

—তুমি দেখছি বিলেত ঘুরে এসেও বাল্যবিবাহের কুসংস্কার ছাড়িয়ে উঠতে পারো নি।

—যে ভাবে ওটা এদেশে প্রচলিত হয়েছিল তাকে কিছুতেই কুসংস্কার বলা চলে না ক্ষিতীশ। ছোট্ট মেয়েটি বধূ হ'য়ে গিয়ে শ্বশুর্ শাশুড়ীর কাছেই একরকম প্রায় মানুষ হ'তো, কাজে কাজেই স্বামীর বংশের প্রকৃতি ও পরিবারের প্রচলিত ধারা বা পদ্ধতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার তারা বেশ সুযোগ পেতো, সেই জন্য সে কালের বিবাহ এখনকার মতো এমন অসুখের ব্যাপার হ'য়ে উঠতে পারতো না।

—এখনকার বিবাহ যে সব অসুখের ব্যাপার হ'য়ে উঠ্ছে তার প্রধান কারণ বয়স নয় হে, অর্থ! অর্থই সব অনর্থের মূল।

—সে কথা ঠিক, অর্থাভাবের চাপে বাল্য-বিবাহ দ্রুত অদৃশ্য হ'য়ে আস্ছে এ দেশে!—এখন এখানে যে সব বিবাহ হচ্ছে তা আর তেরো বছরের বালকের সঙ্গে আট বছরের শিশুকন্যার নয়। পঁচিশ তিরিশ বছরের যুবকের সঙ্গে আঠারো উনিশ বৎসরের তরুণীর মিলন, কিন্তু এ বিবাহ যদি আজও অভিভাবকদের খেয়ালের উপরই নির্ভর করে, তাহ'লে যারা বিবাহের পাত্র-পাত্রী তারা পরস্পরের মনের মতো হ'তে না পারলে শুধু অভিভাবকদেরই অভিসম্পাত দিয়ে শান্তি পায় না, তাদের চির-জীবনটাই অসুখী হয়ে পড়ে।—

—পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে দেখে শুনে চিনে ও পছন্দ ক'রে বিবাহ করলেই যদি সুখী হ'তে পারতো দ্বিজেন, তাহ'লে তোমার য়ুরোপে এত বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রাচুর্য্য কেন?—

—সেটা তো জীবনের লক্ষণ! এদেশে সেটা নেই ব'লেই তো জাতটা মরে রয়েছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহের সুযোগ যদি এ দেশের মেয়েদের থাকতো তাহ'লে আমার বিশ্বাস এখানেও বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রাচুর্য্য দেখতে পেতে!

—তুমি দেখছি তাহ'লে এ দেশটাকে বিলেত ক'রে তুলতে চাও।

—ঠিক্ তা নয় ক্ষিতীশ, আমি চাই অন্যায়ের সমস্ত বন্ধন থেকে এ দেশটাকে মুক্ত দেখতে।—

—অর্থাৎ, তুমি চাও আমাদের মধ্যে একটা উচ্ছৃঙ্খলতা আন্তে?

—যদি শৃঙ্খল-মোচনের জন্য উচ্ছৃঙ্খল হওয়াটাই প্রয়োজন হয়, তাহ'লে আমি সেটাকেও দোষের বলে মনে করি নে। কিন্তু, বন্ধন-মুক্ত হ'লেই যে আমরা উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠ্বো এ রকম আশঙ্কা হবার কারণ কি তোমার?

—চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি স্ত্রী-স্বাধীনতা যে যে সমাজে প্রচলিত আছে ব্যভিচার তাদের মধ্যে তত বেশী।

—আর আমরা স্ত্রীলোকদের অবরোধে আবদ্ধ করে রেখেছি বলে আমাদের মধ্যে বুঝি ব্যভিচার মোটেই নেই?

—আছে, কিন্তু সে খুব কম। একেবারে নগণ্য বললেই হয়!

—এটা তোমার মস্ত একটা ভুল ধারণা ক্ষিতীশ! আমাদের সমাজের ব্যভিচারগুলো আমরা চাপা দিয়ে ঢেকে রেখে দিই বলে সেটা বাইরে প্রকাশ হ'তে না পেয়ে আজ আমাদের ভিতরটাকে শুদ্ধ পচিয়ে অন্তঃসারশূন্য করে তুলেছে। যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সত্যকার প্রেমের বন্ধন নেই সেখানে বিবাহ-বন্ধনের জোরে তাদের একত্র বাস ক'রতে বাধ্য করে তুমি কি মনে করো আমরা সমাজের

কল্যাণ করছি? সে রকম মিলনে উৎপন্ন যে সব সন্তান তারা কখনও মানুষ হিসাবে বড় হ'তে পারে না। আমার মতো অধিকাংশ স্বামীরই স্ত্রী তাদের মনের মতো নয়। এবং অধিকাংশ স্ত্রীও তাদের স্বামীকে সহ্য করতে পারে না, কিন্তু বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করবার উপায় নেই বলেই সেই অমনোনীত পতি-পত্নীর কোনও রকমে তাদের অভিশপ্ত দাম্পত্য জীবনটা একসঙ্গে কাটিয়ে দিচ্ছে। স্বামীর দলের মধ্যে যারা তা পারে না তারা হয় প্রথম স্ত্রী থাকতেই আর একটা বিবাহ করছে, নয়—তাকে গ্রহণ করছে না। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা এ সম্বন্ধে একেবারে নিরুপায়। বিধির বিধানের জোরে আদালতে এর কোনও প্রতিকার থাকলে আমাদের সমাজের এই সব শোচনীয় ইতিহাস আজ জনসাধারণের অবিদিত থাকতো না।

—এ সব তোমার কল্পনার দৌড় দাদা! নেহাৎ বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছে। বিয়ে করে আবার অসুখী হয় কে? তুমি কি বলতে চাও যে, হাজার হাজার বছর ধ'রে আমাদের সমাজটা এই অসুবিধার ভিতর দিয়েই তার অসাড় অস্তিত্বটাকে বজায় রেখে এসেছে?

—এই তুমি আবার একটা ভুল ব'লছ ক্ষিতীশ! হাজার হাজার বছর ধরে এ সমাজটা একই রকম ভাবে চলে আসে নি। কালের প্রয়োজন মত বারে বারেই এর সংস্কার হয়েছে, পরিবর্ত্তন হয়েছে, অদল বদল হয়েছে—তবে এ টিকেছে। আমাদের সমাজের অতীত ইতিহাস পর্য্যালোচনা ক'রে দেখলে দেখতে পাবে যে, বৈদিক যুগে এর যে অবস্থা ছিল, পৌরাণিক যুগে তা বদলে গিয়েছিল। আবার মনু ও স্মার্ত্ত যুগে তার পুনঃ পরিবর্ত্তন ঘটেছে। কিন্তু তারপর আবার বহু শতাব্দী অতীতের কোলে মিলিয়ে গেছে, দেশের রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-ব্যবস্থা এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, আমাদের সামাজিক জীবন আর সে প্রাচীন শাস্ত্রীয় বিধির মধ্যে নিজেদের জাতীয় কল্যাণ খুঁজে পাচ্ছে না। বর্ত্তমান যুগ প্রতিদিন চাইছে কালোপযোগী পরিবর্ত্তন, কিন্তু আমরা আজ এমনিই অধঃপতিত ও দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছি যে, অসহায় অনাথ বালক যেমন করে তার মায়ের প্রাণহীন শব দেহটাকে জোর ক'রে আঁকড়ে ধরে থাকে, কিছুতে তাই সেটাকে দাহ করবার জন্য ছেড়ে দিতে চায় না—তেমনি করেই সেকালের বিধি-ব্যবস্থাগুলো যা এ কালের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী হ'য়ে পড়েছে, তবু আমরা তাই আঁকড়ে ধ'রে পড়ে আছি। কিছুতেই সেগুলো ছাড়তে চাইছি নি! তাই এ যুগের ঋষিরা, যেমন—রামমোহন, বিদ্যাসাগর এঁরা, তাঁদের যুগোপযোগী নব-বেদবিধি প্রণয়ন ক'রেও তা' প্রবর্ত্তন ক'রতে পারলেন না। হতভাগ্য জাত মরবার জন্য যেন একেবারে বদ্ধপরিকর হয়েছে!

—তা যদি বলো, তাহ'লে সে জন্যে দায়ী আমরা নই,—আমাদের রাজ-শক্তি! কোনও নূতন পরিবর্ত্তনই কোনও দেশে কখনও জনসাধারণে ফস্ ক'রে মেনে নিতে চায় না, যদি রাষ্ট্রবল না তার পশ্চাতে চোখ রাঙিয়ে এসে দাঁড়ায়।

—এসো, হাতে হাত দাও, এ কথা তোমার জজে মানে—ক্ষিতীশ!

ব'লতে ব'লতে দ্বিজেন ক্ষিতীশের ডান হাতটা নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে খুব জোরে ঘন ঘন করমর্দ্দন করতে লাগল।

—উহুহুঃ ছাড়' ছাড়'—লাগে! লাগে!—

বলতে বলতে ক্ষিতীশ তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তাহ'লে নীলাম্বরবাবুকে কি বলবো? তাঁর মেয়েটিকে দেখতে যাবে না?

—জানো তো সবই, তবু কেন বার বার ওকথা জিজ্ঞাসা করছো? বাপ-মা'র খেয়াল মতো তাঁদের মনোনীত পাত্রীটিকে পিতামাতার অবাধ্য না হ'য়ে বিবাহ ক'রে কী অসুখীই আমি হ'য়েছিলুম! ভগবান করুণাপরবশ হ'য়ে মাধুরীকে তাঁর শান্তিময় ক্রোড়ে টেনে নিয়ে আজ আমার অনাদর অবহেলা থেকে তাকে জন্মের মতো অব্যাহতি দিয়েছেন। বিবাহের সাধ আমার একরকম মিটে গেছে ক্ষিতীশ। এখন ওই ছেলেটাকে কোনও রকমে মানুষ ক'রে তুলতে পারলেই সংসারের কাছে আমার সমস্ত দায়িত্ব চুকিয়ে দিয়ে আমি একটু নিশ্চিন্ত অবসর নিতে পাবো।

—তা' সে ভাব্‌না তো একরকম চুকিয়েই ব'সে

আছো। ছেলেটির তো শুনলুম একটি খাসা 'গভর্ণেস্' পেয়েছো! সে নাকি মায়ের মতোই আদর যত্নে তোমার মণিকে মানুষ করছে?

—সেকথা অস্বীকার করলে অকৃতজ্ঞ হ'তে হবে!

—বটে! তাহ'লে কথাটা মিছে নয়! তা দেখো, ভাই, সাবধান! কৃতজ্ঞতা জিনিষটা খুব ভাল বটে, কিন্তু তাই থেকে যদি আবার সহানুভূতি জাগে, তাহ'লে প্রেমে পড়তে বেশী দিন লাগবে না! শুনিছি তোমার ছেলের অভিভাবিকাটির নাম নাকি রাণী। তিনি নাকি নিরাশ্রয়া একটি তরুণী বিধবা!

—সেকথা ঠিকই শুনেছো, কিন্তু শোন নি বোধ হয় যে, সে একটি অশিক্ষিতা পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, সে হয় ত' সংসার চালাতে পারে কিন্তু জীবন সঙ্গিনী হবার' যোগ্যতা তার এতটুকুও নেই। তার উপর সে আবার সমাজ পরিত্যক্তা!

—সে কি! সমাজ পরিত্যক্তা মানে?—

—মানে, কিছুদিন পূর্ব্বে মুসলমানেরা তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারপর দিনই তিনি কোনও রকমে তাদের কবল থেকে পালিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু এসেই দেখলেন যে, সেই চব্বিশঘণ্টার মধ্যেই তাঁর জাতের ঘরের ও বাইরের সমস্ত দরজায় তাঁর প্রবেশ রুদ্ধ হ'য়ে গেছে! হিন্দুধর্ম্মের ত্রিশূল অঙ্কিত রক্ত পতাকা উড়িয়ে সনাতনীরা মেয়েটিকে সমাজের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

—তুমি একে পেলে কোথা?

—পরাণবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন। জানো তো দেশের জন্য তিনি সর্ব্বস্ব পণ করে খাটছেন। এ মেয়েটিকে তিনিই কুড়িয়ে এনেছিলেন। আমি ছেলেটার জন্য একজন 'গভর্ণেস্' খুঁজছি শুনে তিনি এসে আমাকে বলেন। আমি তাঁরই অনুরোধে একে আশ্রয় দিয়েছি।

—আশ্রয় দিয়েছি বোলো না, সে যখন তোমার ছেলে, মানুষ ক'রছে তখন সে তো এখানে থাকবার অধিকার নিজে অর্জ্জন ক'রে নিয়েছে। এতো তোমার দয়া বা অনুগ্রহ নয়!

—ভুলে যাচ্ছ' ক্ষিতীশ, যে, তোমাদের দেশে সমাজ-বর্জ্জিতা মেয়ের বারাঙ্গনাবৃত্তি ছাড়া আর সমস্ত দ্বারই বন্ধ!

—তা, তোমার এখানে এসেই বা সে কোন্ গোঁসাই ঠাকুরুণ হ'য়েছে? ছেলের ঝি বই ত নয়, তোমারও পরিচর্য্যা যে তাকে ক'রতে হয় না এমন ত' বোধ হয় না! মাধুরীকে দেখতে পারতে না বটে, কিন্তু দু'বছর তো তাকে নিয়ে ঘর করেছ'—একটা স্ত্রী' থাকা তোমার কতকটা অভ্যাস হ'য়ে পড়েছে। তোমাদের স্বামী স্ত্রীতে ইদানিং দেখাসাক্ষাৎ বা কথাবার্ত্তা না থাকলেও, মাধুরী যে তোমাকে দূর থেকেই যত্ন করতো সে তো আমরা দেখে গেছি।

—হ্যাঁ, সেটা সে কর্ত্তব্য হিসেবেই ক'রতো। বলতো অমনি কেন তোমার অন্ন মুখে দেবো; সেটা গতরে পুষিয়ে দেবো!

এই সময় বেহারা খলে মাড়া কবিরাজী ঔষধ, একগ্লাশ জল এবং তারই মুখে ঢাকা ছোট্ট একখানি রিকাবিতে গুটি কতক লবঙ্গ এনে দাঁড়াল।

দ্বিজেন আশ্চর্য্য হয়ে বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করলে—ইয়ে কৌন্ ভেজা?

—মায়ীজি অন্দরসে ভেজা।

দ্বিজেন একটু চমকে উঠ্ল। বেয়ারার হাত থেকে জলের গ্লাশ ও ঔষধের খলটি নিয়ে তাকে বিদায় দিলে। ক্ষিতীশ হেসে উঠে বললে—এই যে, এই ক'মাসের মধ্যেই তিনি একেবারে 'মায়িজী' হ'য়ে উঠেছেন দেখছি তাহ'লে আছো বেশ, কি বলো?

দ্বিজেন একটু লজ্জিতভাবে হেসে বললে—দূর্ হতভাগা!—ও বেটা নূতন বেয়ারা, জানে না, মনে করেছে রাণুই বুঝি বাড়ীর গিন্নী!

—হুঁ! আবার 'রাণী' থেকে 'রাণু' হয়েছে দেখ্‌ছি; লক্ষণ বড় ভাল ব'লে তো আমার বোধ হচ্ছে না! এ কবিরাজী ওষুধ খাওয়া হচ্ছে কিসের জন্য? তুমি তো কবিরাজীতে বিশ্বাস করতে না!

—হ্যাঁ, খোকার চিকিৎসা দেখে বিশ্বাস হয়েছে! খোকাকে যে কবিরাজ মশাই বাঁচিয়েছেন, তিনি এখনও প্রায়ই মাঝে মাঝে দেখতে আসেন, কালও এসেছিলেন।

আমাকে বললেন—বাড়ীর মধ্যে শুনে এলুম, রাত্রে আপনার ভাল ঘুম হয় না, দেখি একবার হাতটা! হাত টিপে নাড়ী দেখে কবিরাজ মশাই বললেন—আমি গিয়ে ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। নিদ্রা না হ'লে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা আছে। নাড়ী বড় উত্তেজিত—বড় চঞ্চল। ওষুধটা আহারের পূর্ব্বে দুবেলা নিয়মিত মধু দিয়ে মেড়ে লবঙ্গের সঙ্গে সেবন করবেন।

—তাহ'লে তোমার আহারেরও সময় হয়েছে বলে বোঝা যাচ্ছে। আমি তাহলে চল্লুম—নীলাম্বরবাবুকে—

বাড়ীর ভিতর থেকে এই সময় ঠাকুর এসে বললে,—মা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের দুজনেরই জায়গা করবেন কি? দ্বিজেন কিছু বলবার আগেই ক্ষিতীশ ঠাকুরকে বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ—তাই করতে বলোগে! অনেকদিন একসঙ্গে খাওয়া হয় নি, কি বলো দ্বিজু? দ্বিজেন যেন একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল। বললে—মন্দ কি!

ক্ষিতীশ হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে—ঠাকুরটিও কি তোমার নতুন?

—না, ঠাকুরটা মাধুরীর আমলের পুরানো লোক। কিন্তু মুস্কিল ক'রেছে যে খোকা! ও সেই প্রথম দিন থেকেই রাণুকে পেয়ে একেবারে 'মা মা' ব'লে ঝাঁপিয়ে তার কোলে গিয়ে উঠেছে! রাণুও তাকে দিনরাত নিজের গলার হার ক'রে রেখেছে। খোকা রাণুকে 'মা' ব'লে ডাকে ব'লে ঝি-চাকর বামুনসইস কোচম্যান মায় মালী গয়লা ধোপা নাপতে সবাই একধার থেকে ওকে 'মা' ব'লতে সুরু ক'রেছে!

টুং টুং ক'রে ঘড়ীতে রাত্রি ন'টা বাজল।

ঠাকুর এসে বললে—আপনাদের খাবার দেওয়া হয়েছে!

ক্ষিতীশ উৎসাহিত হ'য়ে বললে—চলো তো দ্বিজু, খেয়ে আসিগে, আর পরাণ চাচার এই কুড়িয়ে পাওয়া পাড়াগেঁয়ে মেয়েটিকেও একবার দেখে আসিগে!

—সে আশা ত্যাগ ক'রেই খেতে চলো ক্ষিতীশ!

—কেন?

—রাণু কারুর সামনে আসে না।

—কেবল তুমি ছাড়া তো?

—না, আমাকেও সে আজ পর্য্যন্ত মুখ দেখায় নি। পরাণবাবুর সঙ্গে একগলা ঘোমটা দিয়ে সেই যে বাড়ীতে এসে ঢুকেছিল তারপর আর তার চুলের টিকিটিও দেখতে পাই নি

—কিন্তু এ বাড়ীতে তার অস্তিত্বটা প্রতিমুহূর্ত্তেই বেশ টের পাচ্ছ, না?

—সে তো নিজের চোখেই দেখলে, অস্বীকার করবো কেন?

—চলো খেয়ে আসিগে, ক্ষিধে পেয়েছে। আর পারি তো এই রাণীমা'র ঘোমটার আড়ালও ঘুচিয়ে দিয়ে আসিগে—

—তা পারো তো, আমার কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু কোনও রকমে এতটুকু অসম্ভ্রম যেন আমার খোকার মা'র না হয় সেইটি ভুলো না।

—ইস্! খোকার মা'র জন্যে যে বড্ড দরদ দেখছি! তবু খোকাকে তিনি পেটে ধরেন নি আর তুমি এখনও তাকে চোখে দেখ নি। চোখে দেখলে না জানি কি কাণ্ড করবে। হয় ত তাঁর শ্রীচরণে দাসখতই লিখে দিয়ে বসবে—

—আঃ! ক্ষেতা, তোর ও বদস্বভাব কি এখনও গেল না? যত সব বদ্‌রসিকতা! পঞ্চাশ বছর আগে ওসব আমাদের সমাজে চলতো বটে, এখন একেবারে অচল!

—আমি তো তোমাদের মতো একেবারে অতি-আধুনিক নই, আমার এ সাবেক চাল দাদা—বনেদী কাজ কারবার।

—আচ্ছা, এখন খাবি চল্, সে ঝগড়া পরে হ'বে।

এই বলতে বলতে ক্ষিতীশকে টেনে নিয়ে দ্বিজেন বাড়ীর ভিতর খেতে চলে গেল।

—ক্রমশ

বেদে

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মৈত্রেয়ী

য়ুনিভার্সিটিতে এসে গেলাম। ঠিক পড়তে কি?—না কোনো কাজ ছিল না ব'লে?

মনে হয় ওর সঙ্গে দেখা হবার যেন দারুণ দরকার ছিল। নিরালা কোণে লাষ্ট্ বেঞ্চিতে দেখা। যে মোটা বইটা নিবিষ্টমনে পড়ছে সেটা সাহিত্যিক জমাদারদের মতে নোংরা। আমার হাতের ওপর ওর শির-ওঠা শীর্ণ হাতখানি তুলে দিয়ে বল্লে—কত জ্বর আছে বলতে পারেন?

—ঐ বিতিকিচ্ছি বইটা পড়ার দরুণ হয় ত। চলুন বাইরে—

ওঁচা প্রোফেসার তার ওঁচানো গোঁফ ফুলিয়ে তাকায় একবার। মৈত্রেয়ীও তাকায় হয় ত। ঠিক তাকানো নয়, একটু যেন সজাগ হয়ে ওঠা। লাষ্ট্ বেঞ্চিটা গরীব, কাণা হয়ে গেছে।

আমরা বেরিয়ে যাই।

বলি—আপনাকে আমি দেখেছি আগে, ঠিক ভালো জায়গায় নয়।

সৌম্য একটু হাসে, বলে—অভিযোগ করছেন না নিশ্চয়ই। কেননা—

—কেন না আমিও সেই পাড়ারই বাসিন্দা। এত সস্তায় আর কোথাও ঘর পেলাম না বলে'।

—কি করে' চালান?

—আগে একজায়গায় টিউশনি করতাম,—সংস্কৃত। ইস্কুলের ছেলে। তিনমাস যায় মাইনে দেবার নাম নেই, —বলে পুজোটা এসে গেলেই পুরোদমে তিনমাসেরটাই পাওয়া যাবে। তাও যখন পেরিয়ে যাচ্ছে, তখন কোমরে কাপড় কেছে বসে' গেলাম ভুল শেখাতে। এতদিন ধরে' যা সব শিখিয়েছিলাম, সব বেমালুম বাতিল করে' আঠারো দিনে এইসা ভুল শিখিয়ে দিয়ে এসেছি ভাই, যে, বেচারা ছেলে ছ মাসেও তা ভুলতে পারবে না।—এখন একটা পানের দোকান খুলেছি। চলুন না আমার দোকানে। পান খা'ন?

—প্রচুর। শুধু খাই না, করিও।

পরে বলি, আস্তে—আগে মাঝি ছিলাম। একটা ডিঙি ছিল,—সোতের শ্যাওলা। ফুরফুরে ফড়িং।

সৌম্য হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে বল্লে—তার আগে?

—রাস্তা খুঁড়েছি, বস্তা টেনেছি, মোটরে মোটরে টক্কর লাগিয়েছি,—চাকরির উমেদার হয়ে পথে পথে জিরিয়ে

জিরিয়ে পায়চারি করেছি। একবার লাঙলও ধরেছিলাম বাগিয়ে।

—তবু পেলেন না ত' তাকে ?

—কাকে ?

—নোফালিস্-এর নীলফুল, বোয়ার-এর শ্বেতহংস। চলুন, পকেটে সাড়ে তিনটে টাকা আছে,—একটা বই কিনি গে। টাকা তিনের মধ্যে—রাতের খাওয়ায় জন্য গণ্ডা আষ্টেক্ না রাখ্‌লেই নয়। সমস্তদিনটা কিছু যায় নি পেটে।

কেমনতর যেন। সোজা চল্‌তে গিয়ে ডান পাশে হেলে, পায়ের চটিটা পেছনে ফেলে এসেছে, সাম্‌নে অনেক-দূর হেঁটে এসে তবে টের পায়, সোজা রাস্তায় না গিয়ে ঘুর্‌-পথে বেঁকে বেঁকে চলে,—কোথাও যেন যাবার নেই,—বুকের ওপর জামার সমস্তগুলি বোতাম খুলে রাখে।

চেনা দোকানদার। মুখ খুশী করে' বলে ওঠে—আজকের ডাকে এই বইটা এল। আপনার জন্য রেখে দিয়েছি—

প্রিয়ার লতানো পেলব হাতখানি যেমন করে' ছোঁয়, নামিয়ে রেখে দিতে ইচ্ছে করে না। দুঃখী যেমন মদের বোতলটা বুকের কাছে টেনে নেয়।—সৌম্যর দুই চোখ সুখে ফুলে' উঠ্‌ল।

পকেটটা উজার করে' ঢেলে দিয়ে বল্লে—বাকি দামটা দু এক দিনেই দিয়ে দেবার চেষ্টা করব। আজ আর নেই।

দোকানদার হয় ত একটু আপত্তি করে। আমি দিয়ে দিই বাকিটা।

সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে কোন্ পুরোনো চেনা বন্ধু যেন ওকে একটি চিঠি লিখে পাঠিয়েছে। তেপান্তরের মাঠের পারের কার যেন স্নেহস্পর্শ,—বহুদূরের কোন্ তুষারাবৃত আকাশের সুস্নিগ্ধ অভিবাদন! কার যেন করুণ একটি দীর্ঘশ্বাস,—ওর কাছে সহানুভূতি চায়,—অতি-দূর থেকে কে যেন ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

পথে নেমে বলি—রাত্রে কি খাবেন তা হ'লে ?

ও বলে—আজ রাত্রে বিধাতা যেমন অন্ধকারে তাঁর হৃদয় মেলে দেবেন তারার অক্ষরে, তেম্‌নি আমার এই বন্ধু তার হৃদয় মেলে ধর্‌বে আমার আতুর চোখের সমুখে। হয় ত বা আলো নিবিয়ে দেব। হয় ত বা আর পড়্‌তে পার্‌ব না। কিন্তু সমস্ত প্রাণে কি প্রগাঢ় উত্তাপ, কি আকুল পরিচয়, কি সুদূর ভালোবাসা। কত রাত আমার এম্‌নি কেটে গেছে।

আবার সেই চলা, এঁকে বেঁকে,—তের্‌ছা টিকটিকির মতো, পথের কুকুরকে অকারণে একটা লাথি মারে,—ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে কোনো দিকে লক্ষ্য না করে' ছুঁড়ে মারে, ইচ্ছে করে' জামাটা টেনে একটু ছিঁড়ে দেয়। আমাকে হঠাৎ বলে—তুমি ভারি দরাজ, দিল্‌দার। তুমি আমার এই খুশ্‌খতের পিওন। বলে' আমার কাঁধে ওর লিক্‌লিকে বাহুটি তুলে দেয়।

সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে। এ যেন ওর বিবাহ-গোধূলি। ওর হাতের সবুজ রঙের বইটি যেন ঐ সন্ধ্যাতারার মতই আপন, অপরূপ। এ ওর বই নয়, যেন বউ! সোনা-বউ!

আমার পানের দোকানে ওকে নিয়ে এলাম। পুত্‌লিকে বল্লাম—এক নতুন বাবু ধরে' এনেছি, দেখ্‌ এবার পছন্দ হচ্ছে ?

সেই পুত্‌লি,—একটা চোখ কাণা, আরেকটায় সেই আগেকার তন্দ্রালুতা। সেই চোখে অস্ফুট ভর্ৎসনা পুরে বল্লে—কলেজ ত' কখন কাবার হয়ে গেছে, এত দেরি হ'ল যে ? আমি কখন থেকে খাবার গুছিয়ে বসে' আছি।

বল্লাম—মাতব্বরের মতন বকিস্‌নি আর। দুটো থালায় করে' দিস্।

ছোট্ট পানের দোকান,—কলেজের সাম্‌নেই। কলেজ থেকে পাড়াটা অনেক দূর, তাই পুত্‌লি দুপুরে খাবার তৈরী করে' এনে দোকানে রেখে দেয়। গিলে নিয়ে ঢিলে মেজাজটা বেশ শরিফ্‌ করে' শহর সুরু করি,—এই বরাদ্দ।

ভুল করে' আমাদের গোঁফওলা প্রোফেসারটি—তাঁর ও পাড়ায় নিয়মিতই গতিবিধি আছে—পুত্‌লির দোরে টোকা মেরেছিল একদিন। ধুসো গোঁফ দেখে পুত্‌লি ওর হাসি

খ্যাংরাটা নিয়েই তেড়ে এসেছিল। প্রোফেসারকে একটা নমস্কার ঠুকে দিয়েছিলাম।

মাচার ওপর পুত্‌লি আমাদের জন্ম একটু জায়গা করে' দেয়। পা ঝুলিয়ে বসি দু'জনে। বল্লাম—সিংহাসনে বসে বেড়ে কার্‌বার করছিস বেশ। ক'জনের মুখ পুড়্‌লি?

থালাটা থেকে তুলে সৌম্য একটু খায় কি না খায়, নিবন্ত দিনের আলোয় বইটার ওপর বুক দিয়ে রয়েছে,—মাঝখানেটা খোলা, যেন বইয়ের হৃৎপিণ্ডের ওপর কান পেতে আছে।

বলি—তখন আমি রাজমিস্ত্রীর কাজ করি সৌম্য। বড়লোকের বড় ছেলে নতুন বিয়ে করেছে,—তাই তার প্রেমগুঞ্জনের জন্ম দোতলার ছাতে চিলে-কোঠা উঠবে। আমরা বাঁশ বেঁধে কাঁধে বালি-সুরকির ঝুড়ি নিয়ে প্রায় একুশজন লেগে গেছি। যে দরজা দিয়ে দক্ষিণ থেকে হাওয়া এসে নববধূর খোঁপা এলো করে' দেবে,—সে দরজা আমরাই বানালাম। পুবের জান্‌লাটা এম্‌নি করে' বসালাম, যাতে শুয়ে শুয়েই বর-বধূ ভোরের ডুবন্ত শুকতারাটি দেখ্‌তে পায়,—ছোট্ট একটা ঘুল্‌ঘুলি করে দিলাম উত্তরের দেয়ালে,—ভীতু ছটি চোখ রেখে লাজুক বউ ওর স্বামীকে দেখ্‌বে কখন ঘরে ফিরে আসে,—বুকের ঘাম ঢেলে ঢেলে শ্বেতপাথরের মেঝে শীতল পাটির মতো শীতল করে দিলাম। তোর লখিয়াকে মনে আছে পুত্‌লি?

পানের ওপর চুণের কাঠিটা বুলাতে বুলাতে পুত্‌লি বলে—তা নেই আবার।

—লখিয়ার তখন সবে বিয়ে হয়েছে, তাই ওর প্রাণ সব চেয়ে টাট্‌কা, ফুরফুরে। মেঝের ওপর এনে ইট গাদা করে,—আর ফিস্‌ফিসিয়ে সখী 'বুধা'কে বলে—টমরুর চুমুর মতন মিষ্ট কি ওদেরও? পরে লখিয়ার কি হয়েছিল, জান সৌম্য? একটা আব-মণি ইটের পাঁজা তুলে আন্‌তে গিয়ে ঘামে ভিজা বাঁশ পিছ্‌লে সটান্ মাটিতে পড়ে' গেল—আর উঠ্‌ল না। টমরুর চোখের জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওর মাথা ফেটে রক্ত ছুট্‌ল,—ওর সিঁথির সিঁদুরের মতোই ডগ্‌ডগে।

সেই, কাজে ইস্তফা দিয়ে এলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল খানিকটা রক্ত সভ্য মেঝেটার ওপর মেখে দিয়ে আসি। ও ত' নববধূটির এক হিসাবে সখী, ও ও নববধূ। বড় লোকের ঘরের নতুন বউটি যেন এই ছোটলোকের ঘরের মজুর-বউটির জন্য একটু অন্ততঃ চোখের জল ফেলে ঐ রক্তটা মুছে দেয়। গামছা দিয়ে গায়ের বালি মুছে ফেলে রাস্তায় নেমেই পুত্‌লির সঙ্গে দেখা। কাণা পুত্‌লি। আমার হাতটা ধরে' হিড়্ হিড় করে' টান্‌তে টান্‌তে বল্লে—এতদিন কোথায় ছিলি? আমি তোর জন্য এ ছুবছর ফ্যা ফ্যা করে ঘুরেছি,—কল্‌কাতার কোনো গলি কোনো কারখানা বাকি রাখি নি।—এমন কথা কোনোদিন শুনেছ সৌম্য? টমরুর ঐ বুক-ফাটা আর্ত্তনাদের মতোই কি বিস্ময়কর নয়?

সৌম্যর এ সব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই, কৌতূহল নেই,—কোলের কাছে যেটুকুন্ গ্যাসের আলো পড়েছে তাইতেই ও দূর নরওয়ের সুনীল ফেনিল জলতরঙ্গের স্বপ্ন দেখ্‌ছে,—আফ্রিকার সেই গৈরিক তাপসী বন্ধ্যা মাটির স্বপ্ন,—সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত নির্য্যাতিত বন্দী-বীরের—

পুত্‌লি বল্লে—তা নয় ত কি? মনে প্রাণে তোমাকে চেয়েছিলাম বলেই ত' একদিন হঠাৎ দেখতে পেয়ে গেলাম। সেদিন টমরুর কান্না আমার কানেও সেঁধোয় নি। সেবার বারো বচ্ছর পর গাঁয় গিয়ে দেখি পলাশ-পুকুরের পারে এক পিটালি গাছ দাঁড়িয়েছে,—সবাই গোড়ায় তেলসিঁদুর মাখে, ডাব-নারকেল দেয়,—বলে কি না যা-কিছু মনে করেই ওর ডালে সুতো বেঁধে দেবে তা যাবে অব্যর্থ ফলে। কাপড়ের সুতো ছিঁড়ে তক্ষুণি বেঁধে দিলাম, চট্ করে মনে পড়ে গেল হে দেবতা, সেই বাবুটির যেন আবার দেখা পাই,—যে আমাকে গোলাপী জামা কিনে দিয়েছিল। সেই জামা আজো আমার বাক্সে আছে,—ধুইনি।

হাস্‌তে পারি না, ঠাট্টা করতেও মন ওঠে না। ও-ই আমার পড়া চাপায় তারই জন্য বোধ হয়।

বলে—এবার আর পায়ের জুতো হয়ে নয় যে ইচ্ছে করে' ফিতে খুলে পালাবে। পায়ের ধুলো হয়ে লেগে থাক্‌ব।

—ধুলো ধুয়ে ফেলতে কতক্ষণ? কিন্তু বলি না।

বল্লাম—ঘরে যাবে না সৌম্য ?

ও চমকে উঠ্‌ল।—রাত হয়ে গেল ঢের। একটা মোম বাতি কিনে দাও ভাই। তিনটে; ঘুম ত' শিগ্‌গির আস্‌বে না। চল আমার ঘরে।

ঘর ত' নয় ছোটখাটো পৃথিবী। তেম্‌নি এঁদো, তেম্‌নি ভ্যাপ্‌সা।

হতচ্ছাড়া ঘরটা,—দেয়ালে নোনা ধরেছে,—চারদিকে অতিকায় কতগুলি আলমারি,—কাচগুলি প্রায়ই সব ভাঙা,—সারি সারি রাশি রাশি বই সাজানো এলোমেলো করে'—মেঝের ওপর এক গাদা বই টাল্‌ করে' ফেলা,—হিজিবিজি। কোণে ক্যান্‌ভাসের একটা ইজি-চেয়ার, চট্‌টা ছিঁড়ে গেছে,—তারই ওপর মোটা একটা নীল পেন্সিল।

মোমবাতি জ্বালাই।

ও বল্লে—রুশিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের কোলাকুলি দেখ, ফ্রান্সের সঙ্গে ইটালির,—আর ভারতবর্ষের সঙ্গে জাপানের, নরওয়ের সঙ্গে স্পেনের কি অপার বন্ধুতা! অদ্ভুত!

চোখ ফেরানো যায় না।—ওর ভাঙা ঘরে অলকানন্দা যেন মুখর উদ্বেল হয়ে উঠেছে,—কান পেতে শুন্‌তে হয়, প্রাণ পেতে।

তাকের বইগুলি অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের করতলের মতো সস্নেহে স্পর্শ করে' ও বলে বিভোরের মতো—বাংলার কোণে বসে' বিপুল জগতের সঙ্গে কথা কই,—টল্‌ষ্টয় মেঝের ওপর পা ছড়িয়ে বসে—ডষ্টয়ভস্কি কাঁধের ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে মধুর করে' হাসে, রাতের খাবারটুকু গর্কির সঙ্গে একত্র খাই; হামস্থন্‌ হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে বসে' বন্ধুর মতো গল্প করে' যায়—জ্বরো কপালে বোয়ার্‌ তার কোমল হাতখানি বুলিয়ে দেয়,—নীল সাগরের কল্লোলিত মায়া তার চোখে, ফ্রান্স কতদিন আমার এই ঘরে বসে' জিরিয়ে গেছে। সেদিন ফুটে কালো ঝড়ো মেঘের মতো ব্রাউনিঙ্‌ এসেছিল—সঙ্গে ব্যারেট, রুখু মাথা,—রোগা চোখে অপূর্ব্ব বিষণ্ণতা; ঘরে ঢুকেই বল্লে—আমাদের একটু জায়গা দিতে পার এখানে? কতদূর থেকে পালিয়ে এসেছি। তিনজনে মেঝের ওপর বসে' কত গল্প কর্‌লাম,—আমার ঘর যেন ইটালি।

পরে চেয়ারের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে বলে—জ্বরটা জোরেই এল কিন্তু। মেঝের ওপর কোনো রকমে শোবার ব্যবস্থা করে' দেবে ভাই? আলোটা শিয়রেই জ্বলুক।

বলি—কাদের বাড়ী এ? কি ক'রে চলে তোমার?

কতগুলি বইয়ের ওপর মাথাটা রেখে বলে—বাড়ী অন্যের, ভাড়া নিয়েছি এ ঘরটা,—হোটেলে পয়সা দিয়ে খাই। চলে কি করে'? দিদি মাসে ত্রিশটাকা পাঠান্‌,—তাইতেই,—উনত্রিশটাকার বই কিনি, ধার করি, ফের বই-বেচে ধার শুধি।

গোঙাতে গোঙাতে বলে—বাড়ীতে মা আর ছোট বোন,—আটপহর মৃত্যুর মুখের দিকে চেয়ে আছে। ঝড়ে আটচালাখানা লোপাট হয়ে গেছে,—নিজের জন্য দুটো ফুটিয়ে নিতে গিয়ে মা দু'হাত আর পা পুড়িয়ে ফেলেছেন,—ছোট বোনটা আজ চিঠি লিখেছে।

থেমে বলে—ফুঁ দিয়ে সব পুঁজিপাটা উড়িয়ে দিয়ে বাবা চলে' গেলেন রেখে তাঁর রক্ষিতা, রোগ আর লালসা। রোগ গচ্ছিত রেখে গেলেন আমার বুকে, আর লালসা দিদির। ছিঃ, তাকে কি সত্যিই লালসা বলে?

—জ্বরটা যদি এসেই গেল, তবে আলোটা নিবিয়ে দিই, এবার ঘুমোও।

—পুড়ে পুড়ে আপনিই নিবে যাবে। এখনো মাথা তেমন ধরেনি, খানিকক্ষণ পড়া যাবে। এই বেচারা জান্‌লা দিয়েই হয় ত কোন্‌ ব্যথিত সমুদ্রের নিঃশ্বাস ভেসে আস্‌বে,—কোন্‌ একটি মেঠো মেয়ে তার মিঠা দুই চোখে আমার চোখের দিকে চাইবে,—অনেকক্ষণ, যতক্ষণ না বাতিটা নেবে। তারপর—

হঠাৎ বল্লে—ফ্রেঞ্চ্‌ শিখ্‌ছিলাম ভাই। ইচ্ছে করে রাশিয়ান্‌ শিখি। এদেশে পাওয়া যায় না মাষ্টার?—আমি রাশিয়ায় যাব, বরফের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে চলে' যাব মাইলের পর মাইল, তারপর আমাকে কেউ বাঁচাবে।

যেন ক্ষেপে ওঠে। ক্ষুধার্ত্ত জানোয়ারের মত চক্ষু ধারালো বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

মনে হয়, ও যেন বন্দী প্রমেথেউস্।

পচা পাড়া, বিজাত,—সাম্‌নেই অভিজাত রাস্তা। একই মায়ের পেটের দুই ছেলে-মেয়ের কি অসম্ভব অপরিচয়,—যেন কতকালের আখোটি।

এ একেবারে আলাদা রকমের জগৎ। নতুন আইন-কানুন সব,—নতুন ধরণের নীতিজ্ঞান, নতুন নমুনার কুসংস্কার। সব কিছুর 'পরেই উদাসীন, নির্লিপ্ত,—বৈরাগী, নিঃসম্বল!

বড় রাস্তা তার সদর দরজা দিয়েই জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে জড়ো করে এই চিপা গলিতে জাকজামক্ করে' ভর্-দুপুরে,—আবার এই বিমারী গলিটা থেকেই জঞ্জাল কুড়িয়ে নিয়ে যায় মাঝ রাতে, লুকিয়ে,—খিড়্‌কির দোর দিয়ে।

কিন্তু সৌম্য এখানে কেন? ও ও কি সওদাগর,—অন্তত ও কি রাজ-ত্র নয়? ঐ যে শোভনাঙ্গী মেয়েটি রাত দুটো পর্য্যন্ত গ্যাসের তলায় বসে থাকে উদাসিনীর মত,—ওকে এসে ও কি জিগ্‌গেস করে? হয় ত শুধোয়—তুমি কেমন আছ?—দোর পেরিয়ে পর্য্যন্ত ঘরে ঢোকে নি। মেয়েট সারারাত জেগেই বসে থাকে কোনোদিন। যেন দেয়াশিনী ও।

রাত প্রায় দশটায় ঝাঁপ বুজিয়ে পুত্‌লি আসে, আঁচল দিয়ে বাতাস করতে করতে বলে—ভাত ত গামলার নীচেই ছিল, খেয়ে নিলে পারতে—

—তোর জন্য বসে'ছিলাম।

—বেশ লোক যা হোক্, তুমি খেলে পরে ত' আমার খাওয়া। এই নাও—আজকের বিক্রী নিয়ে একুশ টাকা হয়েছে। পড়ার যা কিছু দরকারি এবারে কিনে নাও কতক। হ্যাঁ গো আজো সেই মুখপোড়া মাষ্টারটা এক পয়সার পান কিনবার অজুহাতে ঘেঁসেছিল,—বেহায়ার বেহদ্দ। ইচ্ছে হচ্ছিল দিই চুণকাঠিটা গালে বুলিয়ে।

মাথার ওপর শুলে পুত্‌লি পায়ের তলায় হাত বুলিয়ে দেয়, কখনো কখনো লম্বা চুল,—ঘুমিয়ে গেলে ভিজা মুখটাও হয় ত।

বলি—এ রকম ভাবে আর কতদিন পুতুল?

—তোমার ফুটফুটে জ্যোচ্ছনার মতো একটি বউ হবে, আমি তার দাসী হব,—সেইদিন।

মাটিতে আঁচল পেতে ঘুমোব মাদুর বিছিয়ে। বলে—কোন গয়নাপত্র চাই না,— না কোঠাবাড়ী, না বা নাকের একটা নং,—শুধু তোমার বাঁ পাশে সর্ষে ফুলের মতো টাট্‌কা, টুক্‌টুকে একটি বউ হোক্!—পরে আমি না হয় বউ কথা কও পাখী হব।

এ যেন খেলো পান-ওয়ালির কথা নয়।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠি,—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কে কাঁদে রে পুতুল?

—ঐ বামুন-দিদি,—তিনরাত ঠাঁয় বসে' আছে দোর গোড়ায়।

কে? যার দাওয়ায় সৌম্য একদিন উঠে এসেছিল ভুল করে'? কেন?

মৈত্রেয়ীর সঙ্গেও কি দেখা হবার দরকার ছিল? হয় ত নয়! কিন্তু আজ্‌কের এই আনমিত হঠাৎ ঝাপ্‌সা-করে-আসা আকাশ দেখে কেন ও মেঘ-রঙের শাড়ি পরে' এসেছে?

ও যেন বাংলার মাটি,—শ্যামল, সুশীতল!

নমস্কার করে' বস্‌লাম! একেবারে ঘাব্‌ড়ে গেল! পাশের দেয়ালের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে যেতে লাগ্‌ল,—যেন আমি প্রকৃতিস্থ নই।

ভাগ্যিস্ জিভের ডগায় কথা জুয়ালো,—ঢোক গিলে বল্লাম—আপনি বনজ্যোৎস্নাকে চেনেন?

ওর চোখ দুটির দিকে যত তাকাই, ততই ওর দৃষ্টি শ্লথ শীতল হয়ে আসে।

বল্লে—কে বনজ্যোৎস্না? বনজ্যোৎস্না মিত্র?

—হ্যাঁ, মিত্র। আমারো।

—চিনি। কবে দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে?—কোথায়?

—পদ্মার ওপরে,—নৌকোতে।

আরো বল্লাম—আপনি ওর ছুলরের স্কুল ছিলেন,—

ঈদের চাঁদ। বোর্ডিঙে যখন একসঙ্গে থাকতেন তখনকার অনেক গল্পও শুনেছি আপনাদের—

—কেমন আছে ও? এখনো ঐ পদ্মার পারেই আছে? ওর সঙ্গে কিন্তু আমার ভারি দেখা করতে ইচ্ছে করে,— যাওয়া যায় না ওখানে? ওর স্বামী নিশ্চয়ই তাড়িয়ে দেবেন না। আমার নৌকোয় বেড়াতে খুব ইচ্ছা করে— মাঝ নদীতে।

অনেকগুলি কথা ব'লে ফেলে একটু হাঁপায়; জামার তলা থেকে সোনার সরু হংলিটি বা'র করে' অনামিকায় জড়ায়,—হাতের তালুটি ভিজা; ছুটি চোখে সমস্তটি হৃদয় যেন টল্‌টল্‌ করে।

হঠাৎ বল্লে—আপনি রোজ রোজ ক্লাশ থেকে পালিয়ে যান কেন? একটুও স্থির হয়ে বস্‌তে পারেন না?

শ্যামল ঘনপল্লব অরণ্যের মধ্যে ঘনবল্লীর মতো ওর তনুলতা পরনে মেঘডম্বুর শাড়ী,—ছুটি চোখ দুরবগাহ!

—কেন, খুব নিঃশব্দেই ত' যাই,—টের পাওয়া উচিত নয় কারু।

—প্রোফেসার পান্‌ না বটে, কিন্তু আমি বুঝি। লাইব্রেরীতে পড়েন বুঝি গিয়ে?

লাইব্রেরী? কোন্‌ তলায় তাও জানিনা,—এম্‌নি ঘুরে আসি একটু।

ও একটু হাসে, সে ত' হাসি নয়, সম্বোধন। আকাশের মেঘ যেমন মাটির দুর্ব্বল দুর্ব্বার পানে চেয়ে হাসে। আজকে এ রকম মেঘ করে' না এলে কখ্‌খনো ওর স্ফুরিত ঠোঁটের কোণে হাসি ভেসে উঠ্‌ত না, তাঁর অর্থও থাকৃত না কোনো।

ওর দুটি চোখ যেন সাগরের ছ'চাম্‌চে নীল জল!

একটি ভদ্রলোক,—গায়ে একটি মুসলমানি ছিটের পাঞ্জাবী, একচল্লিশ ইঞ্চি ঝুল,—পরনের কাপড় কিন্তু আটহাতি,—ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে' চেয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি লোলুপ নয়,—কাতর, ভারি অসহায়! ঐ ঘুমন্ত মেঘের সঙ্গে ওরও চোখের আদল আছে। দরিদ্রতায় ভরা।

'করিডোর' দিয়ে যে-ই হেঁটে যায়, সে-ই উৎসুকী হয়ে আমাদের দেখ্‌তে থাকে, কেউই নির্ব্বিকার নয়,— সাম্‌না দিয়ে দু'তিনবার করে' টহল দিয়ে যায়। মৈত্রেয়ী একা ওদের যত না চঞ্চল করেছে,—ওর পাশে আমাকে দেখে সবাই একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত, অস্থির হয়ে উঠেছে। গোবিন্দ পর্য্যন্ত ভাবছে,—ঐ আটহাতি খদ্দরের থান প'রে ওরই দাঁড়াবার কথা মৈত্রেয়ীর পাশে,—ক্লাশে প্রোফেসারের সঙ্গে অকারণে তর্ক করে' বিদ্যে ফলিয়ে ও ত' নিজের বিজ্ঞাপন আর কম দেয় নি। ডান হাতের আঙুল দিয়ে খোঁচা খোঁচা দাড়ি খোঁটে,—চোখের পাতা পিট্‌পিট্‌ করে,—এমন ভাবে তাকায়,—আমি যেন 'রোড্‌স্‌'-এর পিত্তলমূর্ত্তি, 'কলোসাস্‌'।

প্রোফেসার-ও একটু ঘেঁষে। মৈত্রেয়ীকে বলে' যায়— শনিবারে আমার কাছে আপনার টিউটোরিয়্যাল। এই নিন্‌ নোট্‌টা—হাতছাড়া করবেন না। খুব স্কেয়ার্স।

চলে' গেলে বল্লাম—টিউটোরিয়্যাল-এ আপনি একাই পড়বেন বুঝি ওঁর কাছে। একা হলে খুব যত্ন নিয়েই পড়াবেন নিশ্চয়।

ও ফট্‌ করে' বল্লে—আপনিও আসুন না ওঁর ক্লাশে। —হ্যাঁ, খুব নেবেন। কেন নেবেন না? না, আপনাদের দরকার হয় না ওসব কিছু।

সত্যিই। সেদিন মৈত্রেয়ী ক্লাশে আসে নি, প্রোফেসারের পড়া ভালোমতো জম্‌লই না,—সব ছেলেই কেমন উস্‌খুস্‌,—কোথায় যেন তাল কেটে গেছে,—সব মিউনো, ম্যাজমেজে। তাই যতক্ষণ না মৈত্রেয়ীকে বারান্দায় পা ফেলতে দেখে—লঘু ছুটি পা—ততক্ষণ প্রোফেসার পায়চারী করে' বেড়ায়। ক্লাশে ঢুক্‌লেই ছেলেদের গোম্‌রা মুখ একমুহূর্ত্তে কোমল হয়ে আসে। ভাব ভাষা পায়,—কবিতার প্রথম লাইনটা খাপ্‌ছাড়ার মতন খানিকটা শূন্যে ঝুলে দ্বিতীয় লাইনে ছন্দের সঙ্গতি পায়, সম্পূর্ণতা পায়।

যে সব বিদ্যের বাহাদুরি দেবে বলে' গোবিন্দ বাড়ী থেকে তৈরী হ'য়ে আসে, সেগুলো খইয়ের মতো ফুটিয়ে ফুটিয়ে ছুঁড়ে মারে,—মাষ্টারও বিদ্যে ফলাবার সুবিধে পায়। ওরা যেন আগে থেকে সল্লা করে' এসেছে।—

মৈত্রেয়ী তাই অবাক হয়ে শোনে,—খাতায় কিছু কিছু টুকেও নেয় হয় ত।

ছুটি হয়ে গেল, গোবিন্দ এখনো বাড়ী যাচ্ছে না কি রকম! ওর কি পড়ার আর জায়গা নেই যে একেবারে করিডোরের রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েই নিজেকে জাহির করতে হবে? মনে হয়, মৈত্রেয়ীর সঙ্গে কি যেন একটি কথা কইতে চায়।

কিন্তু কি কথা কইবে? বলবে কি, মিকালেঞ্জেলোর 'মালা ও মেখলা' কবিতাটি ভারি সুন্দর, ল্যাম্ব ভারি দুঃখী ছিল,—আপনিই শেলির Witch of Atlas.

কি কথা কইবে?

বল্লাম—আপনি ত এবার বাড়ী যাবেন। ট্রামে?

—হ্যাঁ। আপনি? পায়ে হেঁটেই নিশ্চয়।

ওকে রাস্তায় এগিয়ে দিই। হাত দেখিয়ে ট্রাম্ থামাই, ও উঠে।

বলি—বনজ্যোৎস্নাকে ভুলবেন না।

ও শুনতে পায় না, চেয়ে থাকে। এবার আর নমস্কার করি না।

পানের দোকানের আয়নাটার দিকে চেয়ে থাকি একদৃষ্টে।

পুতলি কৌতূহলী হয়ে শুধোয়—কি দেখ্ছ?

—নিজেকে। এই তেজী দেহটাকে। আর কিছুই চাই না পুতলি, চলতে পাই যেন,—নিজেকে যেন টেনে নিয়ে যেতে পারি। নাই বা হলাম বেদে, নাই বা আড়তদার।

সৌম্যর বিষণ্ণ বিবর্ণ মুখ চোখে ভাসে,—ও যেন ভাগ্যের বাজে রসিকতা। ও যেন অকারণ।

বলি—আর যেন এমনি প্রাণ থাকে—লেলিহান। আমি সমস্ত রুদ্ধদ্বারের শক্তি পরীক্ষা করব, সমস্ত অবগুণ্ঠনের শুচিতা,—পা ফেলে যাব সকলের বুকে করাঘাত ক'রে, করস্পর্শ করে'!

ভুলে যাই যে পান বেচ্ছে, সে মৈত্রেয়ী নয়।

মাঝে কিসের লম্বা ছুটি।

গতানুগতিক ভাবে একটা চিঠি এল,—মৈত্রেয়ী চসারু-এর নোট চেয়ে পাঠিয়েছে আমার কাছে! ঐটুকুই আব্রু, ঐটুকুই কৃত্রিমতা। পরে লিখেছে—বনজ্যোৎস্নার কথা সেদিন সমস্ত শোনা হয় নি। দয়া করে' আসবেন একদিন। কালই আসুন না। না এলে কিন্তু ভারি দুঃখিত হব।

না এলে কিন্তু,—এর পর কি লিখে যেন কেটেছে কালি দিয়ে,—আলোয় ধরে' দেখি, লিখেছে,—না এলে কিন্তু ভারি রাগ করব।

বেলা যেন ভাদুরে কুঁড়ে, কাটতে চায় না। কিন্তু সন্ধ্যা কাবার করে'ই গেলাম। চসারের নোট্ কথায় পাব,—গোবিন্দের কাছে চেয়েও লাভ নেই,—সমস্ত হৃদয় বনজ্যোৎস্নায় ভরে' নিলাম।

সাদাসিধে দোতলা বাড়ী,—দোরের গোড়ায় আর সন্ধ্যাদীপ নয়,—মৈত্রেয়ী নিজে।

মৈত্রেয়ী খুশী হয়ে বল্লে—সেই কখন্ থেকে আশা করে' আছি। তবু এসেছেন যা হোক্। ভাবলাম, চিঠিই পান নি হয় ত। আসুন ভিতরে।

নোটের কথা জিজ্ঞাসাও করে না।

আজকে ওর খালি দুটি পা,—আটপৌরে একখানা শাড়ী, গরীবের ঘরের মেয়ের মতোই নম্র সলজ্জ, মাথার ঘোমটাটি শিথিল, চুলের সঙ্গে সেফ্টিপিন্ দিয়ে আঁটা নয়, —গায়ে শাদা সেমিজ, মনিবন্ধ পর্য্যন্ত নামিয়ে-দেওয়া ফুল্-হাতা ব্লাউজ নয়,—ওর হাত দুটি দেখি, হাত দিয়ে নয়, চোখ দিয়ে ছুঁয়ে শীতল হই।

ওর পড়ার ঘরে আসি, ফিট্‌ফাট্—ওরই মতো লক্ষ্মী ঘরখানা। বসতে দেয়। মা আসেন। বলে' দিতে হয় না, উঠে প্রণাম করি। গল্প চলে। ছোট বোন খাবার নিয়ে আসে,—গন্ধমাদন পর্ব্বতের মতোই ভারি।

বলি—কে কোথায় আছে ডাকুন সবাইকে,—সারা রাত বসে' খাওয়া যাবে।

মৈত্রেয়ীও আমার সঙ্গে মুখ নেড়ে নেড়ে খায়।

কত কথা চলে,—গ্রীক্ ট্রাজেডি, জোকাষ্টা,—পরে ওফিলিয়া,—আরো পরে গ্রেচেন্।

মা মৈত্রেয়ীর কথা উল্লেখ করে' বলেন—ও একেবারে একা পড়ে' গেছে। ওকে তোমরা একটু সাহায্য করো কি পড়্‌তে হবে না হবে।

মৈত্রেয়ীর বাবা বুড়ো মানুষ,—দরাজ হাসি,—এমন চমৎকার মিশ্‌তে জানেন। আমি যেন কোথাও পেরেক হয়ে ফুটে রইনি,—জলস্রোতের মতো মিশে গেছি। উনি ঘাড় চাপড়ে বল্লেন—এই ত' চাই,—কলম যদি না বাগাতে পার হাতে হাতুড়ি তুলে নিও,—লাঙল, লাগাম, লাঠি,—যা হাত চায়। আমি তাই মনে করে'ই আমেরিকায় পালিয়ে ছিলুম।

বল্লাম—কিন্তু আপনি ত' হাত ভরে' টাকার থলি নিয়ে এসেছিলেন—

কি তাঁর হাসি, জোয়ারের জলধ্বনির মতো,—যেন তাঁর টাকার থলেটা মেঝের ওপর উজার করে' ঢেলে দিলেন।

মৈত্রেয়ী বল্লে—চলুন ছাতে যাই। এ ঘরে বনজ্যোৎস্না কক্‌খনো আস্‌বে না।

ওর বাবা বৈঠকখানায় যেতে যেতে শুধু বল্লেন—রাতে ওঁকে ভাত খাইয়ে তবে ছেড়ো। পড়া-পত্রের সব খোঁজ-খবর নিয়ে রেখো মা। হ্যাঁ, কাঞ্চন, বিশেষ কোন কাজ না থাকলে এখানে ত' থেকেও যেতে পার আজ। তোমার সঙ্গে ওয়াল্‌টার পেটার সম্বন্ধে কিছুক্ষণ না হয় বিতণ্ডা করা যেত এর পরে। তুমি যে রকম ভক্ত পেটারের।

মৈত্রেয়ী আমাকে ছাতে নিয়ে আসে, চেয়ার না এনে,—একটা পাটি বিছিয়ে দেয় শুধু। আলিসায় একটি সলজ্জা রজনীগন্ধা মৃদু কটাক্ষ করে, তারারা পরস্পরের কানে ফিস্ ফিস্ করে' করে' কি কথা কয়, সবাই কৌতূহলী হয়ে ঝুঁকে পড়ে' আমাদের দেখে।

মৈত্রেয়ী একটু দূরে বসে,—ওর সোনার দুটি চুড়ি হাত নড়ার সঙ্গে একটু একটু বাজে,—তাই শুনে বাতাস একটু সচকিত হয়। হঠাৎ ছাতে এসে রজনীগন্ধার কানে কি ইঙ্গিত করে' যায়। মৈত্রেয়ী বলে—বলুন।

—আমি তখন মাঝি ছিলাম—

—মাঝি ছিলেন? তার মানে?

—তার মানে একটা ডিঙি ছিল, আমি বৈঠা টেনে টেনে পদ্মা ধলেশ্বরী মেঘনা শীতলক্ষ্যা পাড়ি দিতাম।

—খুব চমৎকার ত'? ভয় করত না?

—করত না আবার। ভয় করত বলেই ত' ভালো লাগ্‌ত।

—কেন মাঝি ছিলেন? কেন?—বলুন না।

যেন কান্নার সুর।

বলে' চলি—নদীর ওপরেই থাক্‌তাম,—নৌকোয়। নিজেই রাঁধতাম,—জলে ভাসিয়ে দিয়ে হুঁকো নিয়ে বসে' থাক্‌তাম। সেবার পুরো তিন দিন নৌকো নিয়ে টো টো করেছি, একটাও জুৎসই কিরায়া পাইনি,—সাহানার সুরের মতো আমার না' ভেসে চলেছে। ঝড় উঠ্‌বে বলে' বন্দরে এত্তেলা দিয়েছিল, তাই ভীতু বৌটির মতো নৌকোকে পাড় ঘেঁষিয়ে নিয়ে চলেছি। বৈঠা টানি আর চারিদিকের অপূর্ব্ব তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখে মনে মনে মেতে উঠি; গ্রহতারা আকাশ অন্ধকার তরু লতা সবাইকে সম্বোধন করে' ধন্যবাদ জানাই এই স্বাস্থ্য এই পরমায়ু পেলাম বলে'—নদীস্রোতকে নমস্কার করি,—প্রাণে এই চলার বেগ এসেছে বলে'। শঙ্খচিল ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায়—তাই দেখি।

অনেক দূর চলে' এসেছি নিশ্চয়ই,—পূবো কোণে কালো মেঘ তাল পাকাচ্ছে কে,—ঘুমন্ত করুণ গ্রামখানি,—অবগুণ্ঠিতা বধূটির মতো, বিরহ-রাতের নেবানো বাতিটির মতো। পাড় থেকে কারা আমাকে ডাকলে,—সারা রাত তাদের আজ বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে,—এদিকে ওদিকে, জল যেদিকে ঠেলে, তল যে দিকে ডাকে।

বল্লাম—ঝড় উঠ্‌বে যে,—ইষ্টিশানে লাল বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে।

মেয়েটির আ-বাঁধা চুলের সঙ্গে শাড়ি ওড়ে, বলে—উঠুক ঝড়। ঝড়কে কি ডরাই?

না, ও যেন ঝড়কে ভালোবাসে, ঝড় নয়, বর ওর—সেই ভরসায়ই নৌকায় উঠ্‌ল।

কিন্তু ঝড় এলো না। পুঞ্জিত নিঃশব্দ প্রশান্ত দুঃখের মতো সান্দ্র সুনিবিড় অন্ধকার।

মৈত্রেয়ী বল্লে—বেশ আস্তে আস্তেই বলুন,—এখানেই থেকে যাবেন না হয়।

বলি—কল্‌কাতায় ভালো প্রাক্‌টিস্‌ জম্‌ল না প্রবোধের। গাঁয়ের একটা হেড্‌মাষ্টারি নিয়ে চলে' এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর খুড়্‌তুতো ভাইটি—যিনি আগে এই শহরেরই একজন কণ্ট্রাক্টার ছিলেন—হঠাৎ সেই গাঁয়েই এক কবিরাজি ডিস্‌পেন্সারি খুলে বস্‌ল। প্রবোধের আরো দু'টি ছেলে হয়েছিল,—ক্রিম্‌ আর সানুইয়াৎ,—বনজ্যোৎস্নাই নাম দিয়েছে। ওরাও মারা গেছে।

—মারা গেছে? কিসে? মৈত্রেয়ীর বুকে মাতৃব্যথা উদ্বেল হয়ে ওঠে যেন।

—সেই একই ব্যারামে। তেমনি,—চোখে ঘা হয়ে, প'চে, নীল হয়ে। সেদিনকার অন্ধকার নিরালা রাতে নৌকো থেকে উবু হয়ে ঝুঁকে পড়ে' বনজ্যোৎস্না অস্ফুটস্বরে পদ্মার কাছে হয়ত একটি সুস্থ নিষ্কলঙ্ক সন্তান কামনা করছিল। বল্লাম—কি দেখ্‌ছেন নীচু হয়ে? ও শুধু বল্লে—নিজের মুখ।

মৈত্রেয়ী অস্থির হয়ে বল্লে—প্রবোধবাবুরও খুব অসুখ বুঝি? তাই ওঁকে নিয়ে রাত্রে নৌকো করে' হাওয়া খেতে এসেছিল?

—যাকে নিয়ে এসেছিল সে অসুস্থ বটে কিন্তু সে প্রবোধ নয়। প্রবোধ ত' ওকে জ্যোৎস্না বলে' ডাকে, কিন্তু এ ওকে বন' বলে'ই ডাক্‌ছিল। এ ওর ঠাকুরপো,—সেই কণ্ট্রাক্টার।

মৈত্রেয়ী একেবারে অবাক হয়ে যায়, চেঁচিয়ে ওঠে—বলেন কি?

—আমি ত' বলছি, কিন্তু ওরা সারা রাত একটি কথাও বল্‌তে পারল না। কত বাজে গল্প করল,—অন্ধকারে ঘুমন্ত গ্রামগুলিকে কি অপূর্ব্বভাবে অপরিচিত লাগ্‌ছে, কয়টি তারা একসঙ্গে গোণা যায়, এখানে ডুবলে কোথায়—কতদূরে শবদেহটা গিয়ে ভেসে ওঠে,—ঝড় উঠ্‌বে না অথচ এম্‌নি লাল বাতি জেলে ভয় দেখাবার কি অর্থ,—এই সব নিয়েই যত কথা। কিন্তু এই অন্ধকারে নদীতরঙ্গের ওপর ওরা ত' এই সব কথাই বল্‌তে আসে নি। বনজ্যোৎস্না একবার জলের মধ্যে দু'খানি পা ডুবিয়ে বসে' ছিল, ছেলেটি বল্লে—অসুখ করবে, পা তোল'। বনজ্যোৎস্না বল্লে—হোক্‌। কিন্তু ঐ কথাটিই ওরা অন্য কি ভাষায় যেন ব্যক্ত করতে চায়,—বলা যায় না। বনজ্যোৎস্না বলে—তোমার এবার ঘুমানো উচিত,—ঘুমোও। তার উত্তরে ছেলেটি বলে—অন্ধকারে নদীকে কি আশ্চর্য্য দেখায়! এই কি ঐ কথার উত্তর? নৌকোর দোলায় ছেলেটি ঘুমিয়েই পড়ে—পাটাতনের ওপর; বনজ্যোৎস্না বাইরে চেয়ে থাকে। একটু ছোঁয় পর্য্যন্ত না। আমাকে বলে—ভোর না হতেই কিন্তু ফিরিয়ে নিয়ে যেয়ো, যেখান থেকে তুলে এনেছিলে আমাদের—

মৈত্রেয়ীর হাতের সঙ্গে আমার হাতের কখন যে চেনা হয়ে গেছে, জানি না। বল্লে—তারপর?

—তারপর বনজ্যোৎস্নাকে ওর বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এলাম, আর ছেলেটি ওর খড়ের ঘরের ডিস্‌পেন্সারিতে গিয়ে উঠ্‌ল।

—তারপর?

—তারপর,—এবার বাড়ী যাব।

—না, এখানেই থেকে যান, এতরাত্রে কোথায় যাবেন? শেষ করে যান গল্পটা,—বনজ্যোৎস্না কেমন আছে?

—না, যেতেই হবে আমাকে।—মানুষ আবার কেমন থাকে? এই-এক-রকম।

করিডোর-এ আলাপ করার সুবিধে হয় না সব সময়,—তাই লিফ্‌ট্‌ম্যান্‌-এর সঙ্গে বন্দোবস্ত করা গেছে। ক্লাশ-ঘণ্টার মধ্যে দু জনে লিফ্‌টে সোফাটার ওপর বসে' কথা কই,—লিফ্‌ট্‌ম্যান্‌ তিন্‌-তলা আর চার-তলার ফাঁকে লিফ্‌ট্‌ বন্ধ করে' আমাদের লুকিয়ে রাখে। কেউ ঘণ্টা দিলে—এমন বেমালুম ভাবে উঠে আসি বা নাবি যেন হঠাৎ আমাদের দেখা হয়ে গেছে।

মৈত্রেয়ীর সঙ্গে এতটা বোঝাপড়া,—এতটা জানাশোনা। সেদিন বারান্দায় দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল ছুটির পর।

মৈত্রেয়ী বল্লে—আপনি ঐ ভদ্রলোকটিকে চেনেন, ঐ নীল র‍্যাপার গায়ে,—

—কেন ?

—লোকটি ভালো নন্।

—তার মানে ?—ভালো নন্, কি করে' বুঝলেন ? খুব মনীষা আছে ত' আপনার ?

ও বল্লে—আলাপ-টালাপ কিছু নেই, চিনিনা শুনিনা,—আমি এখানে দাঁড়িয়েছিলাম চুপ করে'—হঠাৎ কাছে এসে বল্লে, কাঞ্চনবাবুকে ডেকে দেব ? কি অন্যায় বলুন ত' ?

—কেন, কিসের জন্য অন্যায় ? ও আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়, ওর ত' কোনো রকমেরই ইন্‌ট্রোডাক্‌শান নেই,—ও ত' আমার মতো সৌভাগ্যক্রমে বনজ্যোৎস্নার সঙ্গে পরিচিত নয়। ও যদি আপনার সঙ্গে কথা কইতে চায়,—তার যদি কোনো সুন্দর ও সহজ সুযোগ না মেলে,—তবে কি করে' আপনার কাছে এসে দাঁড়াবে শুনি ?

—কথা কইবার কিই বা দরকার ?

—আপনার হয়ত নেই কিন্তু ওর দরকার আছে নিশ্চয়ই। আমি ওর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব।

মৈত্রেয়ী অস্ফুটস্বরে বল্লে—না—না। কি নাম ওঁর ?

—গোবিন্দ।

মৈত্রেয়ী হেসে উঠল,—নামটা ওর পছন্দ হয়নি।

—নিশ্চয়ই আলাপ করিয়ে দেব। শুধু নাম শুনেই এত বিতৃষ্ণা,—গল্পে প্রথম লাইন পড়েই 'ভালো হয়নি' ? তবে যাদের নাম সজনীকান্ত, হেরম্বচন্দ্র, রমণীমোহন—তাদের সঙ্গে আপনাদের মতো কোন শিক্ষিতা আলোক প্রাপ্তা মেয়ে কথাই কইবে না ? অন্যায় যত, সব বুঝি ওরই,—আপনার আর কিছু নয়। ডাকি গোবিন্দকে।

গোবিন্দ এসে দাঁড়াল,—দুই চোখে অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়, অথচ নম্রতা,—সহসা ও যেন অত্যন্ত সুন্দর হয়ে গেল। ওর অদ্ভুত বেশভূষা, অদ্ভুত মুদ্রাদোষ,—সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে ওর মুখে হঠাৎ অনিন্দ্য কান্তি এসে গেছে। সমস্ত মুখে আর কোন কাঠিন্য নেই, হাসি ; গোবিন্দ যে হাসতে জানে জানতাম না।

বল্লাম—এঁকে তোমার নোট্‌গুলো দিতে পারবে গোবিন্দ ?

গোবিন্দ খুশী হয়ে বল্লে—কেন পারব না ? বারে,—খুব পারব। আজ সমস্তদিন দান্তের সম্বন্ধে একটা খুব ভালো নোট্ টুকেছি,—নিন্, পড়তে পারবেন ত হাতের লেখা ?

মৈত্রেয়ী খাতাটা নেয়, দু চারখানি পাতা উল্টোয়, বলে—কেমন সুন্দর হাতের লেখা আপনার,—আপনি খুব পড়েন। দান্তে ত' এখনো সুরু হয়নি ক্লাশে।

মৈত্রেয়ীর চোখের ছোঁয়াচ্ লেগে গোবিন্দের চোখও অগাধ রহস্যে ভরে' উঠেছে। বল্লে—না, কি আর পড়ি, বারো ঘণ্টাও হয় না। রোমাণ্টিক্ কবিদের সম্বন্ধে একটা নতুন বই এসেছে লাইব্রেরিতে—দেখ্‌বেন পড়ে' অদ্ভুত রকমের লেখ্‌বার কায়দা।

এমন সুন্দর করে' গোবিন্দ কথা কইতে পারে, কে জান্‌ত আগে ? কপালের থেকে চুলগুলি মাথার ওপর তুলে দেয়, তাও অতি সুন্দর করে'। ওর দাঁড়াবার ভঙ্গীটিও আজ হঠাৎ সুন্দর হয়ে গেছে। ওর মুখ লাবণ্যময় হয়ে উঠেছে,—দুই চোখে তৃপ্তির অগাধ সুখ যেন।

পড়া-শোনার বিষয় আরো অনেক কথা হয়।

ট্রামে করে' মৈত্রেয়ীর সঙ্গে বাড়ী যাচ্ছি—দেখি ফুটপাথে গোবিন্দ। বলি—এস এস গোবিন্দ।

গোবিন্দ ছুট্‌ল চলন্ত ট্রাম ধরতে, কিন্তু খানিকদূর ছুটে নাগাল না পেয়ে থেমে গেল। তাই দেখে মৈত্রেয়ীর মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসি।

আমি ট্রাম থেকে নেমে গেলাম।

উবু হয়ে পড়েছে এম্‌নি বাড়ী,—রোয়াকের ওপর দাঁড়িয়ে ডাকি—গোবিন্দ।

হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা, সারা গায়ে ঘাম, হাতে একটা ঝাঁটা,—গোবিন্দ বেরিয়ে আসে। বলে—কে, কাঞ্চন ? এস, ঘরটা সাফ করছি।

ঘরে ঢুকে একটা দারুণ দুর্গন্ধ পাই—তক্তপোষের তলায়

ইঁদুর মরেছে, সমস্ত দেয়ালে থুতু সিক্‌নি ছিটানো,—কোণে কোণে আবর্জ্জনায় স্তূপ, যাচ্ছেতাই নোংরা ঘর।

সেই ঘরের কথা হঠাৎ যেন আজ ওর মনে পড়ে গেছে। একে ধুয়ে মুছে একেবারে পরিষ্কার করে ফেল্‌তে না পার্‌লে ওর যেন স্বস্তি নেই।

আমিও ওর সঙ্গে ঘর পরিষ্কার করতে লেগে যাই। বলি—এই ঘরেই বারো ঘণ্টা করে পড়? এই ঘরে শোও,—ঘুম আসে? গায়ের ওপর দিয়ে ইঁদুররা হাড্‌ল্‌-রেস্‌ করে না? টেবিলটা এই কোণে রাখ,—একটা পায়া নেই আবার, দুটো পেরেক এনে দাও। দেয়ালের এ জায়গায় একটা সুন্দর ছবি টাঙালে ভারি মানাবে।

গোবিন্দর প্রাণে যেন চৈত্র-রাত্রির চাঞ্চল্য এসেছে,—অরণ্যের আনন্দ; ও মর্ম্মরিত হচ্ছে, শুন্‌তে চাইলেই শোনা যায়। বলে—একটা খুব জোরালো নোট টুকছি—বায়রণের। সেটাও মৈত্রেয়ীকে দিয়ে এস।

—তুমিই দিয়ে এস। ও তোমার কথা বল্‌ছিল সেদিন।

—সত্যিই ভাই, আমি তেমন পড়ি না, আরো ভালো ক'রে পড়্‌তে হবে।

নোংরা ঘর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। গোবিন্দের মনের আনন্দ যেমন ওর কদর্য্য দেহের ওপর মূর্চ্ছিত, বিচ্ছুরিত হয়।

নোট নিয়ে গোবিন্দ নিজেই গেল। আমি বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলাম। ও খানিকক্ষণ একলা কথা কো'ক্‌।

অনেক পরে ও আসে, ততক্ষণ ফুটপাতেই পায়চারি করি। ও এসে একেবারে ঘাড়টা জড়িয়ে ধরে' বল্লে—কি চমৎকার লোক ওরা সব। সুইন্‌বার্ণ-এর একটা খুব ভালো সমালোচনা বেরিয়েছিল, সেটা ও চেয়েছে। সব টুকতে হবে,—দু'বার করেই। এই যাঃ, তুমি যে এসেছিলে এ কথা বল্‌তে ভুলেই গেছলাম। চল ফিরে যাই।

বলি—পরে। এখন যদি কোন কথা মনে হয়ে থাকে তোমার, তবে তুমি একলাই ফিরে যাও, আমার যাবার দরকার নেই!

সারা রাস্তা ও মুখর করে' চলেছে, কত গল্প যে করছে তার অন্ত নেই, মৈত্রেয়ীর মুখ দাড়িম্বের আঁকবার মতো, ট্র্যাম্‌ ভারি আস্তে চলে, আজ্‌কে বৃষ্টি নাম্‌লে ও নিশ্চয়ই ভিজ্‌বে,—এমনি যত আজগুবি কথা। ক্লাশে যখন ও তর্ক করে তখন কথার মধ্যে কি কর্কশতা ছিল, সে তর্ক ছিল পুঁথি নিয়ে,—আর এখনকার কথাগুলি কি করুণ, অথচ কি উচ্ছ্বসিত।

সব চেয়ে আশ্চর্য্য, ও সুন্দর করে' বসে—সব চেয়ে আশ্চর্য্য, ও আর দাড়ি খোঁটে না।

—এখনো আলো জ্বালিস্‌ নি সৌম্য?

—মদ খাচ্ছি।

ভেতর থেকে কথা আসে। চাপা, চুপ্‌সো।

আবার আসে—দোরটা শুধু ভেজানো আছে, ঠেলা দে।

ঘরে ঢুকে দেশ্‌লাই বের ক'রে জ্বালাতে যাই, সৌম্য বাধা দিয়ে বলে—না থাক্‌। পরে কোণের দিক লক্ষ্য করে বলে—বেশ। তুমি এবার যেতে পার।

অন্ধকার কোণ থেকে কে যেন উঠে দাঁড়ায়! মাথায় ঘোম্‌টা। ঘোম্‌টাটা অকারণে একটু টানে। মুখ দেখা যায় না। খোলা দরজা দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়।

বলি—কে ও?

—আমার দিদি।

—কোন্‌ দিদি? যিনি টাকা পাঠান্‌?

—হ্যাঁ।—ওর মুখের দিকে তাকাতে পারি না, তাই আলোটা নিবিয়ে দিয়েছি। দেরাজের থেকে বোতলটা টেনে আন্‌ ত', আর একটু ঢালি।

বলি—দিদির সাম্‌নেই?

—দিদি জানে, মদ না হ'লে আমার চলে না। যেমন আমি জানি—

থেমে যায়। ফের বলে—দিদি আর ভাই।

বলি—কেমন আছিস্‌? জ্বর কত?

—জ্বর একটু আছে। আজো ওষুধ কেনা হল না, কাঞ্চন। তুই কেন তখন খবরের কাগজটা রেখে গেলি? একটা নতুন বইর বিজ্ঞাপন দেখে লোভ সাম্‌লাতে পার্‌লাম না। সাড়ে সাতটাকা।

আলোটা জ্বালাই। ওর কোলের ওপর টকটকে লাল রঙের মোটা বই একটা।

ও বলে—আগাগোড়া রক্ত দিয়ে মাখা।

বলি—আর ওগুলো গিলিস্ নি। এমন করলে আর ক'দিন বাঁচ্‌বি?

—আমিও তাই এতক্ষণ ভাব্‌ছিলাম। স্বস্তিতে শুধু দুটো নিঃশ্বাস ফেল্‌বার জন্য সবাই সমস্ত দুঃখকে উপেক্ষা করছে,—খালি প্রাণটুকু ধরে' রাখ্‌বার চেষ্টায়। মোড়ের ঐ ছুটো-পা-খসা ঠুঁটো ভিখিরীটা পর্য্যন্ত। আমার দিদি পর্য্যন্ত! কেউই মরতে চায় না, কেন বাঁচ্‌ব, তাও পর্য্যন্ত প্রশ্ন করার সময় নেই। বাঁচাটা যেন বহুযুগের সংস্কার। —বাকি মদটা কোণের ঐ মেঝের ওপর ঢেলে দে, ওখানে বসে' বসে' দিদি অনেকক্ষণ কেঁদে গেছে। মদ দিয়ে চোখের জল ধুই।

—কি খাবি রাত্রে?

—সবাইকে বিয়ে করতে হবে এ যেমন সত্য নয়, সবাইকে বাঁচ্‌তে হবে—এ ও ততখানি মিথ্যা। কারু কারু পক্ষে তাড়াতাড়ি মরাটা সত্যি সত্যিই উচিত। কেন এসেছি,—এ কথা কেউই প্রশ্ন করে না, কিন্তু যদি কেউ করত ত' উত্তর পেত—মরতে এসেছি। আমিও তাই মরতে চাই,—মৃত্যুকে আবিষ্কার করবার জন্য আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে, মৃত্যু কতখানি কদর্য্য কতখানি নিষ্ঠুর, একবার দেখে নেই। আজ সমস্ত দিন ভরে' কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি জানিস্? হঠাৎ সৌরজগৎ থেকে বাতাস যেন লুপ্ত হয়ে গেছে, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী,—মানুষ জীবজন্তু পোকা পতঙ্গ গাছ লতা সব অসহ্য যন্ত্রণায় নিঃশব্দে ধুঁকছে, বাতাসের জন্য কাড়াকাড়ি, কাম্‌ড়াকাম্‌ড়ি লাগিয়েছে, দাঁত নখ দিয়ে চিরে চিরে আকাশকে রক্তাক্ত করে' ফেল্‌ছে,—উঃ, তুই তা ভাবতেও পারবি না। নিঃশ্বাস, নিঃশ্বাস, সবাই শুধু নিঃশ্বাসটুকু নিতে চায়।—

পরে বল্লে—ঐ দিকের তাকটা প্রায় ফাঁক করে' ফেলেছি, সব বইগুলি পুরোনো বইর দোকানে কাল বেচে টাকাটা দিদিকে দিয়ে আস্‌তে হবে, কাঞ্চন। ও কাল কোথায় যেন যাবে। পারবি ত' ভাই?

—কোথায় যাবেন?

—যার জন্য বেরিয়ে এসেছিল সে ছ' বছর জেল ভুগে বেরিয়ে এসে ওকে চিঠি দিয়েছে, বেচারার নাকি সাঙ্ঘাতিক অসুখ। তার কাছেই যা-ব, টাকা চাইতে এসেছিল।

—কি ব্যাপার?

—সে একটা খুব পচা পুরোনো গল্প, নাই শুন্‌লি। বিয়ে হবার পর দিদিকে ওর স্বামী আর শাশুড়ী ঘরে ঝুলিয়ে রেখে লোহা পুড়িয়ে গায়ে ছ্যাকা দিত, স্বামী একটু আধুনিক ছিল, হাণ্টারের বাড়ি মারত; শাশুড়ী ছিল সাবেকি, দিদির হাতটা মেঝের ওপর রেখে নোড়া দিয়ে ছেঁচ্‌ত, ইত্যাদি। তোর মুখ এত বিমর্ষ হচ্ছে কেন? এ সব কিসের শাস্তি জানিস্—ভালোবাসার। আমার ত' এ কথা ভাব্‌তে আজো হাসি পায়। লোকে কেন ভালোবাসে? খুব মজার ব্যাপার আগাগোড়া।

—তারপর?

—তারপর দিদি পাগল হয়ে যায়, বেরিয়ে আসে। পাগ্‌লা গারদে বছর তিনেক থেকে ভেসে পড়ে। বছর খানেক আগে আমার সঙ্গে দেখা হল, সে ভারি করুণ, আমি তা ভাব্‌তেও পারি না, কাঞ্চন। দিদি তার পিঠের ঘায়ের বীভৎস চিহ্নগুলি রাজপথে সবাইর চোখের সাম্‌নে উন্মুক্ত করে' ভিক্ষা করছে। তাতে জীবনধারণ করবার পক্ষে যথেষ্ট রোজগার হত না নিশ্চয়ই। তাই—

—আর ছেলেটি?

—দিদির স্বামী খুন হয়। সেই সন্দেহে ছেলেটিকে জেলে ঠ্যালে। ওর মরণাপন্ন অবস্থা নাকি,—ও যেন সেরে ওঠে, দিদি যেন ওকে গিয়ে দেখ্‌তে পায়। মনে মনে এই কামনা করি। বিধাতার কাছে আমরা খুব বেশি প্রার্থনা ত' করি না, কাঞ্চন। তুই কালই যাস কিন্তু সকালে, বই-গুলি বেচে আনা চাই। যদি কিছু বেশি থাকে দু একটা নতুন বই আনিস।

সারা রাত সৌম্যর শিয়রে ব'সেই কাটাতে হয়। ওর অবস্থা ভালো নেই।

সকালবেলা বইগুলি ধামায় করে' নিয়ে যাই দোকানে। বেশি দাম দেয় না। নিজের থেকে কিছু দিয়ে টাকার সংখ্যাটা যথেষ্ট রকম ভদ্র করে' যাই দিদির সন্ধানে।

দিদি নেই। কাল রাতেই চলে' গেছে। এক কাপড়ে। হতভাগ্য শিশুর মতো ঘরটা কাঁদ্‌ছে।

ওর একটুও তর্ সয়নি, রাতের অন্ধকার ওকে ডাক দিয়েছে। দু' বছর পরে ওদের এবার প্রথম মিলন হবে, যা ওরা এতকালের জীবন ধরে' চেয়ে এসেছে, নিজেদের সমস্ত লাঞ্ছনার বদলে বিধাতার কাছে বর চেয়েছে,—কিন্তু এত দিনের তপশ্চারণের পর মিলনের এ কি বেশ! এর জন্য এত প্রতীক্ষা!

ছেলেটি যেন বেঁচে ওঠে, দিদি যেন ওকে গিয়ে দেখ্‌তে পায়,—মনে মনে বল্লাম। আকাশের তারা সেই কথা শুন্‌ল।

কিন্তু মাঝরাতে দোরের গোড়ায় তেম্‌নি কান্না শুনি কেন? পুত্‌লিকে শুধোই—পুত্‌লি, দিদি কি ফিরে এল? ছেলেটির দেখা কি পেল না? ও কি নেই? না আবার ওকে তাড়িয়ে দিলে ওরা?

দু' জনে লণ্ঠন নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসি। কিন্তু কই, কেউ নেই ত'! মনে হয়, এ যেন এই বিরহী পাড়াটার কান্না। যাবার সময় এখানকায় আকাশে দিদি তার কান্নাটি রেখে গেছে।

ছেলেটি যেন বেঁচে ওঠে, দিদি যেন ওকে গিয়ে দেখ্‌তে পায়,—আবার প্রার্থনা করি।

পুত্‌লিকে বলি—এক্‌জামিন খুব কাছে এসে পড়েছে। আমি মেসে যাচ্ছি, এবারে অনেকগুলি টাকা দরকার। কি বল্, দিয়ে ফেলি এক্‌জামিনটা?

ও বলে—নিশ্চয়ই! টাকার জন্য ভেবো না, সে হয়ে যাবে 'খন। মেসে যাও কিন্তু জলখাবারটা দোকানে এসেই খেয়ে যেয়ো। আমি না হয় কোন বাড়ীতে বাড়্‌তি সময় ঝি-গিরি করব।

মৈত্রেয়ীদের বাড়ী যাই। মৈত্রেয়ী পা দুলিয়ে দুলিয়ে গুন্‌গুন্ করে' পড়ছে।

আমাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে উৎফুল্ল হয়ে বল্লে—এসেছ,—কি ঘেমে এসেছ একেবারে, মুখ একেবারে মাটির মতো হয়ে গেছে। এখন জল চাও এক গ্লাশ!—বাস্তবিক, তোমাকে এবার থেকে দস্তুর মতো শাসন করতে হবে। কি শাসন? পিঠে চড় মারব, কথা কইব না, বেরিয়ে যাবার সময় দরজার দু' ধারে দু' হাত মেলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাক্‌ব।

বলে আর ওর শাড়ির আঁচল দিয়ে আমার মুখের ঘাম মোছে।

আমার হাত ধরে' ওর চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলে—এবার লক্ষ্মী হাবা ছেলেটির মতো জিরোও খানিক,—বাস্তবিক তোমাকে নিয়ে আর পারি না,—আমি হাওয়া করছি। তারপর স্নান করে' খেয়ে দেয়ে পাটি বিছিয়ে মেঝের ওপর দু'জনে মিলে পড়া যাবে, দান্তে-টা আজই তৈরী ক'রে ফেল্‌ব।

বলি—আমি কি খেয়ে দেয়ে তোমার সঙ্গে পড়তে এসেছি নাকি?

—আচ্ছা না হয় গল্পই করা যাবে সমস্তক্ষণ। যদি ঘুম পায়! বেশ, ঘুমিয়ে পড়ব,—পাটি ত' পাতাই থাক্‌বে। আমার ঘুম পেতে দেখে তোমারো তখুনি ঘুম পাবে না আশা করি। তুমি গল্পই বলে' চ'লো—আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গল্প শুন্‌ব।

বলি—এইমাত্র গোবিন্দর কাছ থেকে আস্‌ছি। ওর পড়া শুনে এলাম।

ও আমার চুলে আঙুল বুলোতে বুলোতে বলে—হ্যাঁ, উনি প্রায় রোজ সন্ধ্যাবেলাই এখানে আসেন,—প্রায় দু' হাজার পাতা নোট টুকেছেন.—আমিও ওঁর থেকে চারশো পাতা টুকে নিয়েছি। কি অসাধারণ মুখস্ত করতে পারেন, আর কি সুন্দর হাতের লেখা। অনেক প্রফেসারের থেকে ওঁর পাণ্ডিত্য বেশী,—এ কথা আমি জোর ক'রেই বল্‌তে পারি। তারিখগুলি পর্য্যন্ত সব মুখস্ত; কবে, কে, কোথায়, কি, কেন,—কিছুই যেন ওঁর অজানা নেই। সত্যি, তুমি আমাকে মাপ কোরো, আমি ওঁকে ভুল বুঝেছিলাম প্রথম। কিন্তু তোমাকে দেখেই চিনে ফেলেছিলাম সব, প্রথম দিনেই তুমি পালিয়ে গেলে। তুমি পালিয়ে যাবারই ওস্তাদ।

মুখে বলে বটে, কিন্তু যেন বিশ্বাস করে না,—এম্‌নি

ভাবে গলার কাছে হাত রাখে। ওর হাতখানা গালের কাছে টেনে আনি।

বলি—গোবিন্দর পড়া শুনে এলাম,—সে কি পড়া! চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ ক'রে ফেলেছে—যেন হাজার ভল্ট্-এর এঞ্জিনের হুঙ্কার। ও যেন কণ্ঠস্বর নিয়েই দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে, কানে আঙুল দিলে পর্য্যন্ত সেঁধোয়। আর, কি খাট্‌তেই যে পারে,—বিকেলে বেড়াতে যাবে তাও হাতে বই নিয়ে, ওর চোখ দুটো আর নেই। আমি শুধু শুধু পড়্‌তে এসেছিলাম,—কিছু হোল না।

—আমারো না। আমার ভারি ভয় করে।

—তোমার আবার কি ভয়? কোন রকমে আটটা দিন কিছু অন্ততঃ লিখে এসে প্রফেসারদের বাড়ীতে গিয়ে গিয়ে তাদের চেয়ারে দিন কতক দয়া ক'রে ব'সে এলেই হোল,—ফার্ষ্ট ক্লাশ। তোমার আবার কি ভয়! সে দিন ত' বোস বল্‌ছিলেন যে, তার এত বৎসরের টিউটোরিয়াল-এ তোমার মতো এমন চোস্ত কাগজ দেখেন নি। তোমার টিউটোরিয়াল্ নেবার দিন থেকেই উনি গোঁফ কামিয়েছেন। তোমার কিসের ভাবনা?—হ্যাঁ, ভালো কথা, তুমি গোবিন্দকে তোমার কন্‌ভোকেশান্-এর ফটোটা দিয়েছ?

—হাঁ, এত করে' চাইছিলেন।

—বেশ করেছ। ও সেই ফটোটা ওর টেবিলের সাম্‌নে দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে। ও একটা ডুবো গাধাবোট ছিল, তুমি এসে তাতে পাল লাগিয়ে দিলে, ও একটা ঝুনো বাঁশ ছিল, তুমি ওকে বাঁশী বানালে।

—কি যে বল যা তা, কক্‌খনো কথা কইব না। তুমি ভারি—, এ কি উঠ্‌ছ যে?

—সত্যি। ও যেন কি একটা অসাধ্য সাধন করবে; তুমি কোন দিন আগ্নেয়গিরি দেখ নি, না? ও তাই। আমি এবার যাই, তুমি লক্ষীমেয়ের মত পা দুলিয়ে দুলিয়ে আরো খানিকক্ষণ পড়।

—না না না, যেয়ো না কিন্তু, তা হলে ভারি রাগ কর্‌ব। কেন যাবে শুনি এই রোদ্দুরে? শরীরটাকে মাটি করলেই হোল? যেয়ো না বল্‌ছি, আমি সব নোট ছিঁড়ে ফেল্‌ব তা হ'লে।

—পাগল! নোট্ ছিঁড়ে ফেল্‌বে মানে? গোবিন্দ তোমার জন্য যা স্বার্থত্যাগ ও কষ্টস্বীকার করছে, তার জন্য ওর কাছে তোমার চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত। উচিত ঐ নোটগুলো পূজো করা। বোকা মেয়ে। বসো, পড় গুন্‌গুন্ করে'।

বেরিয়ে যাই, ও রাগ ক'রে দরজাটা ঝনাৎ ক'রে বন্ধ ক'রে দেয়।

পরের দিন ফের কেঁদে-কেটে এক চিঠি লেখে। লেখে, —নোট পূজো করছি বটে, কিন্তু তুমি এস।

বিরাট গৃহতল,—দু'শ ছেলে ডেস্ক-এর ওপর মুখ গুঁজে পরীক্ষা দিচ্ছে,—বিস্তীর্ণ প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা। এ যেন সৌম্যের সেই গুদাম-ঘরটা, - সবগুলি মস্তিষ্ক টগ্‌বগ্ ক'রে ফুট্‌ছে, এ যেন প্রকাণ্ড একটা কারখানা, এ যেন ভাষার মঞ্জরীতে বিকশিত হবার জন্য কোটি কোটি ভাব-ভ্রূণের অসহ নিদারুণ সংগ্রাম!

কি লিখ্‌ব, ভেবে কিছুই কিনারা পাই না,—চেয়ে চেয়ে দেখি,—একটা ঘুমন্ত পুরীতে এতগুলি ছেলে মশাল হাতে কি যেন অনুসন্ধান করছে, পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করে, কি চায়, কেই বা জানে।

হয়ত একটি সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন,—পুত্রপরিবার, শোক দুঃখ রোগ,—মৃত্যু।

গোবিন্দ একটা দেখবার জিনিস, ও একটা বয়লার ভূমিকম্পের সময়কার পৃথিবী, তারা ফোট্‌বার আগেকার আকাশ। পাতার পর পাতা মুহূর্ত্তে লিখে ফেল্‌ছে, ওর কলম পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো টগ্‌বগিয়ে ছুটেছে - বেদুইনের ঘোড়া। ওর টেবিলের সাম্‌নে মৈত্রেয়ীর যে ফটো টাঙানো আছে, সে কথাও হয়ত এখন আর ওর মনে পড়্‌ছে না,— কে জানে, হয়ত বা বেশি ক'রেই পড়্‌ছে।

আরেক জনের কথা মনে পড়ে,—ভাঙা ক্যানভাসের ইজি চেয়ারটায় শুয়ে মৃত্যুকে ডাক্‌ছে।

মৈত্রেয়ী ঐ দূরে ব'সে আছে, চাদরটা পিঠের ওপর দিয়ে এমন ভাবে জড়িয়ে নিয়েছে যেন ভয় পেয়ে গেছে।

ফাঁকা খাতাটা 'সাব মিট্' করে মৈত্রেয়ীর পাশ দিয়ে বোঁ

ক'রে বেরিয়ে গেলাম বাইরে।

বারান্দায় আমার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কে বল্লে—একটা ট্যাক্সি ডাক।

ট্যাক্সি ডাকলাম। মৈত্রেয়ী আমার গা ঘেঁষে ব'সে বল্লে—ছাই একজামিন। কি হবে আমাদের পাশ ক'রে? বাবাঃ, প'ড়ে প'ড়ে বুড়ো হয়ে গেলেও আমার সাধ্যি নয়, তোমারো নয় হয়ত। আমাদের ওরা সব কি রকম দেখ্‌ছিল,—যেন আমরা—

কথা শেষ কর্‌বার আগেই হেসে ওঠে। গায়ের থেকে চাদরটা সরিয়ে নেয়।

বলে—আজ পাঁচটা পর্য্যন্ত ট্যাক্সিতে ঘুরে আমাকে নিয়ে তোমার বাড়ী যেতে হবে। আজ রাত্রেই বাবাকে বল্‌তে হবে কিন্তু।

—কি বল্‌তে হবে? বিয়ের কথা?

আমার কাঁধের ওপর মুখ রেখে বল্লে—আরো। দান্তের যেমন বিয়াত্রিচ্, পেত্রার্কের যেমন লরা, কাতুল্লুসের যেমন লেস্‌বিয়া, মিকালেঞ্জেলোর যেমন ভিটোরিয়া কলোনা,— তেমনি আমি তোমার। তোমার।

অবগাঢ় ছুটি চোখ, দ্রাক্ষালতার মতো দেহ, কথায় কি করুণা!

ওই যেন আমার নীল ফুল, নীল পাখী, নীল নভতল!

সাম্‌নে যে ফাঁকা পথ দেখে সেই পথেই ট্যাক্সি ছোটে, ও ওর ছুটি ব্রততীপেলব বাহু আমার গলায় জড়িয়ে দিয়ে ওর বুকের কাছে আকর্ষণ ক'রে বলে—সত্যি বল, বলবে আজ? তার জন্যই ত' তোমাকে দেখে 'হল্' থেকে পালিয়ে এলাম। আমার পাশ ক'রে কোনো কাজ হবে না। তুমি মুখ ও রকম করে' রয়েছ কেন? আজ হাস্‌তে বুঝি ভুলে গেলে একবারে,—তোমার এত কাছে আমি—

বলি—তুমি কি হঠাৎ ক্ষেপে গেলে মৈত্রেয়ী? এক-জামিন দিতে এসে তোমার মাথার ঠিক নেই।

—ঠিক নেই? মাথার ঠিক না থাক্‌লে তোমার বুকের ওপর কক্ষনো এম্‌নি করে' মাথা রাখতাম না। তোমার ছুটি পায়ে পড়ি,—তোমার ছুটি পা আমাকে দাও। তুমি কি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নমালার মতোই নিষ্ঠুর, নিরুত্তর?

—কিন্তু মৈত্রেয়ী, বিয়াত্রিচ্‌কে কি দান্তে বিয়ে করেছিল?

—নাই বা করুক, কিন্তু আমি তোমার ব্যারেট, তোমার মেরী, তোমায় 'ডার্ক-লেডি'।

—এ অসম্ভব প্রলাপ বোকোনা মৈত্রেয়ী। কি চাও তুমি আমার কাছে?

—কিই বা না চাই? তোমার কাছে চাই প্রেম, সন্তান, সংসারজীবন,—তোমার পায়ের ওপর মাথা রেখে উদার মৃত্যু। আরো চাই, আরো চাই—কি চাই, সত্যিই বলতে পারছি না।

—গ্রেচেনের বুকে বুক রেখে ফাউষ্টের ক্ষুধা মেটেনি মৈত্রেয়ী, তা ত তুমি জান। আমাকে ও রকম ভাবে সত্যি ডেকো না। আমার কত কাজ, আমার বিশ্রাম করবার সময় নেই এতটুকুও।

মৈত্রেয়ীর মুখ সত্যিই দ্য ভিঞ্চির আঁক্‌া মতো, লা গায়োকোণ্ডার মতো অপরূপ। মুখ বিবর্ণ করে' বলে—কি কাজ শুনি?

—ধর, এই দেশের কাজ—

—কেন, আমি তোমাকে সাহায্য কর্‌ব, তুমি যদি বেদে হও আমি বেদেনি, তুমি যদি দাঁড় টান আমি হাল ধ'রে থাক্‌ব, তুমি যদি লাঙল চালাও আমি মাটি নিড়োব, তুমি যদি কামার হয়ে লোহা পেট, আমি আমার আঁচল ভিজিয়ে তোমার পিঠের ঘাম মুছে দেব—

—দান্তের মধ্যে তা হলে কোনো কাজই এগোবে না। এবার বাড়ী ফিরে চল মৈত্রেয়ী। তুমি বৃথা দুঃখিত হয়ো না। আজ রাতটা ভালো করে' ঘুমিয়ে কাল সকালে উঠেই তোমার বোকামি বুঝতে পেরে তুমি হাস্‌বে। আমি একটা কি? চালচুলো নেই, মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই আমার মধ্যে স্থিরতা নেই, সামঞ্জস্য নেই। আমি কাউকে এত ভালোবাসতে শিখিনি মৈত্রেয়ী, যে, সারাজীবন তাকেই ভালোবাসব।

মৈত্রেয়ী আর কোনো কথা কয় না, চাদরটা তেম্‌নি গায়ে এঁটে দেয়, হাটুর ফাঁকে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদে।

ট্যাক্সি ফিরে চলে।

বাবা বলেন—একজামিন দিতে পারিস্ নি, তাতেই এত কান্না? তুই হলি কি মা? ভালোই ত' হল, আরো মাস ছয়েক নিশ্চিন্ত থাকতে পার্‌বি,—খুব ক'দিন এখন স্ফূর্ত্তি করে' নে না।

মৈত্রেয়ী বিছানায় লুটিয়ে পড়ে' কাঁদে। ও চায় প্রেম, ও চায় সন্তান, ও চায় সংসারজীবন।

তারপরে একদিন রেজাল্ট বেরোয়। গোবিন্দ একেবারে ডগায় এসে উঠেছে—ফাষ্ট ক্লাশ ফাষ্ট। সবাই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছে,—একটা পুঁচকে, খোট্টা-মাফিক ছেলে, বই-মুখস্ত-করা পড়ুয়া,—সে কিনা সবাইকে ডিঙিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে গেল! অদ্ভুত না?

গোবিন্দর সঙ্গে দেখা। বল্লে—মৈত্রেয়ী নিমন্ত্রণ করে' পাঠিয়েছে। পাশ করতে না করতেই ব্যাঙ্কে চাকৃরি পেয়ে গেলাম ভাই। খুব ভালো ষ্টার্ট, কয়েক বছরেই হাজারে দাঁড়িয়ে যাবে,—একের পিঠে তিন শূন্য।

উৎফুল্ল হয়ে বলি—বেশ। খুব খুশী হলাম গোবিন্দ। বিয়ে থা করছ ত'?

ও বলে—এই মাসেই জয়েন্ করতে হবে, পাট্‌নায় ঠেলেছে প্রথম। সব গোছগাছ করে' নিতে হবে এরি মধ্যে। কিছু টাকা জমাতে পার্‌লেই ভবানীপুরের দিকে ছোটখাটো একটা বাড়ী করে' ফেল্‌ব—তোমার ত' খুব ভালো আইডিয়া আছে এ সম্বন্ধে,—মৈত্রেয়ী বলেছে একতলার ওপর ছোট্ট একটি ঘর তৈরী কর্‌তে,—এম্‌নি বলেছে। চাকৃরিটা পেলাম বলে' ছোটভাইটাকে ইঞ্জিনিয়ারিঙ্ কলেজে দিতে পার্‌ব।

ওর কথাগুলি যেন ফুলঝুরি। ও যেন দৌড়ে চলে,—ওকে সত্যিই কত সুন্দর, সাবলীল সমৃদ্ধ দেখাচ্ছে। গায়ে তসরের পাঞ্জাবী,—তাঁতের কাপড়,—হাতে একটা ষ্টিক্ পর্য্যন্ত। ও যেন রূপকথার রাজপুত্র। রাক্ষসপুরী থেকে বেরিয়ে এসেছে। চমৎকার ওর চলা।

সকালবেলাও সৌম্য বল্‌ছিল—ঐ নতুন বইটা থেকে কয়েক পাতা পড়ে' শোনা কাঞ্চন। বড্ড অস্থির লাগছে। ডাক্তার এসে আশা নেই বলে' গেছে। যেটুকু ওরা বল্‌তে পারে।

দুপুর বারোটা থেকে প্রলাপ সুরু হয়েছে। সমস্ত বাড়ীটাতে কেউ নেই যে আমাকে সাহায্য করে, কেউ আপিস্ কেউ দালালি করতে বেরিয়েছে। শুধু চুপ করে' চেয়ে থাকার চেয়ে বেশি কি আর করা যাবে? কিছু একটা না করলে স্বস্তি পাই না বলে' মাঝে মাঝে চাম্‌চে করে' একটু একটু অষুধ, গরম দুধ ওর দাঁতের ফাঁক দিয়ে ঢেলে দিই, গিল্‌তে পারে না। হাতে পায়ে গরম জলের ফোমেণ্ট করি—একেবারে একা।

নীচে মেঝের ওপর অনেকক্ষণ বিছানা করে' রেখেছি, কিন্তু শোয়াবার উপায় নেই। ও ওর অনেকদিনকার পুরোনো ভাঙা চট্, ছেঁড়া ইজি-চেয়ারটায় শুয়েই মরণকে আলিঙ্গন-করবে।

ও হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—আমাকে ওরা সবাই নিতে এসেছে, কাঞ্চন। পাজীটা, চুপ করে' আছিস্ কেন, সবাইকে ডাক্, শাঁখ বাজাক্, ওদের বস্‌বার জায়গা করে' দে, হতভাগা। কত যুগের কত কবি, কত লেখক, কত উপোসী,—মিছিল করে' এসেছে। অনেকের মুখ চিনি না, কিন্তু সবাই আমাকে বলছে আত্মীয়, বন্ধু, ভাই।—আমার হাত ধরে' একটুখানি এগিয়ে নিয়ে যা, ওদের হাতের সঙ্গে হাত মেলাতে দে—

খানিক বাদে আবার বলে—মা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে স্বপ্ন দেখি। ঐ যাঃ, ছোট বোন্‌টা জলে পড়ে' গেল, লাফিয়ে পড়্ কাঞ্চন। আমার একটিমাত্র নিষ্পাপ বোন্—ওর পিঠেও ওরা চাবুক মার্‌ছে? সত্যি করে' বল্ কাঞ্চন সেই ছেলেটি সেরে উঠেছে ত? দিদি ওর দেখা পেয়েছে?

—পেয়েছে বৈ কি। তুই দেখতে পাচ্ছিস্ না?

—না। আমার সব অন্ধকার হয়ে আস্‌ছে, আমি কোথায় যেন চলেছি, কতদূরে। সেখানে একটি তারার কণিকাও নেই। আমাকে জোরে টেনে ধর্ কাঞ্চন, যেতে দিস্ না।

ওকে আর রাখা যাবে না। গা হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আস্‌ছে।

কোলাহল ও আর্ত্তনাদ শুনে দোতালার নববধূটি দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে—সলজ্জ প্রতিমার মতো। মৃত্যুর মতো।

সৌম্য শেষবার] বলে' উঠল—চিতায় শোয়াবার সময় আমার মাথার তলায় এই লাল বইটা দিস্ কাঞ্চন। আর এই লাইব্রেরিটা—তুই ত' একে ঘাড়ে বয়ে বেড়াতে পারবি না, কাউকে দিয়ে দিস্ আমার নাম করে'—

চেঁচিয়ে উঠি—সৌম্য, সৌম্য!

সৌম্যর জবাব কানে এসে পৌছোয় না। শুধু খোলা জান্‌লা দিয়ে সন্ধ্যাতারা মাটির বুকে ওর ক্ষীণ সান্ত্বনাটি পাঠিয়ে দেয়। বিকেলের হাওয়া ব্যাকুল হয়ে ফেরে।

সৌম্যর কথা রাখলাম। গোবিন্দ ও মৈত্রেয়ীর বিয়েতে ওর লাইব্রেরিটা গোবিন্দকে দিয়ে এসেছি।

সমাপ্ত

কবির কাব্য

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

সন্দেহ হয় পেয়েছ বন্ধু কবির্ কু-অভ্যাস,—
যত দুখ পাও মিঠে সুরে গাও দুঃখেরি ইতিহাস।
কবির সে দুখ-গান
শুনি দুটি কানে যিনি প্রাণে প্রাণে যত বেশী সুখ পান
তিনি তত অনুরক্ত রসিক ভক্ত সমেজদার।
কবির বুকের দুখের কাব্য,—ভক্তে চমৎকার।

মেঘে মেঘে বাজে গুরুক্রন্দন,—বনে বনে শিখী নাচে;
বুক ফেটে তার ঝরে আঁখিজল,—তৃষিত চাতক বাঁচে।
জ্বালিয়া জ্যোৎস্না-মরীচিকা বুকে মরুচন্দ্র সে জাগে,
পিয়াসী চকোর তাপিত পাপিয়া তারি পাশে সুধা মাগে।
মূক কাননের মনের আগুন ফুটিলে ফাগুন-ফুলে
দিকে দিকে দিকে রসিক ভ্রমর স্তব-গুঞ্জন তুলে

মহাসিন্ধুর প্রণয়ের টানে নদীপথে কেঁদে যায়,—
নিরুপায় জেনে প্রতি তটতৃণে আঁকড়ি ধরিতে চায়।
যত বেলা উঠে তপনের ফুটে বহিরন্তর দাহ,
সোহাগী কমল ডুবাইয়ে গলা কহে 'প্রভু ফিরে চাহ'।
দিনান্তে যবে ব্যর্থ সে রবি অস্তশিখর 'পরে
ছেঁড়া মেঘে পাতি মৃত্যু-শয়ন রক্তবমন করে,
উঠে ত্রিভুবন ভরিয়া তখন বৃথা গায়ত্রী-গান ;
রাত্রি আসিয়া ঢেকে দ্যায় সেই অযাচিত অপমান!
সেই রাত্রির তারায় তারায় হাসে অসংখ্য জ্বালা,
আঁধার আঁচলে নিশার অশ্রু, ঊষার শিশির মালা!

এমনি বন্ধু ভুবনে ভুবনে চলিতেছে লুকোচুরি,
অন্তর-তারে ব্যথার কাঁপন সুরের মোড়কে মুড়ি।
প্রকাশিতে নয়,—করিতে গোপন প্রাণের গভীর ব্যথা,
ওগো মহাকবি, রচিয়াছ বুঝি এই মহা-উপকথা ?
তথাপি বন্ধু, নিঠুর সত্য নিখুঁৎ পড়ে নি ঢাকা
ফুলে ফুলে বুঝি তোমারি দীর্ণ হৃদয়রক্ত মাখা!
চোখে চোখে ঝরে কার যে অশ্রু বুঝেও বুঝি নে কেউ,
বুকে বুকে ভাঙে সে কোন্ অতল বুকের দুখের ঢেউ ?
কণ্ঠে কণ্ঠে কে কণ্ঠহীন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠে ?
মরণে মরণে তিল তিল করি কোন্ মহাপ্রাণ টুটে ?

আছে গো আছেও সুখ ;—
খদ্যোৎ বিনা দেখা যাবে কেন বনের আঁধার মুখ ?
মাঝে মাঝে মৃগতৃষ্ণিকা বিনা কে মাপে মরুর তৃষা!
আলেয়ার আলো নহিলে পান্থ কেমনে হারায় দিশা ?
বন্ধু, বন্ধু, হে কবিবন্ধু,—উপমার ফাঁস গুণি,
আসল কথাটা চাপা দিতে ভাই, কাব্যের জাল বুনি।

দীপক

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

১০

নিজ পরিবারের এই পরিবর্ত্তন, নিজ দেহের পরিবর্ত্তন দীপকের মনকে এক নূতন ভাবে সচেতন করিয়া তুলিল।

মাঝে মাঝে চলিতে ফিরিতে ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া দীপক নিজের চেহারা দেখে। দেখিতে দেখিতে তাহার নিজেকে নিজেরই খুব ভাল লাগে। তাহার দেহের কোথায় কোন্ দাগটা, মুখে কোথায় কোন্ তিলটি আছে দীপকের একেবারে জানা হইয়া গেল। তাহার সুগোল সুগৌর হাতখানি কোথায় কখন কেমন করিয়া রাখিলে তাহাকে ভাল দেখায় তাহা সে বেশ জানিয়া লইল। শিশুকাল হইতেই ছোট বড় সকলের মুখে সে শুনিয়াছে সে সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর! এতদিন এ কথাটা তাহার মনে বড় লাগে নাই, কিন্তু এখন নিজের মুখে চোখে এক অপূর্ব্ব উজ্জ্বল যৌবনের দীপ্তি দেখিয়া তাহার নিজেরও বিশ্বাস হইল, সে সুন্দর।

সঙ্গীহীন তাহার জীবন। বাড়ীতে আসিয়া অবধি সে আরও বন্দী হইয়াছে। বড়দার আদেশ—স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিয়া আর কোথাও বাহিরে যাইতে পাইবে না! পাড়ার সঙ্গীরা কোলাহল করিতে করিতে খেলার মাঠের দিকে যায়, দীপকদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া কেহ কেহ বা শিষ দেয়, কিন্তু দীপক গাছের আড়ালে আড়ালে থাকিয়া তাহাদের নিকট হইতে লুকাইয়া ফেরে। তাহার বড় লজ্জা করে। এত বড় হইয়াছে, কেমন করিয়া সে ছেলেদের কাছে বলিবে তাহার বাড়ীর বাহিরে যাওয়া নিষেধ। একদিন নেহাৎ সাহস করিয়াই বড়দার কাছে খেলিতে যাইবার অনুমতি চাহিয়াছিল, বড়দা বলিয়াছিলেন, না, বাইরে গিয়ে যা-তা ছেলেদের সঙ্গে খেল্‌তে হবে না। বাড়ীতে খেল। সেইদিন হইতে দীপকের মনে কেমন একটা ধিক্কার আসিল। সে শুনিয়াছে তাহারা বড়লোক, কিন্তু এমন বড়লোক হইয়া লাভ কি? আর তাহা হইলে তাহার মা-ই বা কেন সেদিন রাত্রে তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, দীপক, ভাল করে' পড়াশুনা কর, নিজের ভার নিজে নিতে হবে। এখন আর আমাদের সেদিন নাই!

একলা খেলিতে ভাল লাগে না, তাই বাগানে বাগানে ঘুরিয়া দীপক বিকাল বেলাটা কাটায়। বাগানটি এখন প্রায় ঘন বনের মত হইয়া উঠিয়াছে। গাছগুলি বড় হইয়াছে, সূর্য্যের আলো সে পত্র-পল্লব ভেদ করিয়া আর বড় বাগানে প্রবেশ করিতে পারে না। সূর্য্য ডুবিবার আগেই বাগানের ভিতরটা অন্ধকার হইয়া যায়। দীপক সন্ধ্যা অবধি সেই অন্ধকারে একা ছায়ামূর্ত্তির মত ঘুরিয়া বেড়ায় আর ভাবে মায়ের সে দিনের কথা।

এমনি করিয়া দুই বৎসর ঘুরিয়া গেল, দীপকের এটুকু স্বাধীনতাও লাভ হইল না। নিত্য নিয়মিত কাজের মধ্যে তাহার দিন রাত্রি কাটিয়া যায়। বাহিরে যাওয়ার স্বাধীনতা তবু পাইল না।

বাড়ীতে পাড়ার অনেক মেয়েরা তাহাদের বাগানের পেছনের দরজা দিয়া বেড়াইতে আসে। হাসি কলরবে

তাহারা বাগান মুখরিত করিয়া সন্ধ্যার সময় নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যায়, দীপক ভাবে, এরাও ত বাইরে আসিতে পায়।

বাগানের পাঁচীলের ধারে ধারে আনারস গাছের ঝাড়। একদিন সন্ধ্যার সময় ঘুরিতে ঘুরিতে দীপক শুনিতে পাইল, একটা ছাগল যেন কোথাও হইতে বড় করুণ শব্দ করিতেছে। দীপক শব্দ অনুসরণ করিয়া কিছু অগ্রসর হইয়া দেখিল, অল্প অন্ধকারে দুইটা চোখ যেন জ্বল জ্বল করিতেছে। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল একটা প্রকাণ্ড সাপ ছাগলটাকে বেড় দিয়া ফেলিয়াছে। ছাগলটা কাতর স্বরে তাই চীৎকার করিতেছে। দীপক বুঝিতে পারিল, আর কিছুক্ষণ থাকিলেই ছাগলটার প্রাণ শেষ হইবে। আর কিছু ভাবিতে না পারিয়া সে ছুটিয়া মালীর ঘরের দিকে গেল। একটা বড় কাঠের খুঁটি লইয়া আসিয়া সে উন্মত্তের মত সাপের গায়ের উপর আঘাত করিল। ভয় বা বিবেচনা তাহার তখন যেন কিছুই ছিল না। ছাগলটা একটা দারুণ চীৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, কিন্তু চোখের পলক না ফেলিতে দীপক দেখিল সাপটা ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করিতে করিতে তাহারই সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। নিমেষের মধ্যে খুঁটিটা ঘুরাইয়া সে সাপটাকে লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিল। সে প্রায় পাগলের মত হইয়া গিয়াছিল। সাপটা কোমর ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যখন নিষ্ফল আস্ফালন করিতেছে—তখন দীপকের খেয়াল হইল আর সাপটা চলিতে পারিবে না। সে সেই মুহূর্ত্তে ছাগলটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া মালীর কাছে গেল। ছাগলটা তাহাদের নিজেদেরই। সন্ধ্যার সময় ছাগলটা বাহিরে রহিয়াছে দেখিয়া মালীর ত চক্ষু স্থির। বড়বাবু জানিতে পারিলে আজ আর রক্ষা নাই! কিন্তু দীপক তাহাকে কিছু ভাবিতে দিল না। ছাগলটার মুখে চোখে দুই জনে মিলিয়া জল ছিটাইতে ছিটাইতে ছাগলটা যেন চেতনা ফিরিয়া পাইল। দীপক ভাবিয়াছিল, বুঝি বা ছাগলটারও কোমর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু মালী একটু সাহায্য করিতেই ছাগলটা উঠিয়া দাঁড়াইল। ঐ ক্ষুদ্র পশুর চোখে তখনও একটা ভীতি যেন পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। দীপক এইবার মালীকে সকল ঘটনার কথা খুলিয়া বলিল। মালী দীপককে চিনিত! বুঝিল আজ একটা মহা সর্ব্বনাশ হইয়া যাইত হয় ত। সে তাড়াতাড়ি লণ্ঠন জ্বালিয়া লোহার শাবল লইয়া দীপকের সঙ্গে চলিল। দূর হইতেই তখনও সাপের ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ শুনা যাইতেছে। সাপটা বুকের উপর দাঁড়াইয়া উঠিয়া মাটিতে বার বার মুখ ঠুকিতেছে। দীপকের বড় আনন্দ হইল। সে মালীকে বলিল, একটা দড়ি নিয়ে এস! কথা না রাখিয়া উপায় নাই। মালী দড়ি লইয়া আসিল। ফাঁস তৈরী করিয়া সাপের মাথা গলাইয়া দড়িটা ফেলিয়া দিল। তারপরই এক টান্। আর কথাবার্ত্তা নাই। দীপক দড়ি ধরিয়া হড় হড় করিয়া টানিতে টানিতে সাপটাকে একেবারে ভিতর বাড়ীর উঠানে নিয়া ফেলিল। বড়দা প্রভৃতি সকলেই তখন বাড়ী ফিরিয়াছেন। উঠানে সবাই জড় হইলেন। দীপককে ত যতদূর গালাগাল দিবার সকলেই দিতে লাগিল। কিন্তু দীপকের মনে একটুও কষ্ট বা ভয় হইল না। সাপটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, এক এক বার নুইয়া পড়ে, দীপক তাহাকে লাঠির খোঁচা দিয়া ক্ষেপাইয়া তোলে। আর সবাই হাঁ-হাঁ করিয়া ওঠে। দীপকের সে দিকে খেয়াল নাই। দীপক সাপটাকে লইয়াই পাগল! দীপকের মায়ের আদেশে মালীটা এক ঘায়ে সাপটাকে মারিয়া ফেলিল। তারপর বড়দার হুকুমে বাহিরের বাগানে সাপটার দাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

কিন্তু সেই দিন হইতে দীপকের বাগানে বেড়ানও নিষেধ হইয়া গেল।

আবার বন্দী! তাহার মানসদৃষ্টি আজ বাহিরের সমস্ত জিনিষ সমস্ত অবস্থাকে জানিয়া লইতে চায়, কিন্তু দুর্লঙ্ঘ্য নিষেধের প্রাচীর চারিদিকে। সে রাত্রে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারে না। অন্তরের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, দেহের সমস্ত শক্তি যেন পুঞ্জীভূত হইয়া তাহাকে দিনে দিনে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতেছে। যৌবন আসিয়াছে, সে তাহার সাড়া পাইয়াছে। কিন্তু কোনও উপায় নাই। নিষেধ-

বিধির আবেষ্টনে সে নিজেরই মধ্যে নিজে ফাটিয়া পড়িতে চায়। শুধু পড়িয়া, পাশ করিয়া তাহার ভাল লাগে না। সে চায়, একটা কিছু কাজ, যে কাজের মধ্যে সে সমগ্র প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়া আনন্দ পাইবে। নিঃসঙ্গ এই জীবন। সে বড়বাড়ীর ছেলে, তাহা ভিন্ন মানুষের কাছে তাহার আর কোনও পরিচয় নাই। বড়দা চাকরী করেন, চাকরী করিয়া ঘরে ফেরেন। এক হিসাবে তাঁহার দিন বেশ কাটিয়া যায়। মেজ্‌দা পড়িতেছেন, কলেজে। লেখাপড়া ও বাড়ীর বাজারপত্র করা—তাঁহারও দিন বুঝি বেশ কাটিতেছে। কিন্তু দীপকের কেন দিন কাটিতে চাহে না।

এমনি দিনে দীপকের বিশ বৎসর বয়সে তাহার বড়দা, পরিবারের একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি, সাংঘাতিক পীড়ায় পৃথিবী হইতে বিদায় লইলেন।

দীপক আরেকবার শ্মশান দেখিল। চিতার আগুন আকাশ স্পর্শ করিতে চাহে। দীপক দেখিয়া দেখিয়া ভাবিতেছিল, মৃত্যুর পর যদি আর কোনও চিহ্নই মানুষের না থাকে মানুষ তাহা হইলে এত স্বচ্ছন্দে জীবনটা কাটাইয়া দেয় কেমন করিয়া! জীবনকে লইয়া কি তাহাদের কোনও তাড়া নাই!

মা বলিলেন, দীপক, সংসারের কি অবস্থা হো'ল কিছু কি বুঝ্‌তে পারছ?

দীপক উত্তর করিল, বুঝ্‌ছি মা, আমরা গরীব হয়ে গেলাম।

মা বলিলেন, না, শুধু গরীব নয়, নিজেদের খাওয়া-পরার যোগাড় এখন নিজেদের করতে হবে। তোমার মেজ্‌দা পড়ছেন, আর কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর পড়া শেষ হবে। তখন একটা কিছু উপার্জ্জনের উপায় দেখ্‌তে পারবে। কিন্তু—

দীপক বাধা দিয়া বলিল, বেশ ত মা, মেজদা পড়ুন, আমি রোজগারের চেষ্টা দেখি।

মা দুঃখ করিয়া বলিলেন, কিন্তু তোমার পড়া তাহলে বন্ধ হোল।

দীপক হাসিয়া বলিল, তুমি আর কিছু ভেবো না মা। তাই যদি হয়, কি করবে বল? পড়া একজনকে ছাড়তেই হবে।

মায়ের চোখে জল ভরিয়া আসিয়াছিল, আর কিছু বলিতে না পারিয়া মা সরিয়া গেলেন।

দীপক দাঁড়াইয়া উঠিতেই তাহার নিজের দেহের ছায়া আয়নাতে দেখিতে পাইল।

তাহার সর্ব্বাঙ্গ বেড়িয়া আজ শক্তির বিকাশ, অন্তরে আজ কর্ত্তব্যের প্রেরণা। তাহার ভয় কি? এই দেহ, এই শক্তি, এই বুদ্ধি, বৃথা যাইবে কেন? পরিবার তার আপন জন, কিন্তু তারাও তার পর, প্রত্যেকে তাহা হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি। যদি তাহার নিজ শক্তির বলে সে এই কয়জনের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারে! গর্ব্বে, আনন্দে তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। পরিবারের উপর যে একটা অশনিপাত হইল, তাহা তাহার মনেই যেন রহিল না। আজ শুধু তাহার নিজেকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া মনে হইল।

বড়দার শ্রাদ্ধাদি হইয়া গেল। অশৌচাদি পালন করিয়া দীপক যেন মুক্তি পাইল। সে সত্য সত্যই সংসারে একজন!

আত্মীয় পরিজন দলে দলে আসিয়া এই বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া পূর্ব্ব গৌরবের ইতিহাস বলিয়া খেদ করিতে লাগিলেন। দীপকের মাকে সাহস দিতে লাগিলেন। যাহার যে ব্যবস্থা ভাল মনে হইল, সকলেই তাহা শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা হইবে বিশ্বাস করিয়াই প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দীপকের মা নয়নতারা অতীব শ্রদ্ধার সহিত প্রত্যেকের হিতোপদেশ অবনত মস্তকে শুনিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার সেই সংযত উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইল। যাহারা ভাবিয়াছিল, নয়নতারা এতবড় আঘাতে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবেন, তাহারা সকলেই এই সৌম্য মূর্ত্তি বিধবার একান্ত নির্ভর দেখিয়া নিরাশ হইল। কেহ বা পরিবারের বহুপুরাতন বন্ধু, অবস্থা ভাল, বিধবা এতগুলি পরিবার লইয়া বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন মনে করিয়া কিছু টাকাও সাহায্য করিতে প্রস্তাব

করিয়াছিলেন। নয়নতারা উত্তর দিয়াছিলেন, এখন থাক, দরকার হলে আপনাদের কাছেই বল্‌ব।

দীপকের বাবার আমলের বড় বড় সাহেব মুরুব্বীরা কেহ কেহ দীপকের মায়ের নিকট পত্র লিখিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন। কেহ বা প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার যদি কোনও উপযুক্ত পুত্র থাকে, তাহাকে পাঠাইয়া দিলে তাঁহারা তাহার একটা চাকরীর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। নয়নতারা মেজ ছেলেকে দিয়া সকলকেই উত্তর পাঠাইলেন, একটি ছেলে পড়াশুনা করিতেছে, তাহার পড়া শেষ হইলে যদি সে ঐরূপ কোনও চাকরী চায় তাহা হইলে তাহাকে নিশ্চয় তাঁহাদের কাছে পাঠাইবেন।

যাহা কিছু সম্বল ছিল, তাহা দিয়া কয়েক মাস চলিল। মালীটাকে বিদায় দিতে সে যাইতে চাহিল না। সে বলিল, বাকী কয়টা দিন, সে এ বাড়ীতেই থাকিবে। মা যদি অনুমতি দেন তাহলে সে এই বাড়ীতেই, আনাজ তরকারীর বাগান করিয়া নিজের খরচ চালায়। নয়নতারা তাহাতেই সম্মত হইলেন। চাকর বাকর একে একে প্রায় সকলেই বিদায় লইল। এখন আর বাহির বাড়ীতে কেহ বসে না। ঘরটা অন্ধকার পড়িয়া থাকে। ভিতর বাড়ীতেই এখন সকলে মিলিয়া থাকে। প্রাতে নয়নতারা স্বপাক রান্না করেন, ছেলে মেয়েরা সকলেই তাই খায়। রাত্রে কখনও কখনও মাছ হয়। কিন্তু এর মধ্যেও কোনও বিষাদ বা অতৃপ্তির চিহ্ন কাহারও মুখে নাই। নয়নতারা যত্ন করিয়া ছেলেদের খাওয়ান। তাহার পর বড়মেয়ে, বউমা ও নীলাম্বরের মাকে লইয়া নিজে খাইতে বসেন। দুপুরটা কাজকর্ম্মে বা পড়িয়া কাটিয়া যায়। নীলাম্বরের মা'র অন্ধ দুই চোখ বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে থাকে, নয়নতারা তাহাকে বুঝাইয়া বলেন, দেখ না, তোমার দীপু ছেলে দারোগা হবে।

দীপক সারাদিন ঘুরিয়া আসিয়া মা'র সঙ্গে বসিয়া চুপি চুপি কি কথা বলে। দিন কাটিয়া যায়।

মেজছেলের পরীক্ষা, নয়নতারার ভাবনা পাছে ছেলের মনে কোনও দুর্ভাবনা আসিয়া তাহার পড়াশুনায় ব্যাঘাত হয়। দীপকও মাকে বলে, মা, মেজ্‌দাকে কিছু আনতে দিও না। আমি সব ঠিক্ করছি। ওঁর তা নইলে পড়াই হবে না।

কিছুদিন পরে হঠাৎ নয়নতারা মেজছেলে ও দীপককে ডাকিয়া বলিলেন, আমরা এখান থেকে চলে যাব। রজতের ত পরীক্ষা হয়ে গেল, সেই জন্যই এতদিন অপেক্ষা করছিলাম। এইবার চল, অন্য কোথাও গিয়ে আমরা থাকি। বউমারও আর এখানে ভাল লাগছে না। না লাগবারই কথা।

রজত বা দীপক কোনই বাধা দিল না। জিনিষপত্র বাঁধাবাঁধি সুরু হইল। কেবল মাত্র যাহা সঙ্গে না লইলেই নয়, তাহাই লওয়া হইবে। আর সব এ বাড়ীতেই পড়িয়া থাকিবে। মালী থাকিবে, মালীই সব দেখিবে শুনিবে।

নীলাম্বরের মা সঙ্গে যাইতে চাহিল না। সে বলে, এ বাড়ী ছাড়িয়া সে আর কোথাও যাইবে না। যতদিন শ্বাসটুকু আছে, এখানেই থাকিবে।

নয়নতারা অনেক বুঝাইলেন, গঙ্গাস্নানের লোভ দেখাইলেন, কিন্তু কিছুতেই বুড়ীর মন টলিল না। সে কাঁদিয়া বলিল, যা' দেখেছি, এতেও বেঁচে আছি এই আমার পোড়াকপাল। এত বড় একটা সংসার—আমার চোখের সামনে এমন হোল, আর আমি এখনও বেঁচে আছি! আরও দেখ্‌তে কি আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও?

নয়নতারা বলিলেন, নীলুর মা, ঝড়ে বড় বড় গাছ পড়ে' যায় দেখেছ ত? দুঃখ করে কি লাভ বল?

যাত্রার দিন ঠিক্ হইল। একদিন শীতের রাত্রে পুত্র কন্যা বউ ছেলেদের লইয়া নয়নতারা এতদিনের বাসভূমি ত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন। আত্মীয় স্বজন কাঁদিয়া ফিরিল। পুরাতন ভৃত্যবর্গ সংবাদ পাইয়া দেখা করিতে আসিয়াছিল, তাহারা কত পুরাতন কথা তুলিয়া কাঁদিল, নয়নতারা সকলকে বুঝাইয়া শুনাইয়া বিদায় করিলেন। নিজবাড়ীতেই কর্ত্তার চিতাভস্ম স্থাপন করিয়া একটি সমাধি প্রস্তুত করা হইয়াছিল, নয়নতারা বিদায়ের ক্ষণে সমাধিমূলে প্রণাম করিয়া যখন উঠিলেন, তখন নীলাম্বরের মা'র

মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে অত বড় বাড়ীটার চারিদিক ঘেরিয়া অন্ধকারটা যেন কাঁপিয়া উঠিল।

ধীরে ধীরে সকলে গাড়ীর দিকে চলিলেন। সঙ্গে লণ্ঠনের মৃদু আলো। সকলে নীরব, নিস্তেজ। যেন কোনও সম্মানিত ব্যক্তির মৃতদেহ বহন করিয়া কাহারা এই অন্ধকার রাত্রে চলিয়াছে।

নয়নতারা একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। আস্তাবলটার চাল এক দিকটা ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। গেটের রেলিং ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ফটকের দুইপাশে দুইটা কবর, জঙ্গলে পরিপূর্ণ। তাহারই ভিতর হইতে একটা স্নিগ্ধ পুষ্পগন্ধ শীতের বাতাস ভর করিয়া যেন ঘুরিয়া মরিতেছে।

গাড়ীতে উঠিয়া নয়নতারা এই প্রথম চক্ষের জল ফেলিলেন।

—ক্রমশ

এইচ্, জি, ওয়েল্স্

হুমায়ুন কবির

এইচ্, জি, ওয়েল্স্-এর যদি আজ নূতন করিয়া বাঙলার পাঠকবৃন্দের কাছে পরিচয় দিতে হয় তবে তাহা বাঙালীর পক্ষে লজ্জার কথা। আজ সমগ্র জগত ভরিয়া ওয়েল্সের নাম ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায়ই তাঁহার গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে, দেশদেশান্তর হইতে ভক্তবৃন্দ তাঁহার জন্য অর্ঘ্যরচনা করিয়া তাঁহাকে উপহার দিতেছে। আধুনিককালে পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁহার স্থান অতুলনীয়। একাধারে ঔপন্যাসিক, সমাজতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক এবং প্রবন্ধ রচয়িতা বলিয়া কেহই তাঁহার মত খ্যাতি অর্জ্জন করে নাই। আজ কিছু দিন হইল শেকোশ্লাভিকিয়া তাঁহাকে নূতন সম্মানে অভিষিক্ত করিয়াছে,—রবীন্দ্রনাথ, রম্যাঁ রলাঁ প্রভৃতির মত তাঁহার রচনারও সে দেশে প্রবেশাধিকার রহিল না।

ঔপন্যাসিক হিসাবে ওয়েল্সের রচনার বিচার করিতে গেলে তিনি জীবনে জ্ঞানকে যে স্থান দিয়েছেন তাহার পরে আমাদের দৃষ্টি প্রথমেই পড়ে। তাঁহার পূর্ব্বে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে কেহ উপন্যাসের মধ্যে এমন করিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে কিনা সন্দেহ। ওয়েল্সের বিশ্বাস যে, আমাদের আবেগ আমাদের জীবনকে যে পরিমাণে প্রভাবিত করে, আমাদের অর্জ্জিত জ্ঞান, আমাদের সামাজিক সংস্কার প্রভৃতিও ঠিক সেইরূপই আমাদের জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করে। তাই মানুষ কেবল মাত্র অনুভব করে না—সে চিন্তাও করে। মানুষের জীবনও কেবলমাত্র অনুভূতির সমষ্টি নহে, চিন্তা ও আবেগের পরস্পরের ঘাত প্রতিঘাতে জীবনের পরিণতি। তাঁহার নায়ক-নায়িকারা তাই কেবলমাত্র বাসনার স্রোতেই ভাসিয়া চলে না—তাহারা আপনাদের সকল বাসনার বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, বুদ্ধির আলোকে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রয়াস পায়। Tono Bungay-তে পন্ডেরোভো কখনই আপনাকে আবেগের কুহেলিকায় হারাইয়া ফেলে নাই—শান্ত চক্ষু মেলিয়া সে সর্ব্বদাই আপনাকে বুঝিতে চাহিয়াছে।

ওয়েল্সের সকল রচনায়ই তাঁহার আর একটি বিশ্বাস প্রকাশিত হইয়া পড়ে। মানুষের জীবনের আরম্ভ খুঁজিলে হয় ত আমরা দেখিব যে পশুই ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে আজ মানুষ, আজো অনেক পশুবৃত্তিই মানুষের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু এই পশুবৃত্তিসমূহের যে পরিবর্ত্তন আমরা আজ দেখিতেছি, তাহার শেষ হয় নাই, একদিন এ পরি-

বর্ত্তনের ফলে মানুষ আপনার মনুষ্যত্বকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া তুলিবে। একদিন যে এ জগত হইতে দুঃখদারিদ্র্য এবং বৈষম্যের বেদনা দূর হইবে, ওয়েল্স সর্ব্বান্তঃকরণে এ কথা বিশ্বাস করেন এবং তাঁহার সকল রচনাই তাঁহারি আকাঙ্ক্ষার ব্যাকুলতায় পরিপূর্ণ। কিন্তু মনুষ্যত্বের এ বিকাশের উপায় যে কি, তাহা লইয়া আজো বহু মতভেদ রহিয়া গিয়াছে, বহু দার্শনিকের আলোচনার পরেও এ সম্বন্ধে কেহ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে প্লেটো বলিয়াছেন যে, সমাজের মধ্যেই এ কালে 'সমাজিক' গড়িয়া উঠিবে, তাহারা সকলের কল্যাণের জন্য সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। এই intellectual aristocracy, বা "জ্ঞানের রাজত্বে"র স্বপ্ন বহু মানবের চিত্তকেই আকর্ষণ করিয়াছে—ওয়েল্স্ও তাঁহাদের অন্যতম। উইলিয়ম ক্লিশোল্ড-এর আলোচনা আমরা আজ করিব না—ইহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে ওয়েল্সের পূর্ব্বতন সকল রচনার সম্বন্ধেই মত বদলাইতে হইবে—কিন্তু উইলিয়ম ক্লিশোল্ড্কে ছাড়িয়া দিলেও এই মানুষের জগতে সাম্য ও সুখের রাজত্বের স্বপ্ন তাঁহার অনেক উপন্যাসেই প্রকাশ পাইয়াছে। মানব-সমাজের বেদনার মূলে যে সকল কারণ রহিয়াছে, তাহার আলোচনা করিয়া একস্থানে তিনি বলিয়াছেন যে, দরিদ্র এবং নারী এই দুইয়ের দাসত্বের উপরই মানবের সমাজ আজ প্রতিষ্ঠিত। যে সমাজের মূলেই এত বড় অত্যাচার, এত বড় অন্যায় রহিয়াছে, তাহাতে যে মানুষ সুখ খুঁজিয়া পায় নাই, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। আর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন যে, মানুষের উন্নতির পথের অন্তরায়—ভয় ঈর্ষা এবং কুসংস্কার। ইহাদিগকে জয় করিতে না পারিলে মানুষের সমাজ সুনিয়ন্ত্রিত, সুশৃঙ্খল লইতে পারে না। আজ যে মানুষ একজন আর একজনের উপর অত্যাচার করিতেছে,—পুরুষ নারীকে মানুষের অধিকার দিতে চাহে না, ধনী দরিদ্রকে পশুরও অধম মনে করে—তাহার মূলে রহিয়াছে মানুষের লোভ এবং ঈর্ষাপ্রবৃত্তি। অন্যকে বঞ্চিত করিয়া একান্ত ভাবে আপনার করিবার যে ইচ্ছা, 'রাসেল' তাহার নাম দিয়াছেন অর্জ্জনপ্রবৃত্তি। মানুষের সমাজে এই অর্জ্জনপ্রবৃত্তির বিকাশই আমরা দেখিতে পাই—সৃজনপ্রবৃত্তির প্রকাশে জীবনকে আনন্দমুখর করিবার কোন প্রয়াস সেখানে নাই।

ওয়েল্স্ নিজে বৈজ্ঞানিক এবং তাঁহার সকল রচনাই বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাসে রঞ্জিত। মানুষ আজো বিজ্ঞানের সদ্ব্যবহার করিতে শেখে নাই—বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে সে জীবনরক্ষার জন্য নিয়োগ না করিয়া জীবননাশের জন্যই ব্যবহার করিয়াছে—তথাপি ওয়েল্সের দৃঢ় বিশ্বাস যে, একদিন মানুষ বিজ্ঞানের দানকে যথার্থভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে, এবং তাহারই ফলে মানবের সমাজ সংসার নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিবে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে শারীরিক শ্রমের প্রয়োজনীয়তা কমিয়া যাইবে এবং সকলেই আপনার ইচ্ছামত অবসর বিনোদনের উপায় খুঁজিয়া বাহির করিবে। তাঁহার বহু উপন্যাসেই নায়ক বৈজ্ঞানিক, এবং সাধারণতঃ লোকের যে ধারণা আছে যে তাহারা আবেগ বা সুখদুঃখজ্ঞানবর্জ্জিত, ওয়েল্সের উপন্যাস পড়িলে সে ভ্রান্ত ধারণা দূর হইবে।

তাঁহার রচনায় সব চেয়ে বেশী ফুটিয়াছে সকল মানুষের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা। তাঁহার সকল লেখাতেই এমন একটি ঔদার্য্যের ছাপ রহিয়াছে যে, তাহা আমাদের মনকে আকর্ষণ করে, মুগ্ধ করে। তাঁহার লেখার মধ্যে কোন সামাজিক বা ধর্ম্মগত সংস্কার নাই—দেশ কাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া মানুষের সমাজে যেখানে তিনি যাহা ভাল দেখিয়াছেন, সাদরে তাহাকেই তিনি বরণ করিয়া লইয়াছেন। মানুষের ক্রমবিবর্ত্তনের ধারা তাঁহার রচনায় যেমন করিয়া ফুটিয়াছে, তেমন আর কাহারও লেখায় হয় নাই। কোন সামাজিক আচার বা বিশ্বাসই তিনি নীরবে মানিয়া লন নাই—বুদ্ধির আলোকে তাহাকে যাচাই করিয়া যুগযুগান্ত ভরিয়া তাহার পরিণতির ইতিহাস পরীক্ষা করিয়া যে সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইয়াছেন, নির্ব্বিকার ভাবে তাহাকেই তিনি নির্ভীকচিত্তে প্রচার করিয়াছেন। ইংরেজের চরিত্রের একটি মহৎ দোষ এই যে, তাহারা মনে করে, জগতের মধ্যে সর্ব্ব বিষয়েই ইংরেজ শ্রেষ্ঠতম, বিধাতা আপনি তাহাদের হস্তে জগত শাসনের ভার অর্পণ করিয়াছেন

এই সাম্রাজ্যবাদে অনেক বিখ্যাত ইংরেজ লেখকের রচনা সংকীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ওয়েল্‌সের রচনায় এ জাত্যান্তরিতা কোথাও ভুলেও প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার কাছে মানুষ মানুষ বলিয়াই বরণীয়, সে শ্বেত কি কৃষ্ণ অথবা পীত, সে ভাবনায় তাঁহার হৃদয় কখনো আলোড়িত হয় নাই। চিন্তার এই মুক্তি, সকল প্রকার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া মানসজগতে এই যে স্বাধীনতা, তাঁহারই বাণীতে ওয়েল্‌সের সকল রচনা ভরপুর—তাঁহার সকল সাহিত্যসাধনার মূলকথা এইখানে। একস্থানে তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, মানুষের জীবনের সফলতার জন্য চাই—মুক্তি, জ্ঞান এবং উদারতা। তাঁহার লেখা পড়িলে আমরাও তাই আমাদের ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া যাই, নূতন আশায় আমাদের হৃদয় উদ্দীপিত হইয়া ওঠে, নবীন আলোকের সন্ধানে প্রাণ ব্যাকুল হইতে চাহে।

আর একটি কথা বলিয়াই আজ এ প্রবন্ধ শেষ করিব। মানুষের ভবিষ্যতে তিনি আস্থাবান, মানুষের জীবনের পূর্ণবিকাশের আকুতিতে তাঁহার রচনা উন্মাদ, কিন্তু তাই বলিয়া কোন স্থানেই ভাবলোকের তীব্র আলোকস্রোতে তাঁহার রচনা বাস্তব জগত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। তাঁহার সকল রচনায় বাস্তব জীবনের এমন ছায়া রহিয়াছে, তাঁহার নায়ক-নায়িকা এতই রক্তমাংসের নর-নারী যে, ভাবের তীব্র সুরায়ও কখনই তাহারা আপনাদিগকে হারাইয়া ফেলে নাই। অর্থনীতিশাস্ত্র এবং সমাজতত্ত্বের মধ্যে যে কবিত্বের উপাদান থাকিতে পারে এ কথা সহজে কেহ বিশ্বাস করিতে চাহিবে না; প্রতিদিনের হিসাব-নিকাশ, দোকানের ব্যবসা বাণিজ্যের হট্টগোলের মধ্যে যে আদর্শ সজীব থাকিতে পারে তাহা ভাবিতে কষ্ট হয়—অথচ এই সকলের মধ্য দিয়াই ওয়েল্‌স্ তাঁহার রচনায় জীবনের নবীন আদর্শের বাণী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্ম কোলাহল তাঁহার হাতে সুন্দর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, আমাদের প্রতিদিনের ছোট ছোট কাজগুলি নবীন আদর্শের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া নবীন রূপ ধারণ করিয়াছে। এই জীবনের সকল দৈন্য, সকল সীমা, সকল সংকীর্ণতা, সকল লজ্জা কণ্টক বেদনা স্বীকার করিয়াও যে তাহারই মধ্যে তিনি মহত্তর জীবনের আভাস দেখিতে পাইয়াছেন, সকল নীচতা সকল কলঙ্ক সকল ক্ষুদ্র অপমান অত্যাচার অন্যায় দেখিয়াও আপনার আশার আলোকে জীবন উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন—ইহাই তাঁহার সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার চরম সার্থকতাও এইখানে।

———

হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীঅবনীনাথ রায়

(প্রথম বার্ষিক স্মৃতিসভায় পঠিত)

হরিসাধনবাবুর সম্বন্ধে সব কথা বলা হয় নি—বোধ হয় কোন দিন হবেও না। ইচ্ছে করেই গত বছর আমি তাঁর জীবনের একটা অধ্যায়ের আলোচনা করি নি। আজ সে আলোচনা করতে বাধা নেই। এটি হচ্ছে তাঁর জীবনে একটি প্রেমের ইতিহাস।

মানুষকে মাপার একটি মাত্র মাপকাঠি আমার হাতে আছে—সেটি হচ্ছে হৃদয়-প্রবণতা। এই জিনিসটি না পেলে আর যত গুণই থাকুক না কেন তাকে বড় মানুষ বলতে আমার আপত্তি হয়। হরিসাধনবাবুর মধ্যে এই জিনিসটি খুব বেশী মাত্রায় না দেখলে তাঁকে আমার অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারতুম না।

যে মহিমময়ী নারীকে তিনি ভালবেসেছিলেন তাঁর